বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক

নলেজ হোম ॥ ঢাকা

পরিশোধিত ও পরিবর্ধিত
দ্বিতীয় সংস্করণ
২৫ বৈশাখ ১৩৭৭

*

পরিশোধিত ও পরিবর্ধিত
দ্বিতীয় সংস্করণ
২৫ বৈশাখ ১৩৭৭

*

প্রথম প্রকাশ
১৮ শ্রাবণ ১৩৭৫

*

ভারতে প্রাপ্তিস্থান
বুক সেন্টার
৭৬ বউবাজার স্ট্রিট
কলকাতা ১২

*

প্রকাশক
এ. এম. খান মজলিশ
নলেজ হোম
১৪৬ গভর্নমেন্ট নিউমার্কেট
ঢাকা ৫

*

মুদ্রক
বাংলা একাডেমীর মুদ্রণ শাখা
ঢাকা ২

*

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী
[স্ব] সায়রা সৈয়দ

প্রয়াত পিতৃদেব
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
স্মরণে

বিষয়-সূচী

ভূমিকা

বিষয়ের দিক হইতে বাংলা নাটকের যে কয়েকটি বিভাগ হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে পৌরাণিক নাটক একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিষয়। সামগ্রিক ভাবে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ইহার বিষয়ে আলোচনা করিতে গেলে ইহার গুরুত্ব তেমন উপলব্ধি করিতে পারা যায় না, ইহার যথাযথ মূল্য উপলব্ধি করিতে হইলে ইহাকে স্বাধীনভাবে আলোচনা করিবার আবশ্যক হয়। সেইজন্য শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন কৃতিত্বের সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর নাট্যসাহিত্য বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা কর্মে আত্মনিয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে এই বিষয়ে আমার পরামর্শ প্রার্থনা করিলেন, তখন তাঁহার গবেষণা কর্মের জন্য আমি 'বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক' বিষয়টি স্থির করিয়া দিলাম। দীর্ঘদিন অধ্যবসায়ের সঙ্গে পরিশ্রম করিবার পর তিনি তাঁহার এই বিষয়ক গবেষণা-পত্র রচনা করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তাহা পি. এইচ ডি উপাধির জন্য গৃহীত হয়। বহু গবেষণা-পত্র বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হইবার পরও অপ্রকাশিত থাকিয়া যায়; কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় বর্তমান গবেষণা-পত্রটিকে সেই দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হইতে হয় নাই, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ইহার প্রকাশ ও প্রচারের ভার গ্রহণ করিয়া ইহাকে জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, সে জন্য কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সাহিত্যপাঠক মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া নাটক রচনা করিলে তাহা ঐতিহাসিক নাটক হয়, সামাজিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া নাটক রচনা করিলে তাহা সামাজিক নাটক হয়, কিন্তু পৌরাণিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া নাটক রচনা করিলেই তাহা পৌরাণিক নাটক হয় না। তারপর পুরাণের সংজ্ঞাটিও বাঙ্গালী নাট্যকারদিগের মধ্যে খুব স্পষ্ট নহে, তাঁহাদের মতে রামায়ণ-মহাভারতও যেমন পুরাণ; বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণও তেমনই পুরাণ। কিন্তু তাঁহারা গভীরভাবে কখনও ভাবিয়া দেখেন

না যে রামায়ণ কাব্য এবং মহাভারত ইতিহাস—ইহারা পুরাণ নহে। কালিদাস মহাভারত হইতে কাহিনী সংগ্রহ করিয়া যে 'অভিজ্ঞান 'শকুন্তলম্' নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহাকে কেহ পৌরাণিক নাটক বলিবেন না, তাহা সাধারণ ভাবে নাটক বলিয়াই স্বীকৃত। বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। সেই দৃষ্টিভঙ্গিটি যথাযথ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দিতে না পারিলে পৌরাণিক নাটকের যথার্থ মর্ম কেহ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। (কারণ কোনও প্রচলিত ধারা অনুসরণ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটকের জন্ম হয় নাই, বিশেষ সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক মনোভাবই ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটকের জন্মদান করিয়াছিল এবং যতদিন পর্যন্ত সেই বিশেষ অবস্থা বর্তমান ছিল, ততদিন পর্যন্তই তাহার ধারা অগ্রসর হইয়াছে, সেই বিশেষ অবস্থার পরিবর্তনের পর তাহা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, সেইজন্য বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক এই যুগে আর রচিত হইতে পারিতেছে না।)

সুতরাং ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই বিশেষ সামাজিক, সাংস্কৃতিক কিংবা আধ্যাত্মিক মনোভাবটি কি তাহা আমাদের বিশেষভাবে বুঝিতে হইবে। কারণ তাহার উপরই সাহিত্যে ইহার উদ্ভব এবং বিকাশ সম্ভব হইয়াছে।

আগেই বলিয়াছি, প্রচলিত কোনও ধারা কিংবা বহিরাগত কোনও প্রভাব স্বীকার করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটকের জন্ম হয় নাই। প্রচলিত ধারার মধ্যে আমাদের দেশের মধ্যযুগের কৃষ্ণযাত্রার কথা মনে হইতে পারে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে মধ্যযুগের কৃষ্ণযাত্রার ভক্তির ভাবটি ঊনবিংশ শতাব্দীতে পৌরাণিক নাটকের অবলম্বন রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। কিন্তু এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে মধ্যযুগের ভক্তিবাদের পুনঃ জাগরণ হইয়াছিল, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম-প্রবর্তিত ভক্তিবাদের আদর্শ নূতন করিয়া পুনর্গঠিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কেবলমাত্র কৃষ্ণই লক্ষ্য ছিল না, এমনকি শাক্তধর্মের কালীও তাহার লক্ষ্য হইয়াছিল। (ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব মধ্যযুগের গৌড়ীয় ভক্তিবাদকে ইহার সাম্প্রদায়িক সীমার বাহিরে লইয়া আসিয়া এক সর্বজনীন মানবিকতার ক্ষেত্রে নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।)

পৌরাণিক নাটকের মধ্যে ভক্তির ভাব মুখ্য হইলেও সেই ভক্তির মধ্যে কেবল মাত্র কৃষ্ণভক্তিই লক্ষ্য হইতে পারে নাই, সেই ভক্তি সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ সর্ব সামাজিক স্তরে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এমনকি বুদ্ধভক্তি, খৃষ্টভক্তিও তাহা হইতে বাদ যায় নাই। মধ্যযুগের কৃষ্ণযাত্রা এই দিক দিয়া সঙ্কীর্ণতর সাম্প্রদায়িক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সমাজ-চেতনায় তাহার চারিদিক হইতে সাম্প্রদায়িকতার সকল বেড়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল এবং এক বিস্তৃততর ক্ষেত্রে সমগ্র মানবজাতিকে ভক্তিবাদ নিজের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছিল। 'যত মত তত পথ' শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাণীর উপর ভিত্তি করিয়া ভক্তির ক্ষেত্র প্রশস্ততর হইল, সর্ব ধর্মের ক্ষেত্রেই ভক্তির বীজ বপন করা হইতে লাগিল এবং তাহাতেই পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্র চারিদিক দিয়া উন্মুক্ত হইয়া গেল, ভক্তি কেবলমাত্র কৃষ্ণভক্তি কিংবা শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিল না।

ভক্তি সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ একটি সর্বজনীন অনুভূতি; উনবিংশ শতাব্দীতে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের এই উপলব্ধির মধ্য দিয়া ইহা সমাজের নূতন দৃষ্টি খুলিয়া দিল। মধ্যযুগের সম্প্রদায়গত এবং আচার-ভিত্তিক ভক্তিবাদের উপলব্ধি এক বৃহত্তর ক্ষেত্রে আচার (ritual) মুক্ত হইয়া সে দিন মুক্তিলাভ করিল। প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা পৌরাণিক নাটকগুলি এই চেতনার উপর জন্মলাভ করিয়াছে। এই চেতনা এক দিক দিয়া যেমন সামাজিক, তেমনই আর এক দিক দিয়া আধ্যাত্মিক, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহার সামাজিক মূল্যই অধিক। এই দিক দিয়া মধ্যযুগের কৃষ্ণযাত্রার সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর পৌরাণিক নাটকের ভাবগত পার্থক্য দেখা যাইবে; ইহা ছাড়া ইহাদের আঙ্গিকের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা প্রায় আকাশ-পাতাল। মধ্যযুগের কৃষ্ণযাত্রায় যে ভক্তি একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাহাই উনবিংশ শতাব্দীতে সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ হইয়া বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

মধ্যযুগের কৃষ্ণযাত্রায় যে ভক্তিবাদ প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাকে আচার-মূলক (ritual) ভক্তিবাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। কথাটি একটু বুঝাইয়া না বলিলে হয়ত ইহার সঙ্গে পৌরাণিক নাটকের ভক্তির বিষয়টি বুঝিতে পারিবেন না। কৃষ্ণযাত্রা একটি সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান; ধর্মীয়

অনুষ্ঠান মাত্রেরই যেমন কতকগুলি বিধিবদ্ধ আচার পালন করিতে হয়, ইহাতেও তাহাই করিতে হয়। অর্থাৎ কৃষ্ণযাত্রায় যে বালকটি কৃষ্ণের অংশে অভিনয় করিবে, তাহাকে গ্রামবাসী স্বয়ং কৃষ্ণেরই জীবন্ত বিগ্রহ বলিয়া মনে করিয়া তাহার সঙ্গে সেই প্রকারই আচরণ করিবে—বিগ্রহকে ভোগ-নৈবেদ্য বসন-ভূষণ দ্বারা যেমন পূজার্চা করা হয়, তাহাকেও তেমনই করা হইবে। বালকের প্রতি বালক কিংবা অভিনেতাবোধ থাকিবে না, শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের সঙ্গে সেই বালকটি সম্পূর্ণ অভিন্ন বলিয়া বোধ হইবে এবং তাহার সঙ্গে সেই ভাবেই আচরণ করা হইবে। অর্থাৎ কৃষ্ণযাত্রার কৃষ্ণ অভিনেতা নহে, সে দেবতা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। বিগ্রহ এখানে জীবন্ত হইয়া উঠে। এখন পর্যন্ত উড়িষ্যায় বিশেষতঃ পশ্চিম উড়িষ্যায় রামলীলায় শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সীতার যখন বিবাহের অভিনয় হয়, তখন যিনি জনকের অংশে অভিনয় করেন তিনি তাঁহার কন্যা জামাতাকে নিজের ভূমি সম্পত্তির অংশ একেবারে দলিল-পত্র করিয়া দান করিয়া থাকেন। তাহা দ্বারা কেবল 'জনক রাজা'ই নহেন, গ্রামবাসী যে যাহার সাধ্যমত রামসীতার অংশে অভিনয়কারীদিগকে প্রকৃত স্বর্ণালঙ্কার ও বস্ত্র উপহার দিয়া থাকেন। গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তিগণ প্রতি বৎসর এমনই একটি সীতা এবং রামচন্দ্র গ্রামের মধ্য হইতেই নির্বাচন করিয়া থাকেন এবং এইভাবে ভূমিসম্পত্তি লাভ করিয়া অনেক বালক-বালিকা পুত্র-পৌত্রাদি উত্তরাধিকার সূত্রেও সেই ভূমিসম্পত্তি ভোগ করিয়া থাকে। বাংলাদেশেও গ্রামীণ বৈষ্ণব সমাজে এই মনোভাব বর্তমান, তবে এই কথা সত্য এখানে ভূমি-সম্পত্তি যৌতুক দেওয়া হয় না, বস্ত্র অলঙ্কার এখন পর্যন্তও উপহার দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। শান্তিপুরের ভাঙারাসে রাই রাজা সম্পর্কে অনেকটা এই মনোভাব পোষণ করা হয়। সুতরাং যে চরিত্রগুলি এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে, তাহাদের উপর অভিনেতা বোধ থাকে না, অভিনয় যে একটি শিল্পগুণ, তাহা প্রকাশ করা কৃষ্ণযাত্রার উদ্দেশ্য নহে, কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় ভাবটি দর্শকের মনে উদ্বুদ্ধ করিয়া দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য। সুতরাং কৃষ্ণযাত্রার মৌলিক উদ্দেশ্যর সঙ্গেই পৌরাণিক নাটকের পার্থক্য আছে—কৃষ্ণযাত্রা একান্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠান, নাটকের গুণ ইহাতে কিছু নাই, কিন্তু পৌরাণিক নাটকে নাট্যাভিনয়ের সকল গুণই প্রকাশ পায়, ইহা ধর্মীয় আচারমুক্ত, ইহাতে অংশ গ্রহণকরিগণ অভিনেতা এবং অভিনেত্রী, এমন কি রূপসজ্জা গ্রহণ করিয়া অভিনয় করিবার কালে দর্শকদিগের তাহাদের উপর

কোনও প্রকার অমানবিতা কিবাং দেবত্ববোধ থাকে না। (পৌরাণিক নাটকে সাহিত্যিক স্বাদ বিসর্জিত হয় না, বিশেষ কোনও সম্প্রদায়গত ধর্মীয় আবেদনও প্রকাশ পায় না, সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের মত একান্ত মানবিক গুণের উপরই ইহার প্রতিষ্ঠা। তাহাতে দেবদেবীর চরিত্র থাকিলেও তাহাদিগকে মানুষের স্তরে নামাইয়া আনিয়া তাহাদের আচার-আচারণ নির্দেশ করা হয়।) কৃষ্ণযাত্রার সঙ্গে পৌরাণিক নাটকের এখানেই মূল পার্থক্য। অনেকে মনে করিতে পারেন যে শহরে দর্শকদিগের নিকট পৌরাণিক নাটক নাটকের মর্যাদা পাইলেও পল্লীর ভক্ত বৈষ্ণব দর্শকদিগের নিকট এই সম্পর্কিত মনোভাবের কোনও পরিবর্তন হইবে না! কিন্তু তাহাও সত্য নহে, পল্লীর বৈষ্ণব কিংবা ভক্ত দর্শকও যখন রঙ্গমঞ্চে পৌরাণিক নাটকের অভিনয় দেখে তখনও তাহাদের মধ্যে অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রতি কোনও দেব-দেবী ভাব থাকে না। কেবল মাত্র কৃষ্ণযাত্রা কিংবা রামলীলার আঙ্গিকে যাহা পরিবেশিত হয়, তাহাদের প্রতিই তাহাদের মনোভাব স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। যাহা ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করিয়া আসে না, তাহার প্রতি ঐতিহ্যমূলক কোনও আকর্ষণ থাকিতে পারে না।

অনেকে মধ্যযুগের ইউরোপের খৃষ্টানধর্মমূলক রচনা Mistery, Mriacle, Morality এবং Interlude নাটকের সঙ্গে আমাদের দেশের কৃষ্ণযাত্রার ঐক্য অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু মধ্যযুগের ইউরোপীয় এই শ্রেণীর নাটক অতিমাত্রায় অলৌকিকতা ভারাক্রান্ত; ইহাদের কাহিনী প্রায় মাটি স্পর্শ করিতে পারে নাই; কিন্তু কৃষ্ণযাত্রার কাহিনী মানবিক গুণ বর্জিত নহে। কারণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম মূলতঃ মানবিক গুণের উপর স্থাপিত। বাৎসল্য সখ্য, দাস্য, কান্তা প্রভৃতি সে সকল ভাবে কৃষ্ণের আরাধনা হয়, তাহাদের সকলই মানবিক। কিংবা শ্রীকৃষ্ণকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ঈশ্বর রূপে কল্পনা সত্বেও যাঁহারা তাঁহার ভক্ত তাঁহাদের সাধনার ধারা মর্ত্যের পথেই প্রবাহিত, তাহা কখনও ভূমির সম্পর্ক পরিত্যাগ করে নাই। শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠেশ্বর হইলেও মর্ত্যের মানব-শিশু রূপে অবির্ভূত হইয়া তিনি মানবিক আচারই পালন করিয়াছেন। কিন্তু মধ্যযুগের ইউরোপীয় Miracle Playর মধ্যে এই অনুভূতি কিংবা বিশ্বাস নাই। একান্ত অলৌকিকতার উপরই তাহার নির্ভর। তবে Morality নাটক বলিয়া যে নাটকগুলি পরিচিত তাহা ধর্মভাব হইতে অনেকখানি মুক্তিলাভ করিলেও ইহাতে একান্ত নীতি প্রচারের উদ্দেশ্য

ইহাদের মধ্যে সাহিত্যগুণ বিকাশলাভ করিবার পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে। কৃষ্ণযাত্রার শ্রীরাধার বিরহজনিত আর্তির মধ্যে নারীমনের বেদনাবোধ যেমন শাশ্বত হইয়া উঠিয়া উচ্চাঙ্গের সাহিত্যগুণ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়া থাকে Morality Play গুলির মধ্যে তেমন কোনও মানবিক অনুভূতির অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না, ইহারা অনেকটা প্রচারধর্মী রচনা হইয়া উঠিয়াছে।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে 'ইণ্টারল্যুড' নামক যে এক শ্রেণীর নাটক ইউরোপে রচিত হইতে আরম্ভ করে তাহাদের মধ্যে ধর্মীয় ভাব কিছু না থাকিলেও ইহারা সামাজিক নক্সা বা প্রহসন শ্রেণীর রচনা, ইহাদের মধ্যেও সাহিত্যগুণ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। এমনকি ইহাদের বিষয়বস্তু এবং সমাজের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিও পৃথক। ইহাদের সঙ্গে মধ্যযুগের কৃষ্ণযাত্রা কিংবা ঐ শ্রেণীর কোনও রচনার ঐক্য অনুভব করা যায় না। সুতরাং কৃষ্ণযাত্রাগুলি একটি বিশিষ্ট সমাজের ধর্মবোধের ফল, ইহার সঙ্গে বিদেশের ত নহেই এই দেশেরও অন্যান্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ ধর্মচেতনার কোনও যোগ নাই।

তবে মধ্যযুগের Miracle শ্রেণীর নাটক হইতেই ক্রমে সে দেশে ব্যক্তিনিষ্ঠ নাটকের যেমন উদ্ভব হইয়াছিল, কৃষ্ণযাত্রা হইতেও তেমনই ভাবে আধুনিক বাংলা নাটকের জন্ম হইয়াছে বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের দাবীও স্বীকার করা যায় না—পাশ্চাত্ত্য নাটক হইতেই এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রথম প্রবর্তনের যুগে আধুনিক বাংলা নাটকের জন্ম হইয়াছে, এই কথা সাধারণভাবে স্বীকার করিয়া লওয়াই সঙ্গত।

বাংলা পৌরাণিক নাটক সম্পর্কে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন গ্রন্থ রচনার আর একটি প্রয়োজনীয়তার বিষয় এখানে উল্লেখ করিতে পারি। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা পৌরাণিক নাটক রচনার যে ধারাটি সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার মধ্যেও একটি ক্রমবিকাশের সূত্র ছিল, ইহার উত্থান, ক্রমবিকাশ ও পতন এই বিভিন্ন স্তরগুলি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার আবশ্যকতা আছে। একটি সমগ্র বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসের মধ্যে এই সূক্ষ্ম স্তরগুলি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখানো সম্ভব হইতে পারেনা; বর্তমান গ্রন্থখানিতে সেই প্রচেষ্টা যে আশানুরূপ সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তাহা কেহ

অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তারপর পৌরাণিক নাট্যরচনার উৎকর্ষের যুগ এবং তাহার অধঃপতনের (decadent) যুগও স্বভাবতই এক নহে, কখন হইতে কি কারণে ইহার উত্থান এবং কখন হইতে কি কারণে ইহার অধঃপতন ঘটিয়াছে তাহাও বিশ্লেষণ করিয়া দেখা প্রয়োজন, ইহার সঙ্গে বাঙ্গালীর সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক চিন্তার বিবর্তনের ধারাও জড়িত, বর্তমান গ্রন্থে সেই বিষয়টিও যে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হইয়াছে, তাহা কেবল-মাত্র বিষয়টি স্বাধীনভাবে আলোচনা করিবার সুযোগ পাওয়া গিয়াছে বলিয়াই সম্ভব হইয়াছে ; নতুবা তাহা কদাচ সম্ভব হইত না।

সাধারণভাবে দেখা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা পৌরাণিক নাট্য-রচনার ধারা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই যে স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হইয়াছিল তাহা দ্বারাই স্তিমিত হইয়া যায়। বাংলা নাটক তখন এক নূতন যুগে উত্তীর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও নূতন যুগের নূতন নাটক রচনাতেও পৌরাণিক নাটক রচনার আঙ্গিক পুরাপুরি পরিত্যক্ত হইতে পারে নাই। ভাবের দিক দিয়া পৌরাণিক নাটক তখন হইতে ভক্তির স্পর্শ হইতে মুক্ত, আঙ্গিক বা রচনাগত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া তখনও তাহা বহুল পরিমাণে পৌরাণিক নাটকের সংস্কার অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। ইহা হইতে পৌরা-ণিক নাটকের প্রভাব যে কত শক্তিশালী হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। বহিরঙ্গ হইতে বাংলা নাটককে পৌরাণিক প্রভাব-মুক্ত হইতে আরও দীর্ঘকাল চলিয়া গিয়াছিল ; এমন কি নবনাট্য আন্দোলনের যুগ পর্যন্তও তাহার প্রভাব একভাবে না হউক একভাবে বাংলা নাট্যসাহিত্যের উপর বর্তমান ছিল ; ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের উপর ত তাহা পূর্ণমাত্রাতেই বর্তমান ছিল।

রবীন্দ্রনাথ প্রায় চল্লিশখানি নাটক রচনা করিলেও প্রকৃত পৌরাণিক নাটক একখানিও রচনা করেন নাই অথচ পুরাণের বিষয়বস্তুও তিনি কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্যবহার না করিয়াছেন তাহা নহে। তাঁহার 'নরকবাস' নামক ক্ষুদ্র নাট্যকবিতাটি পুরাপুরি পৌরাণিক বিষয় লইয়া রচিত, কিন্তু কেহ ইহাকে পৌরাণিক নাটক বলিবেন না। ইহার মধ্যে ঐতিহ্যমূলক ভক্তিবাদ ত নাই-ই, বরং তাহার পরিবর্তে উনবিংশ শতাব্দীর নবপ্রবুদ্ধ মানবিকতা-বাদের (neo-humanism) বিকাশ দেখা যায়। হিন্দুপুরাণের প্রসঙ্গের মধ্যে আধুনিক মানবিকতাবাদের অনুভূতির দিক হইতে নাট্যকবিতাটি সার্থক, পৌরাণিক নাটক রূপে ইহার কোনও মূল্য নাই। নাট্যরচনার

ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সর্ব সংস্কারমুক্ত একান্ত মানবিক অনুভূতি বাংলা নাটকের নবজন্ম দান করিয়াছে, অথচ আগেই বলিয়াছি, অনেক সময় পৌরাণিক বিষয় অবলম্বন করিয়াই তিনি এই কাজ অতি সহজেই সম্ভব করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র হিন্দু পুরাণেরই এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন নাই, ইহার সঙ্গে বৌদ্ধ পুরাণকেও সমান মর্যাদার সঙ্গেই গ্রহণ করিয়াছেন। তবে সকল 'পুরাণ'কেই তিনি ভাবনার দিক দিয়া 'নূতন' করিয়া লইয়াছেন। পৌরাণিক বিষয়বস্তুও যে কতভাবে ব্যবহৃত হইয়া বাংলা নাট্যরচনার ক্ষেত্রে ভাবগত কত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা এই বিষয়টি গভীরভাবে আলোচনা না করিলে কিছুতেই বুঝিতে পারা যাইবে না।

পৌরাণিক নাটকের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক যাত্রা জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়া বাংলার পল্লীর সুদূর পল্লী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ইহা সমাজ জীবনের উপর পৌরাণিক নাটকের প্রভাবের আর একটি দিক। বাংলা নাট্যসাহিত্যের বিচারে এই দিকটিও উপেক্ষিত হইতে পারে না। বর্তমান গ্রন্থের লেখক এই দিকটিও যে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার দূরদর্শিতারই পরিচায়ক। নতুবা নাটকের আলোচনায় যাত্রার কোনও স্থান থাকিবার কথা নহে।

পৌরাণিক যাত্রাগুলি পৌরাণিক নাটকেরই এক একটি লৌকিক সংস্করণ। ইহারা নিরক্ষর সমাজে পুরাণ প্রচারে সহায়তা করিয়াছে; পুরাণের কথকতার যুগ শেষ হইয়া যাইবার পরও জনসাধারণকে নানা ভাবে পুরাণের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছে; ইহাদের সামাজিক এবং শিক্ষাগত মূল্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বর্তমান গ্রন্থের লেখক এই বিষয়টির উপরও যথাযথ গুরুত্ব দিয়াছেন এবং এই বিষয়ে আমাদিগকে নূতন ভাবনার সুযোগ দিয়াছেন। বর্তমান যুগের প্রভাবে পৌরাণিক নাটকও যেমন রচিত হয় না, তেমনই পৌরাণিক যাত্রাও রচিত হয় না; ক্বচিৎ যাহা দুই একটি রচিত হয়, তাহাদের মধ্যে পৌরাণিক গুণও যেমন থাকেনা, যাত্রার গুণও থাকে না।

বর্তমান গ্রন্থখানিতে বাংলা নাটকের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের উত্থান-পতনের জটিল ইতিহাস অতি কৃতিত্বের সঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি মূল্যবান সংযোজন রূপে গণ্য হইবে।

প্রবেশক

আমার ছাত্র ডঃ শ্রীমান রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রদ্ধাস্পদ ডঃ শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাছে গবেষণা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ ডি. উপাধি লাভ করেছেন। গবেষণা গ্রন্থের নাম 'বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক'। সেটি এখন মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। তিনি আমার পুরাতন ছাত্র এবং ডঃ ভট্টাচার্য আমার বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন। তাঁর নিকট গবেষণা করে শ্রীমান রবীন যে গ্রন্থটি প্রস্তুত করেছেন, তার গুণাগুণ বিচারের ভার আমার ওপর নেই। কারণ পূর্বেই এই গবেষণার পরীক্ষকেরা উচ্চ প্রশংসাসহ গবেষককে সম্মানিত করেছেন। আমি গ্রন্থটি পড়তে পড়তে যে আনন্দ পেয়েছি সেটুকু বলবার জন্যই দু-চার কথা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছি।

পুরাণ অর্থাৎ ধর্মসম্প্রদায়কেন্দ্রিক পুরাকাহিনী বৌদ্ধযুগের একটু পরেই ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যমতাশ্রয়ী সমাজে অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করে। বুদ্ধদেবের আবির্ভাব ও তাঁর মতাদর্শ প্রচারের ফলে সমাজে বৈদিক যাগযজ্ঞ ও পুরোহিত-অধ্বর্যু-ঋত্বিকদের প্রভাব এককালে হতবল হয়ে পড়ল, পরে বৌদ্ধধর্মে 'ত্রিশরণে'র আধিমানসিক স্বরূপ, শূন্যতা ও তথতাবাদের প্রবল প্লাবনে ব্রাহ্মণ্য-মতের শীলসদাচার ও কুলধর্ম হীনপ্রভ হয়ে আসে, 'ধম্ম-সংঘ-বুদ্ধ'-ই হল মানুষের 'অট্ঠংগিকো মগ্গো,' চরিটি আর্যসত্যই সমস্ত দর্শনপ্রস্থানের মূলাভিত্তিভিত্তি হল। সংঘারাম মানুষের শেষ আশ্রয় বলে পরিগণিত হওয়ায় গার্হস্থ্যধর্মের প্রতিও সামাজিকদের অনীহা দেখা দিল এবং ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের বর্ণাশ্রম সমাজ-সংঘেরও প্রায় বিনাশ ঘনিয়ে এল। কিন্তু নির্বাণ ও 'সংসারের' অভিন্নতাসত্ত্বেও সর্ববৈনাশিক শূন্যবাদের গভীর গহ্বরের দিকে জনমানস ধাবিত হল। বৌদ্ধ চতুর্থ সাঙ্গীতিকির অধি-বেশনে বৌদ্ধ সমাজ ও সংঘের ঘনপিনদ্ধ কায়া শিথিল হয়ে পড়ল কিন্তু বুদ্ধের জীবৎকালেই সেই মতান্তরের সূচনা হয়েছিল। বৌদ্ধমতের মহাযান শাখা ব্রাহ্মণ্যমতের সঙ্গে আংশিকভাবে আপোষরফা করে কোনও প্রকারে রক্ষা পেল বটে, কিন্তু মন্ত্র, মুদ্রা, মণ্ডল এবং বিচিত্র দেবদেবীর পরিকল্পনা

সত্ত্বেও এই মহাযান শাখা নানা উপযানে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গেল। নির্বাণ তখন নৈরাত্মাবধূতিকায় স্ত্রীবেশ ধারণ করল, নির্বাণলাভ আসঙ্গলিপ্সারই সূক্ষ্ম-সংকেতে পরিনির্বাণ লাভ করল। খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যেই ভগবান তথাগতের মানবমুক্তির নিদান এইভাবে ভুক্তি-মুক্তির কবলিত হল। খ্রীঃ শতাব্দীর কিছু পূর্ব থেকেই ব্রাহ্মণ্যমতাশ্রয়ী সমাজ আবার প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করতে লাগল, বৌদ্ধপ্রভাব শিথিলীকৃত জনসমাজকে সংহত আকার দেবার জন্য সমাজের নেতৃস্থানীয়েরা বেদ-উপনিষদের উপর ততটা ভিত্তি স্থাপন করতে পারলেন না ; তাঁরা ষড়দর্শনের মধ্যে ঈশ্বরপন্থী শাখাকে জনচিত্তের উপযোগী করে তুললেন। সমাজে প্রচলিত মুনিঋষি, রাজারাজড়া, সাম্প্রদায়িক উপধর্ম ও কৃত্যবিষয়ক কাহিনীকে লোককল্পনার রঙে অনুরঞ্জিত করে ব্রাহ্মণ্যসমাজ নতুন ধর্মপ্রণালীর বিধিবদ্ধ নিয়মতন্ত্র রচনা করলেন। এই উত্তর-বৌদ্ধযুগই হচ্ছে পৌরাণিক যুগ। আঠারোখানি মহাপুরাণ এবং আঠারোখানি উপপুরাণ—মোট ছত্রিশখানি পৌরাণিক গ্রন্থ. রামায়ণ-মহভারত ও স্মৃতি সাহিত্যের সহায়তায় সারা ভারতবর্ষেই বৌদ্ধধর্মের প্রবল প্রতিস্পর্ধী এক ধরণের ধর্মপ্রণালী গড়ে উঠল, যা প্রধানতঃ গল্পকাহিনী, উপকথাকেই ভিত্তি করেছিল, তার সঙ্গে ছিল প্রাগ্‌বৈদিক দাস-দস্যু-কিরাত-নিষাদ সংস্কারের প্রচ্ছন্ন টটেম তত্ত্ব। শঙ্কর-কুমারিল যেমন তীক্ষ্ণ তার্কিকতার যৌক্তিক পারম্পর্য অবলম্বন করে বৌদ্ধ বিনয়-অভিধর্মের দার্শনিক দিকটি দুর্বল করে ফেললেন, তেমনি নানা গল্পকাহিনী ও অতিরঞ্জনের সাহায্যে হিন্দুর বহুদেববাদমূলক ধর্মবিশ্বাসকে একটা বিশাল সাহিত্য-সংস্কারগত ঐতিহ্যে পরিণত করাও এই পৌরাণিক সংস্কারের প্রধান কর্ম বলে স্বীকৃত হল। পুরাণের রচনাকার হিসেবে সর্বত্র কৃষ্ণবেদব্যাসের নাম করা হয়েছে। পৌরাণিক যুগের প্রবল প্রভাব প্রায় হাজার বছর ধরে পরম দাপটে বিরাজ করেছে। দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর পর প্রধানতঃ সেমিটিক ভাবপ্রবাহের প্রচণ্ডতা সত্ত্বেও সমাজ থেকে পৌরাণিক প্রভাবের কিছু মাত্র ক্ষতি হয়নি। মধ্যযুগের সন্তসম্প্রদায় প্রেমমূলক ও জাতিপাঁতিহীন উদার ভক্তিরসাপ্লুত মানবধর্ম প্রচার করলেও কেউ সাক্ষাৎ ভাবে পুরাণবিরোধিতা করেননি। উত্তর-বৌদ্ধযুগ থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের হিন্দুসমাজ অল্পাধিক পুরাণ ও স্মৃতিচর্যার দ্বারাই জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ, প্রার্থনাসমাজ, মালাবারী সম্প্রদায়, পাশ্চাত্যশিক্ষিত

নব্য যুবগোষ্ঠী—এঁরা কেউই পুরাণের অতিরঞ্জিত লোককল্পনা, বহুদেববাদে-কণ্টকিত ধর্মপ্রণালী ও কোন কোন পুরাণের বিকৃতরুচির (বিশেষতঃ শিব-পুরাণ) গল্পকাহিনীর কিছুমাত্র সমর্থন করেননি। অবশ্য উনিশ শতকের সপ্তম দশক থেকে বাংলাদেশে পুরাণগুলিকে নতুনভাবে ঝেড়ে পুঁছে দেখা হচ্ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁর শিষ্যসম্প্রদায় এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-গোষ্ঠী ঘরে-পরে-নিন্দিত পৌরাণিক ঐতিহ্যের স্বরূপ আর এক দিক থেকে বিশ্লেষণ করে দেখেছিলেন, এই বিপুলায়তন পৌরাণিক সাহিত্য, যার মধ্যে ভারতীয় হিন্দুসমাজ অবধৃত হয়ে আছে, তা কি একপ্রকার চরিত্রভ্রষ্ট ভূমিচারী লোক-কল্পনার অবাধ ইতিহাস ? অবক্ষয়ী সমাজের হীন আদর্শই কি এই সমস্ত apocryphal রচনায় দুরপনেয় ক্ষতচিহ্নের মতো অস্তিত্ব রক্ষা করছে ? সারাভারতের মধ্যে সর্বপ্রথম বাংলাদেশেই গত দেড়শ বছর ধরে এই বিষয় নিয়ে তীব্র বাদানুবাদ হয়েছে। রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ-সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যাই বলুন, 'ইয়ং বেঙ্গলে'রা পৌরাণিক ঐতিহ্যকে তুড়ি মেরে যতই উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করুন, বঙ্কিমযুগ থেকেই পুরাণ-সাহিত্যের প্রতি দেশবাসীর, বিশেষতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রথমে কৌতূহলী দৃষ্টি ফিরে এল, পরে তা ক্রমশঃ শ্রদ্ধায় পরিণত হল। অবশ্য উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে য়ুরোপের ভারততাত্ত্বিক পণ্ডিতেরাও ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসহ পুরাণসাহিত্য আলোচনা করছিলেন। হয়তো শিক্ষিত ভারতবাসীরা শ্বেতাঙ্গদের এবম্বিধ আচরণ দেখে, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, পুরাণসাহিত্যের প্রতি কৌতূহল প্রকাশ করতে শুরু করেন। ভূদেব, রাজেন্দ্রলাল, বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর শিষ্যসম্প্রদায় বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও যুক্তির পথ থেকে পুরাণগুলিকে বিচার-বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন। উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর মানসসন্তানেরা পৌরাণিক ঐতিহ্যকে সমস্ত দেশের অন্তরাত্মার মর্মে অঙ্গীভূত করে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

পুরাতন বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক প্রভাব দৃঢ়মূল হয়েছিল চৈতন্যা-বির্ভাবের পর থেকে, অবশ্য তার সূচনা হয়েছিল আরও পূর্বে। চৈতন্যযুগে রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের ভাবানুবাদে পুরাণের ঐতিহ্য বিশেষভাবে অনুসৃত হয়েছিল। মঙ্গলকাব্য প্রধানতঃ লোককেন্দ্রিক মানসিকতার ওপর, প্রতিষ্ঠিত হলেও শৈব ও শাক্তপুরাণের ছিটেফোঁটা এই বিচিত্র সাহিত্যশাখায় মিলে যেতে পারে। পুরাতন বাংলা সাহিত্য মূলতঃ আবেগমূলক সৃষ্টি হলেও

ভাগবত-বিষ্ণুপুরাণাশ্রয়ী তত্ত্ব ও আখ্যান মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যকে শুধু প্রভাবিত করেনি, তার নবকলেবর নির্মাণ করেছে। ষোড়শ শতাব্দী থেকে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী মানসিকতায় পৌরাণিক ভাবানুসরণ ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্য পুরাণ-উপপুরাণ—সবই নির্বিচারে স্থান পেয়েছিল। উনিশ শতকে ব্রাহ্ম আন্দোলন ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদর্শের ফলে শিক্ষিত বাঙালীর মনে পুরাণ সাহিত্য ও সংস্কৃতি হাস্যকর অলীক কথা, সময়ে সময়ে ভ্রষ্টচরিত্রের নষ্ট রচনা বলে প্রতিভাত হয়। অবশ্য এবংবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলা কাব্য-কাহিনী ও নাট্যসাহিত্যে পৌরাণিক প্রভাব বিশেষভাবে স্থায়ী হয়েছে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পর থেকে। মধুসূদন-হেম-নবীন এবং তাঁদের অনুসরণকারী বিশ-ত্রিশ জন আখ্যানকাব্যের কবি পুরাণের কাহিনীতে কল্পনার জল মিশিয়ে সাধারণ পাঠকের পাকযন্ত্রের উপযোগী ক'রে যে সমস্ত মহাকাব্য ফাঁদলেন, কাব্য হিসাবে তা অসার্থক হলেও তাতে পৌরাণিক আখ্যান ও মনোভাবের প্রচুর দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যাবে। অবশ্য মধুসূদনের অনুসরণকারীরা, বিশেষতঃ হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র কাব্যরচনা-শক্তিতে কিছু দুর্বল হলেও পুরাণকথাকে অনেকটা আধুনিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করে মহাকাব্য রচনা করলেন। ভক্ত কেশব অন্যান্য ব্রাহ্মদের মতো পুরাণের তীব্র বিদ্বেষী ছিলেন না, জ্ঞানবাদী বঙ্কিমচন্দ্র ও সমন্বয়বাদী রামকৃষ্ণ-সন্তানগণ পুরাণকে ভারতীয় আধুনিক মানসের অনুকূলে বিশ্লেষণ শুরু করলেন—পুরাণের নতুন দিগন্ত খুলে গেল। তবে নাটকেই পৌরাণিক ভাবের গভীর ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে সর্বাধিক।

নাটক যেহেতু দৃশ্যকাব্য এবং অভিনয়গুণ না থাকলে সংলাপধর্মী যে কোন রচনা নাটক হিসেবে ব্যর্থ হতে বাধ্য, সেইহেতু নাটকের মধ্যে যে ভাবধারা ও তত্ত্বকথা ব্যক্ত হয় তা সহজেই 'সামাজিক'-দের অভিভূত ও প্রভাবিত করতে পারে। পৌরাণিক নাটক, গীতিকাব্য, যাত্রাগান প্রভৃতির দ্বারাই উনিশ শতকের বাংলাদেশের জনমানসে পৌরাণিক প্রভাব দৃঢ়মূল হয়েছিল। বস্তুত উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে রোমান্সের কিছু প্রকাশ ঘটলেও পৌরাণিক প্রভাব এদেশের ইংরেজী শিক্ষিত ও বাঙালীধরণের শিক্ষিত সমাজে, কখনও প্রকাশ্যে, কখনও-বা অগোচরে প্রবেশ করেছিল। খ্রীষ্টান মধুসূদন পৌরাণিক আখ্যানের ভক্ত ছিলেন। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও

অন্যান্য আখ্যানকাব্যের কবিরাও সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরেই পৌরাণিক আখ্যান ও ঐতিহ্যের পন্থা অনুসরণ করেই চলেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যুক্তি-বুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিকভাবে পুরাণকে মার্জিত করে যে নতুন মূর্তি নির্মাণ করেন, তা তাঁর মনোভূমিকে আদ্র' করেছিল। প্রবন্ধ-নিবন্ধে তিনি বাস্তব যুক্তির সাহায্যে পুরাণ-ঐতিহ্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন, তার ছোঁয়া তাঁর কোন কোন উপান্যাসের ফলশ্রুতিতেও লক্ষ্য করা যাবে। ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত দল-উপদল সাধারণ ভাবে পৌরাণিক আদর্শ বিরোধী হলেও উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত সমাজে, সাহিত্যে ও অধিমানসে পৌরাণিক সংস্কারের সুগভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে। রবীন্দ্রযুগেই পৌরাণিক প্রভাব কিছু হীনবল হয়ে পড়ে, আধুনিক শিক্ষিতসমাজ চিন্তায় ও ব্যবহারে পৌরাণিক আদর্শের প্রতি কিছুটা উদাসীন। বরং উপনিষদের তত্ত্ব ও রসের সঙ্গে পাঠকেরা অধিকতর পরিচিত হলেন রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রগোষ্ঠীর দ্বারা। কিন্তু পুরাণের প্রভাব এতটা গভীরভাবে জাতির মনকে বশীভূত করেছে যে, ঔপনিষদিক ভাবধারা বহুলাংশে থাকা সত্ত্বেও একালের সমাজেও পৌরাণিক প্রভাবের অধিকতর জনপ্রিয়তা দেখা যায়। এই গবেষণা গ্রন্থের লেখক ডঃ শ্রীমান রবীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গবেষণা ও সন্ধানের ক্ষেত্রটিকে শুধু পৌরাণিক নাটকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। ফলে আলোচনাটি সংহত ও নিটোল হয়েছে, এলায়িত চিন্তার শিথিলতা প্রায় কোথাও লক্ষ্যগোচর হবে না।

সমস্ত আলোচনার প্রবেশক হিসেবে প্রথম পরিচ্ছেদটি বিশেষ মূল্যবান। অসমীয়া, ওড়িয়া, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় পৌরাণিক নাটকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করায় তাঁর আলোচনাটি পূর্বভারতীয় মানসিক প্রবণতাকে একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক ভৌগোলিকতার মধ্যে উপস্থাপন করতে পেরেছে। ক্রমে তিনি পুরাতন বাংলার নাটগীতি, যাত্রাগান, ঝুমুর প্রভৃতি লোকনাট্যের ধারা বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন। অবশেষে তিনি উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী পরিক্রমা করেছেন। পঞ্চম পরিচ্ছেদটিও নাট্যতত্ত্বের দিক থেকে মূল্যবান। পুরাকথা, পুরাণ, মহাকাব্য, ইতিহাস প্রভৃতির পটভূমিকায় নাট্যসাহিত্যের বিকাশ প্রসঙ্গে এই আলোচনায় যে-সমস্ত তথ্য উদ্ধৃত হয়েছে, তা ভবিষ্যতের গবেষকদেরও সহায়ক হবে। অতঃপর পরবর্তী অধ্যায় সমূহে লেখক তারাচরণ শীকদার থেকে শুরু করে হরচন্দ্র ঘোষ, রামনারায়ণ

তর্করত্ন, মধুসূদন, মনোমোহন বসু, গিরিশচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং একালের আরও কয়েকজন পৌরাণিক নাট্যকারের নাট্য-প্রতিভা বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি দেখিয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথও নাট্যকাব্য ও কাব্যনাট্য রচনায় পৌরাণিক কাহিনীর দ্বারা রীতিমত প্রভাবিত হয়েছিলেন। অষ্টম পরিচ্ছেদটিও অল্প মূল্যবান নয়। এই অংশে পৌরাণিক নাটকের নাট্যকলা ও প্রয়োগবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

শ্রীমান রবীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় খুব একটি পরিশ্রমসাধ্য গবেষণা গ্রন্থ রচনা করে বাংলা সাহিত্যালোচনার একটি বড়ো অভাব মোচন করেছেন। বাংলা পৌরাণিক নাটক বাঙালীর প্রাণ ও প্রকৃতির সঙ্গে এমন অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে গেছে যে, একে বাদ দিয়ে বাঙালীর আধুনিক সংস্কৃতির আলোচনা চলতে পারে না। বস্তুতঃ রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত উপনিষদকে অবলম্বন করে যত আলোচনাই হোক না কেন, উনিশ শতকের বাঙালীসমাজ প্রধানতঃ পৌরাণিক সংস্কারের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এই পৌরাণিক সংস্কার বাঙালীর মূল কুলসংস্কার, মধ্যযুগ থেকে এ ভাবধারার প্রবাহ বাঙালীমানসকে প্রাণরসে আর্দ্র করে রেখেছে। সেকালের কালিয়-দমন যাত্রা অর্থাৎ কৃষ্ণযাত্রা, রামযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা, মনসার ভাসান, লৌকিক ঝুমুর গান, পুরানো কালের পাঁচালী প্রবন্ধ, এবং একালের আধুনিক পাঁচালী —সর্বত্র এই পৌরাণিক কাহিনী ও ভাবের প্রবল প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মন্মথ রায় পর্যন্ত পুরণাশ্রিত কাহিনীই নাট্যসাহিত্যকে উজ্জীবিত রেখেছে। অবশ্য সামাজিক আচার-আচরণ নিয়ে সংস্কারমূলক অনেক নাটক লেখা হয়েছে, বঙ্গভঙ্গ আন্দালনের পর রক্ত-রাঙা ভাবাবেগ ইতিহাসকে অবলম্বন করে নাটকে সার্থক হয়েছে। তবু পুরাণের কাহিনী ও আদর্শ বাঙালীর মনকে যেভাবে আকর্ষণ করে, অন্য কোন ভাব ঠিক ততটা তার চেতনাকে আবিষ্ট করে না। সত্যের ও পুণ্যের জয়, দুঃখভোগের দ্বারা দুঃখ অতিক্রম, পাপ ও অবিবেকী কামনার ব্যর্থতা, দেবতার লীলাবাদ, ইষ্টের কাছে আত্মসমর্পণ, অনুতাপের দ্বারা পাপাসক্ত চিত্তের মালিন্য বিদূরণ প্রভৃতি নীতি ও চারিত্রধর্ম বাংলা পৌরাণিক নাটককে বিচিত্র ঐশ্বর্যে ভরিয়ে তুলেছে। অদৃষ্টতত্ত্ব ও কর্মবাদের মধ্যে সুসমঞ্জস সমন্বয়ই বাংলা পৌরাণিক নাটককে পরিণতির পথে নিয়ে গেছে। মানুষ নিয়তিকল্পিত সূত্রের দ্বারাই পরিচালিত হয় না,

তার কৃতকর্ম তাকে বিনাশের পথে নিয়ে যায়। কখনও-বা বিপাকে নিক্ষেপ করে, তিলে তিলে দুঃখের আগুনে দহন করে মানুষকে খাঁটি সোনাতে পরিণত করা বাংলা পৌরাণিক নাটকের অন্যতম উদ্দেশ্য বলে মনে হয়। কিন্তু অদৃষ্টবাদ, কর্মবাদ ও লীলাবাদের দ্বারা পৌরাণিক নাটক পূর্বাপরসঙ্গতি-বিশিষ্ট শিল্পরূপ লাভ করার ফলে বাংলা পৌরাণিক নাটক একটা বিশিষ্ট সমাজমানসিকতায় পরিণত হয়েছে। 'ভদ্রার্জুন' থেকে 'কারাগার'—বাংলা পৌরাণিক নাটকের এই প্রায় শতবর্ষব্যাপী ইতিহাসে দেখা যাবে, কখনও ভক্তিভাব, বিবেকতত্ত্ব, আত্মসমর্পণ, কখনও-বা সমসাময়িক দেশ-কাল বাংলা পৌরাণিক নাটকের কলারূপ নির্মাণ করেছে। সেই বিচিত্র ইতিহাস শ্রীমান রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে।

অবশ্য একথা অস্বীকার করা যায় না, সব বাংলা পৌরাণিক নাটক, বিশেষতঃ গিরিশচন্দ্রের সব পৌরাণিক নাটক অনেক সময়েই রসোত্তীর্ণ হয়নি, অন্যের তো কথাই নেই। মনোমোহন বসু, রাজকৃষ্ণ রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল, অমৃতলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ—তাঁরা একাধিক পৌরাণিক নাটক লিখছেন। কিন্তু তাঁদের কোন একখানি পৌরাণিক নাটক কি আধুনিক বিদগ্ধ দর্শকের মনোরঞ্জন করতে পারে? পৌরাণিক মোটামোটা নীতি ও তত্ত্ব এ-সমস্ত নাটকে যথেষ্ট মোটা হাতেই আঁকা হয়েছে, কিন্তু যে গুণ থাকলে মৃত পুরাণ জীবন্ত হয়ে একালের দর্শককেও বিস্মিত করতে পারে, উল্লিখিত পৌরাণিক নাটকসমূহে তার বিশেষ পরিচয় নেই। আধুনিক পৌরাণিক নাটক থেকে নাটগীতির প্রভাব অনেক সময়েই মুছে যায়নি। অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলাল ও একালের মন্মথ রায় পুরাণাশ্রয়ী নাটকে ভাবের দিক থেকেও যুগধর্মের সন্নিবেশ করে পৌরাণিক নাটকে স্বাদবৈচিত্র্য ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। কিন্তু জনা, পাণ্ডবগৌরব, নর-নারায়ণ প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক বাঙালীকে যত সহজে আবিষ্ট করে, যুগ-ধর্মাবলম্বী পৌরাণিক নাটক ঠিক ততটা ভাবাবেগ সৃষ্টি করতে পারে না। কারণ এই নাটকগুলিতে বাঙালীর পৌরাণিক মনোভাবই আশ্রয় পেয়েছে এবং লালিত হয়েছে। বিশেষ উত্তেজক মুহূর্তে কংসকে ইংরেজের প্রতিভূ বলে মেনে নিতে মন কোন বাধা পায় না। কিন্তু সেই ভাবাবেগের বন্যা সরে গেলে ঐতিহাসিক কংস আবার পৌরাণিক পরিমণ্ডলেই মিলিত হয়। বাংলা পৌরাণিক নাটকের বিবর্তন

ও ইতিহাস যে বাঙালী-সংস্কৃতির মানদণ্ড তা লেখকের এই গবেষণাগ্রন্থটি পড়লেই বোঝা যায়।

পরিশেষে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আরও দু-একটি কথা বলে এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করি। এটি পি-এইচ-ডি প্রাপ্ত গবেষণা গ্রন্থ। একথা শুনলেই আধুনিক 'ডিলাটেন্ট' রসবিলাসীর দল নাসিকা কুঞ্চিত করে ভাববেন, আবার গবেষণা! তাঁদের কাছে এক-আঙুল পরিমিত অলস জল্পনা, যাকে একালের পাঠক বলেন, 'রম্য রচনা', তার দাম অনেক; পরিশ্রমসাধ্য গবেষণাগ্রন্থ তাঁদের মনে প্রতিকূলতা ও অনীহা সঞ্চারিত করে থাকে। পি-এইচ. ডি. উপাধিপ্রাপ্ত গবেষণাগ্রন্থগুলির সবই যে প্রথম শ্রেণীর তা অবশ্য নয়। কিন্তু অনেক গবেষণাই গবেষণা হিসেবেই সার্থক। বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও তথ্য সন্নিবেশের দ্বারা লেখক কোন একটি বিষয়কে প্রমাণ করেন—এটাই গবেষণার মূল চরিত্র। যে গ্রন্থে সেটি সুষ্ঠুভাবে ফুটে উঠতে পারে, তা আপাতঃ নীরস হলেও গবেষণা হিসেবে সার্থক। তবে যিনি নীরস তথ্যসর্বস্ব বস্তুধর্মী গবেষণায় পরিচ্ছন্নতা ও শিল্পবস্তু সঞ্চার করতে পারেন, তাঁর রচনায় তথ্য-পুঞ্জের সঙ্গে থাকে রস বা আস্বাদ—পরিমিতিবোধজনিত আনন্দ। এই লেখকের আলোচনার ধারা অনুসরণ করতে গিয়ে মনে হচ্ছিল, তিনি রচনা-কর্মের মূল বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ সামঞ্জস্য ও সমন্বয়—সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত। সেইজন্য লেখাটি তথ্যভারে ন্যুব্জদেহ হয়ে পড়েনি, ভাষা ও বিন্যাসভঙ্গিতে বেশ একটা পরিচ্ছন্ন লঘুতা সঞ্চারিত হয়েছে। ফলে এই গ্রন্থ ক্লান্তি ঘনিয়ে তোলে না, এর প্রায় সর্বত্র সজাগ কৌতূহলের চিহ্ন পাওয়া যায়। লেখকের পক্ষে, বিশেষতঃ যিনি উপাধি লাভের জন্য গ্রন্থটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করেছেন, তাঁর পক্ষে এটি একটি শ্লাঘনীয় সংযোজন। বাংলার সমালোচনাসাহিত্য এই গ্রন্থটির দ্বারা ঐশ্বর্যবান হবে এ বিষয়ে আমার সন্দেহমাত্র নেই। বাঙালী নাট্যরসিক পাঠক ও দর্শকের পক্ষ থেকে ডঃ শ্রীমান রবীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি অভিনন্দন জানাই।

নিবেদন

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগে পড়বার সময় আমার দুই প্রয়াত শিক্ষক ডঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় নাট্যসাহিত্যের প্রতি আমার যে ব্যক্তিগত অনুরাগ ছিল তাকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য নাট্যসাহিত্যের বিভিন্ন অনালোচিত বিষয়ের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং গবেষণা পদ্ধতির প্রাথমিক পাঠ দেন। গবেষণার বিষয় স্থির হয় 'বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক'। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষাসমূহের প্রাক্তন-প্রধান ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য আমার গবেষণার প্রতি স্তরে তাঁর স্নেহময় উপদেশ দান করেছেন। এ আমার ছাত্রজীবনের পরম সঞ্চয়। তাঁর নির্দেশিত সূত্রগুলিকে একত্র করে আমি যে গবেষণা নিবন্ধ রচনা করি তা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী এবং বঙ্গবাসী কলেজে আমার শিক্ষক বর্তমানে রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে। এরপর গবেষণা-নিবন্ধটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য আমি যখন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করি তখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষাসমূহের অধ্যক্ষ আমার শিক্ষক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রীডার ডঃ ক্ষেত্র গুপ্তকে নিবন্ধটির প্রকাশযোগ্যতা সম্পর্কে তাঁদের মতামত জ্ঞাপন করতে অনুরোধ করেন। তাঁরা প্রকাশের অনুকূলে অভিমত দেন এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মুদ্রণকার্যে দ্রুত অগ্রসর হন। এই হল বইটি রচনা এবং প্রকাশের নেপথ্য কাহিনী।

আমার দুই শিক্ষাগুরু এই বইয়ের পক্ষে মূল্যবান ভূমিকা ও প্রবেশক লিখে দিয়েছেন। তাঁরা আমার প্রণম্য, সুতরাং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোন সুযোগ এখানে নেই।

এরপর কৃতজ্ঞতা স্বীকারের পালা। প্রথমেই উল্লেখ করি কল্যাণী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ডঃ নীলরতন সেনের নাম। তিনি

বারবার তাগাদা দিয়ে পাণ্ডুলিপি পরিমার্জনা করিয়েছেন— বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্যদের মধ্যে সেতুবন্ধনের কার্যটিও তিনি অত্যন্ত দ্রুত সেরেছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা বিভাগটিকে সমৃদ্ধ করার জন্য যে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন এটি তারই প্রমাণ। আমার সহকর্মীদের ভিতর ডঃ রামেশ্বর শ', ডঃ সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ অমরেন্দ্র গণাই, অধ্যাপক তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক অশোক মুখোপাধ্যায়ের সহায়তা ভোলা যায় না। আর যাঁরা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন ডঃ অরুণ বসু, ডঃ পবিত্র সরকার, ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ ক্ষীরোদমোহন চক্রবর্তী, অধ্যাপক মানস মজুমদার, অধ্যাপক অরূপকুমার ভট্টাচার্য, অধ্যাপক রামরাম চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রলয়কুমার দেব, ডঃ তুষারকান্তি মহাপাত্র প্রমুখের নাম। 'মুদ্রাঙ্কন'-এর কর্ণধার নীরেন রায় একজন সাহিত্যরসিক। তাঁর সাহায্যও পেয়েছি। প্রুফ দেখার কাজে সাহায্য করেছে আমার দুই প্রাক্তন স্নেহভাজন ছাত্র শ্রীমলয় ঘোষ ও শ্রীতাপস বসু। আর 'নির্ঘণ্ট' রচনার কাজটি নিপুণভাবে করে দিয়েছেন বন্ধুবর ডঃ স্বপন বসু। এঁদের সকলকেই আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

সবশেষে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য ডঃ তারাভূষণ মুখোপাধ্যায়, কলাবিভাগের ডীন অধ্যাপক স্বদেশরঞ্জন দত্তগুপ্ত এবং অর্থসচিব শ্রীদীনেশচন্দ্র দাসের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। তাঁদের অকৃপণ সহযোগিতার ফলেই গ্রন্থখানির প্রকাশ সম্ভব হল।

প্রথম পরিচ্ছেদ

সমাজ-ধর্মপ্রবণতা ॥

পৃথিবীর প্রতিটি জাতির ধর্মমত নিয়ন্ত্রিত হয় তার নিজস্ব বিশেষ জাতীয় বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে। "মানুষের ধর্মের ইতিহাস লইয়া আলোচনা করিলে আমরা বহুস্থলে দেখিতে পাই, নানা ব্যবহারিক কারণে আমাদের সমাজজীবনে যে জিনিসটি একটি বহুমূল্য লাভ করে তাহা আস্তে আস্তে একটা ধর্মমূল্য অর্জন করিয়া বসে। দেখা যায়, যাহাকে অবলম্বন করিয়া আমাদের সমাজচিত্তের কেন্দ্রীভবন ও ঘনীভবন, তাহারই ধীরে ধীরে আমাদের ধর্মবস্তুতে বা ধর্মানুষ্ঠানে রূপান্তর।"[১] ফলে ধর্মমত যে পরিমাণে আবর্তিত হতে থাকে সেই পরিমাণে চল্‌তে থাকে সমন্বয় ও স্বীকরণ। অতঃপর কোনটি যে মূলধারা এবং কোনটি যে উপধারা তা আবিষ্কার করা কঠিন হয়ে পড়ে। হিন্দু পুরাণ ও তন্ত্রগুলির কাহিনীর মধ্যে একই দেবদেবীর বহু রূপভেদ আছে। বিভিন্ন পুরাণ-উপপুরাণে একই দেবদেবীর নানা নামের পরিচয় পাওয়া যায়।

বাংলা দেশের সামাজিক অভিব্যক্তির সঙ্গে তার ধর্মসাধনা নিবিড়ভাবে যুক্ত। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে সমগ্র জনমণ্ডলীর মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ধর্মাদর্শ গড়ে না উঠলেও ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বাংলাদেশেই যে ধর্মসাধনার ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল এ কথা আজ স্বীকৃত। বিভিন্ন পুরাণ-উপপুরাণ ইত্যাদিকে আশ্রয় করে বাঙালীর সমাজজীবনে ধর্মসাধনার জোয়ারের তীব্রতা নিয়ে উপস্থিত হওয়ার মুখ্য কারণ হল, প্রথমে অনার্য এবং পরে আর্য-অধ্যুষিত বাংলাদেশের সংস্কৃতির মধ্যে ধর্মচিন্তার দ্রুত সঞ্চরণ এবং জনজীবনের সর্বস্তরে তার প্রাধান্য-বিস্তার। গুপ্ত সাম্রাজ্যের কাল (খ্রীঃ ৫ম—৬ষ্ঠ শতাব্দী) থেকে উচ্চবর্ণের বাঙালী জনগণের

১. শশিভূষণ দাশগুপ্ত: ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, কলিকাতা, ১৩৭২, পৃঃ ৯

উপর কিছু কিছু আর্যপ্রভাব ঘটতে থাকে এবং তার পাশাপাশি দেখা দেয় জৈন ও বৌদ্ধ প্রভাব। পাল-রাজত্বে (৭৫০-১১৬০ খ্রীষ্টাব্দ) বৌদ্ধধর্ম যে ব্যাপক গৌরব অর্জন করেছিল সেন-রাজত্বে (১১২৫-১২০৩ খ্রীষ্টাব্দ) হিন্দুধর্মও পুনরুত্থানের মাধ্যমে সেই গৌরব অর্জন করে। অতঃপর তুর্কী-আক্রমণ (১২০৩ খ্রীঃ) এবং তারপর পাকাপাকিভাবে মুসলমান বিজয়ের পর থেকে উচ্চকোটির ধর্মমতের উপর যখন আঘাত এল তখন স্বাভাবিক-ভাবেই সমাজের সর্বস্তরে মাতৃতান্ত্রিকতার প্রভাব দেখা গেল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের উপর এই বৈদেশিক আক্রমণের ফলশ্রুতিরূপে লৌকিক ধর্ম, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটল। সমাজের উচ্চস্তরের লেখক সমাজ থেকে সরে গেলেন এবং সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করলেন সর্বস্তরের কবি এবং সমঝদার। পৌরাণিক দেবদেবী এভাবেই আঞ্চলিক সমাজে কিংবদন্তী এবং লৌকিক রঙে রঙীন হলেন।[২] পৌরাণিক তত্ত্ব এবং উপাখ্যানের ভিতর অনুপ্রবেশ করল লৌকিক মানবীয় উপাদান। বাংলার সমাজের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এভাবেই পুরাণের নবজন্ম হল।

বাঙালীর সমাজজীবন এবং তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বিপুলভাবে পরিবর্তিত করেছিল। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, যে কোন দেশের সাহিত্য তার বৃহত্তর সমাজজীবন ও জাতীয়-চৈতন্যেরই প্রতিফলন। সামাজিক জীবন আবার নির্ভর করে সমকালীন ঘটনা-প্রবাহের উপর। বিশেষতঃ নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে সমকালের সমাজ এবং সংস্কৃতির একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। প্রাচীন গ্রীক নাটক এবং মধ্যযুগের ইউরোপীয় নাটকসমূহে তৎকালীন সে দেশের ধর্মচেতনার সুস্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষণীয়। ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃত নাটকগুলিতেও তৎকালীন ধর্মদর্শন এবং পরিবেশের ছাপ যথেষ্ট।

২. মুসলমান অধিকারের দুই-তিন শতাব্দীর মধ্যে চারিধারা মিলিয়া মিশিয়া গিয়া সাহিত্যে প্রবাহিত দুইটি প্রধান ধারায় পরিণত হইল, পৌরাণিক (অর্থাৎ অর্বাচীন, নবাগত, নবাগত শাস্ত্রলব্ধ) এবং অ-পৌরাণিক (অর্থাৎ প্রাচীন, দেশীয় ঐতিহ্যাগত)। দেবদেবীদেরও ভেদ প্রায় মিলাইয়া আসিতে লাগিল।
—সুকুমার সেন: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড—পূর্বার্ধ, কলিকাতা, ১৯৬৩, পৃঃ ৭৮

বাঙালীর জাতীয় জীবনের একটি স্বতন্ত্র বলিষ্ঠ ধর্মভাবনা সুপ্রাচীন কাল থেকেই রয়েছে। নিজস্ব সংস্কৃতি ও ধর্মের উপরই গড়ে উঠেছে তার সাহিত্যিক রসবোধ। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ধর্মাশ্রয়ী কাব্য রচনার বিচিত্র জয়যাত্রা সেই ধর্মপ্রবণতার স্বাক্ষর বহন করে। বাঙালীর জাতীয় জীবনে অন্যান্য ভারতীয় অঞ্চলের মত বিদেশী শাসক এবং পরধর্মের আঘাত কম আসে নি। কিন্তু হিন্দুধর্মের শাশ্বত ধর্মকাহিনীকে সে শত অত্যাচার সত্ত্বেও চোখের মণির মত রক্ষা করেছে। প্রাচীন এবং মধ্যযুগের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী দেবাবাদী দর্শনে ছিল একনিষ্ঠ বিশ্বাসী, দৈবের প্রতি ছিল তাদের সীমাহীন বিশ্বাস। পুরাণে নানা কাহিনীর মধ্য দিয়ে মানব জীবনে সুখ-দুঃখের কারণ এবং সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের জন্য ধর্মাচরণের যে নির্দেশ উচ্চারিত হয়েছে মধ্যযুগের বাঙালী সমাজের কাছে তাই ছিল ধ্রুবসত্য। পুরাণের দেবদেবীদের মাহাত্ম্যমূলক কাহিনী এবং দেবতার নিকট ভক্ত অথবা বীর চরিত্রের আত্মনিবেদন-নির্ভর কাহিনীগুলি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাঙালীর বিশ্বাসের মূলে বারিসিঞ্চন করেছে এবং তার অন্তরে জাগিয়েছে ভাবের স্পন্দন।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য এই ধর্মপ্রবণতার ধারাটি মধ্যযুগের কাব্য শাখায় যেরূপে বহন করেছে, নাট্যশাখায় সেরূপে বহন করতে পারে নি। মধ্যযুগে প্রায় সমগ্র ইউরোপ খণ্ডে ধর্মাশ্রয়ী নাটক রচনায় যে উন্মাদনা জেগেছিল তার পিছনে ছিল তৎকালীন সে দেশের নাট্যরচনার উৎসাহ এবং নাট্যদর্শকদের আগ্রহ। বাংলাদেশের মধ্যযুগের কবিসমাজ পুরাণের কাহিনীসমূহকে পদাবলী এবং আখ্যানকাব্যের আধারেই পরিবেশন করতেন কারণ তৎকালীন জনচিত্তে নাটকীয় প্রেরণা দৃঢ়ীভূত ছিল না। তাই চৈতন্য-জীবনকে নিয়ে কাব্য রচিত হয়েছে, বাংলায় নাটক লেখা হয়নি। কৃত্তিবাস অথবা কাশীরাম দাস রামায়ণ ও মহাভারত কাহিনীর ভিতর অসীম নাট্যসম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সেই কর্মে ব্রতী হন নি। ভাগবতের কৃষ্ণলীলা-কাহিনী এবং পুরাণের অন্যান্য চমকপ্রদ অলৌকিক আখ্যানও উপেক্ষিত হয়েছিল। পাঁচালী ও কথকতার সঙ্গে যাত্রার সামান্য সম্পর্ক থাকলেও যাত্রার উৎপত্তির সঙ্গে সেগুলির যোগ খোঁজার কোন অবকাশ নেই। কেবলমাত্র যাত্রার ভিতরই মধ্যযুগীয় নাট্যরীতি স্ফুরণের সম্ভাবনা

ঈষৎ ঝলসিত হওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর যে যাত্রারীতির সঙ্গে আমাদের পরিচয়, সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত সেরূপ যাত্রা রচিত হয়েছিল কিনা জানা যায় না। অর্থাৎ মধ্যযুগের বাঙালী সমাজ-জীবনে পুরাণের আলোকে যে বিপুল সর্বজনীন ভাবালোড়ন জেগেছিল তাকে আশ্রয় করে সেই যুগে নাটক রচনা সম্ভব হয়নি।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা নাটকের যে সন্ধান মিলল তার একটি পশ্চাৎ-অনুপ্রেরণা অস্বীকার করা যায় না। আধুনিক যুগের পূর্বে বাংলায় নাট্যকর্মের অভাব থাকলেও, বিশেষতঃ উনবিংশ শতাব্দীর পৌরাণিক নাটকগুলি রচনার একটি অতীত ইতিহাস আছে। মধ্যযুগেব যে রচনাসমূহে নাটকীয় সম্ভাবনা ইতস্ততঃ ছাড়িয়ে আছে সেগুলি বাঙালীর ধর্মাশ্রয়ী জীবনাদর্শের উপর নির্ভর করে রচিত হয়েছিল। পাশ্চাত্যে চলিত জীবনকে অতিক্রম করে আব কোন জীবনেব মূল্যায়ন করা হত না—কিন্তু প্রাচ্যের মানুষ বিশ্বাস করত ব্যবহারিক জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার আচরিত ধর্ম-নিয়ন্ত্রিত। সংস্কৃত নাটকে এই পারলৌকিক জীবন প্রাধান্য লাভ করেছিল, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নাট্যধর্মী রচনাতে এই জীবনাদর্শই প্রতিফলিত। উনবিংশ শতাব্দীর পৌরাণিক নাটকগুলি সেই ধর্মাদর্শ থেকে কখনই সরে আসে নি।

উনবিংশ শতাব্দীব সূচনায় বাংলাদেশে খ্রীষ্টধর্মেব ব্যাপক প্রচার শুরু হয় এবং শতাব্দীর প্রথমার্ধেই ব্রাহ্মধর্মেরও যথেষ্ট প্রসার ঘটে। মধ্যযুগের বাঙালী সমাজ যেমন অন্ধ দেববিশ্বাসে মুখর ছিল উনবিংশ শতাব্দীতে তার পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু সমগ্র মধ্যযুগে যেরূপ নানা বিরুদ্ধবাদী ধর্মসম্প্রদায়ের আক্রমণ সত্ত্বেও বাঙালী তার পুরাণকে ভোলেনি, উনবিংশ শতাব্দীতেও তেমন ঘটনা চোখে পড়ে। আসলে কোন ধর্মাদর্শই কোমল তৃণশয্যার উপর দিয়ে একটানা পথ হাঁটতে পারে না, তাকে বিপরীতধর্মী শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়, নিজ ভুলত্রুটি দূর করতে হয়। হিন্দুধর্মের মধ্যে যে আচারসর্বস্ব অমানবিক গোঁড়া রক্ষণশীলতার তীব্রতা দেখা দিয়েছিল অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে তারই ফলে হিন্দুধর্মে গতিহীনতা এসেছিল। অতঃপর উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অংশে রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের দর্শনে হিন্দুধর্ম নতুন পথ খুঁজে পেল। হিন্দুধর্মের এই

পুনরুত্থান শতাব্দীকালের ব্যবধানেও তার শক্তি হারায়নি। বাংলা পৌরাণিক নাটকগুলি তার স্বাক্ষর বহন করছে।

বিংশ শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশ পথ অতিক্রম করে বাঙালী সমাজ বর্তমানে যে সময়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে সময় দু'টি বিশ্বযুদ্ধ-অতিক্রান্ত পৃথিবীতে বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তন এসেছে বিজ্ঞানে, শিল্পে, সাহিত্যে এবং জীবনের সামগ্রিক মূল্যবোধে। এ কথা সত্য বিশ্বজুড়ে এই সর্বব্যাপী পবিবর্তনে আমরা মধ্যযুগীয় সমাজ-জীবন, মধ্যযুগীয় ধর্ম-চিন্তা এবং তৎকালীন জীবনবোধ আশা করতে পারি না। কিন্তু এ কথাও সত্য আধুনিক নাগরিক-শিক্ষিত সমাজ দেখে যদি কেউ বৃহত্তর বাঙালী সমাজ সম্পর্কে মন্তব্য করেন তাহলে সেই মন্তব্যে ত্রুটি থেকে যাবে। এই আধুনিক যুগেও বাংলার আংশিক নগরাঞ্চল এবং বৃহত্তর গ্রামাঞ্চলের মানুষ এখনও ধর্মীয় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। মধ্যযুগীয় পাঁচালী-কথকতা, আধুনিক যাত্রা এবং পৌরাণিক নাটক এখনও যথেষ্ট সংখ্যক বাঙালীর মনোহরণে সফল। ভাবাবেগ-প্রবণ বাঙালী আজও সুপ্রাচীন পুরাণ কাহিনীর চর্চা করে চলেছে।

বাংলা পৌরাণিক নাটকগুলি যেরূপ বাঙালীর ধর্মীয় ভাবনার পরিচায়ক তেমনি ইউরোপের বাইবেল-বিষয়ক নাটকগুলি, ভারতীয় সংস্কৃত নাটকগুলি এবং পূর্ব ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে রচিত নাটকগুলিতে তৎকালীন বিশেষ বিশেষ ভাবনার পরিচয় রয়েছে। বাংলা পৌরাণিক নাটকগুলির সঙ্গে তাদের মিলও অনেক সময় দেখা যায়:

পাশ্চাত্ত্য বাইবেল-বিষয়ক নাটক (Biblical Drama)॥

বাংলা সাহিত্যের অসংখ্য কাব্য এবং নাটকের উপাদান যেমন এসেছে পুরাণ সমূহ থেকে, পাশ্চাত্ত্যের কাব্য ও নাটকের রসদ তেমনি এসেছে বাইবেল থেকে। ইউরোপে মধ্যযুগে খ্রীষ্টোৎসবকে মনোরম করবার জন্য অনেক 'Biblical' নাটক রচিত এবং মঞ্চস্থ হত। সমাজের নানাশ্রেণীর লোক সেখানে এসে জড় হত এমন মনে করা যায়। যাই হোক গীর্জাগুলির আসল উদ্দেশ্য ছিল বাইবেলের বিষয়কে জনপ্রিয় করা।[৩]

৩. Religion in origin, Like that of the Greeks, the drama of

বাইবেলের ওল্ড এবং নিউ টেষ্টামেণ্টে মানবপুত্র যীশুর অমর কীর্তিকলাপ ছড়িয়ে আছে। গীর্জার বাগিচায় যীশুর জন্মদিবস অনুষ্ঠান (Christmas) এবং তিরোভাব দিবস (Easter) পালন করা হত নানা Biblical নাটক অভিনয়ের সাহায্যে। যীশুর জীবনের স্মরণীয় যত ঘটনা, জন্ম, মৃত্যু এবং পুনর্জন্মের কাহিনী সেগুলিতে আঁকবার পর এ কথাও বলা হত কোন পথে মানবজীবনের মুক্তি সম্ভব। যাজকেরা চাইতেন এইসব নাটকের অভিনয় দেখে অশিক্ষিত খ্রীষ্টানরা আরও বেশী ধর্মানুরাগী হোক। সেজন্যই নাটকগুলি হয়ে পড়ে উদ্দেশ্যমূলক। অবশ্য পরে সেগুলির মধ্যে গান এবং সংলাপ যুক্ত হয়ে সেগুলি নাট্যমূল্য অর্জনে আংশিক সফল হয়। পুরাণকথাও যে ভাল ট্রাজেডি নাটক উপহার দিতে পারে তার পরিচয়ও পাওয়া গেল। প্রকৃতপক্ষে যীশুর প্রথম জীবনে দুঃখী মানুষের পরিত্রাতার ভূমিকা এবং তাঁর শেষ জীবনের মর্মান্তিক মৃত্যুই সেই ট্রাজেডির উৎসক্ষেত্র।

বাইবেল-নির্ভর ধর্মীয় নাটক একই সময়ে ইউরোপের পশ্চিম অংশে বিকশিত হয়। ফরাসী দেশে আর এক জাতীয় নাটক তখন অভিনীত হত যেগুলির উদ্দেশ্য ছিল কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে, কঠিন সংলাপে উচ্চশ্রেণীর মনোরঞ্জন করা। সাধারণ মানুষের ধর্মীয় ভাবনার প্রকৃত পথনির্দেশ করল বাইবেল কাহিনীর লাতিন-ভাষার নাট্যরূপ। গীর্জার অঙ্গনতলে সমবেত ফরাসী জনসাধারণ খ্রীষ্টের মহৎ জীবন-গাথা এবং মানবজীবনের আচরণীয় ধর্ম সম্পর্কে এইভাবে অবহিত হয়ে সুখী হত।

অংশতঃ অ্যাংলো-নর্মাণ এবং অংশতঃ লাতিন ভাষায় রচিত একটি 'Biblical' নাটক অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। নাটকটির নাম—'Adam'। এই নাটকটি গীর্জার ভিতর অভিনীত না হয়ে গীর্জার পশ্চিমদ্বারের বাইরে অভিনীত হত এবং সেখানে একটি রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করা হত বাইবেলের উদ্যানদৃশ্যটি উপস্থাপনার জন্য। কিছু দূরে আর একটি মঞ্চে অভিনীত হত নরকদৃশ্যটি এবং মাঝখানের খোলা জায়গাটিতে

Modern Europe arose out of the rich symbolic liturgy of the Mediaeval Church... '

—Hudson, W. H. : An Introduction to the study of Literature, London, 1963, PP. 233-34.

সাধারণ দৃশ্যগুলির অভিনয় হত। ঈশ্বর, আদম এবং ঈভ চরিত্রে বাইবেলের কাহিনীর আক্ষরিক রূপায়ণ ছিল। ফ্রান্সে 'Biblical' নাটক অভিনয়ের সময় জেরুসালেম, বেথেলহেম, স্বর্গদ্বার, নরকদ্বার ইত্যাদি অংশও বেশী স্থান অধিকার করত।[৪]

পাশ্চাত্ত্যে বাইবেল বিষয়ক নাটক অভিনয়ে ইতালীর মত ধর্মীয় নাটক অভিনয়ে আইবেরীয় উপদ্বীপ অঞ্চলের (স্পেন, পর্তুগাল) মধ্যযুগের ইতিহাস যথেষ্ট সমৃদ্ধ।

মধ্যযুগের পাশ্চাত্ত্য বাইবেল-বিষয়ক নাটকগুলির সঙ্গে বাংলা যাত্রার যথেষ্ট মিল রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্ত্যের নাটকের মত যাত্রার প্রাচীন রচনাও পুরাণ-আশ্রয়ী। পাশ্চাত্ত্য ধর্মীয় নাটকগুলির জন্ম খ্রীষ্টোৎসবে—গীর্জা-প্রাঙ্গণে। প্রধানতঃ গানের পরিবেশে এই নাটকসমূহের জন্ম—যাত্রার জন্মও গানের সুরে। তবে যাত্রার উপর মন্দিরের অনুশাসন না থাকায় পাশ্চাত্ত্যের নাটক অপেক্ষা সেগুলি অনেক স্বচ্ছন্দ এবং সংবেদনশীল।

পাশ্চাত্ত্য পৌরাণিক নাটক এবং বাংলা পৌরাণিক নাটকের মধ্যে একটিমাত্র অন্তরঙ্গ যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায় তা হল উভয় নাটকেরই উদ্দেশ্য ধর্মপ্রাণ জাতির হৃদয়ে ভক্তিরস সঞ্চারিত করা। অকুণ্ঠ ধর্মবিশ্বাস যেমন ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত য়ুরোপীয় নাট্যকার এবং দর্শকদের হৃদয় অধিকার করে রেখেছিল, সেই একই ভক্তিপ্রাণতা বাংলা পৌরাণিক নাট্যকারদেরও পৌরাণিক নাট্যরচনায় অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। অবশ্য উভয়

---

৪. Their performances were eventually spread over several consecutive days, for the cycles grew too long to be presented in one. The technic of production varied from country to country In France and Southern Europe the platforms remained fixed in the main squares, but in England and flanders they were mounted in great wagons, and spectators gathered at any part of the town saw a number of them which were brought round in succession.

—Cohen, J. M.: A History of Western literature, London, 1961, P-87.

নাট্যধারার মধ্যে যে পার্থক্যটিকে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না সেটি হল, য়ুরোপীয় বাইবেল-আশ্রয়ী নাটকগুলি গীর্জার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে যতদিন অভিনীত হয়েছিল ততদিন সেগুলির আবেদন বিন্দুমাত্র কমেনি। গীর্জার অচলায়তন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই নাটকগুলি রচনা বন্ধ হয়ে গেল। অপরদিকে বাংলা পৌরাণিক নাটক একদিকে যেমন নাট্যকারদের স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মচিন্তার প্রকাশ, অন্যদিকে তেমনি জনসাধারণের একনিষ্ঠ ধর্মজিজ্ঞাসার সূত্রনির্দেশ। জনসাধারণের এই দাবীর পিছনে মন্দিরের কোন হস্তক্ষেপ ছিল না বলেই বাংলা পৌরাণিক নাটক পুরাণকে অনুসরণ করে দেশীয় ধর্মজিজ্ঞাসার উত্তর-সঞ্চয়ে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিল। পাশ্চাত্ত্য পৌরাণিক নাটকে ধর্মসাধনার যে ইতিহাসটি নাটকের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের উপর আরোপের চেষ্টা করা হত বাংলা পৌরাণিক নাটকে সে ক্ষেত্রে পুরাণ-প্রিয় দর্শকদের রস এবং ভাবকেই বেশী মূল্য দিয়ে তাঁদের প্রিয় কাহিনীরই নাট্যরূপ দেওয়া হত।

ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে একশ্রেণীর নাটক পুরাণের কাহিনী অনুসরণে রচিত না হয়েও অলৌকিকতা এবং ভক্তিরসের উচ্ছ্বাসে পৌরাণিক নাট্যমূল্য অর্জন করেছে। চৈতন্যদেব, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য, রামানুজ প্রমুখ ঐতিহাসিক ধর্মসাধক এবং সাধু-সন্তদের উপর রচিত এই নাটকগুলির মত পাশ্চাত্ত্যেও একশ্রেণীর খ্রীষ্টভক্ত সাধু-সন্তদের অলৌকিক জীবনকথাশ্রয়ী নাটক রচিত হত। বাইবেল-বহির্ভূত কাহিনী হলেও এই শ্রেণীর নাটকে যে ধর্মীয় আবহাওয়ার পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য নাটক সেই প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেনি। বাংলা নাট্যসাহিত্যের অন্যান্য শাখাতেও পৌরণিক নাটকের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়।

সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য : বাংলা পৌরাণিক নাটকের সঙ্গে সম্পর্ক ॥

গ্রীক ট্র্যাজেডিসমূহ এবং পাশ্চাত্ত্যের ধর্মীয় নাটকগুলির রচনা যে ধর্মোৎসবকে উপলক্ষ করেই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বাংলা পৌরাণিক নাটকগুলি ধর্মোৎসবকে কেন্দ্র করে রচিত না হলেও একথা সত্য জাতির চিত্তে যে ধর্মীয় বাসনা মুকুলিত তার মূলে আনন্দদানের নিমিত্তই সেগুলির জন্ম। প্রাচীন বাংলা যাত্রাগুলি যে ধর্মোৎসবেরই অঙ্গ হিসেবে

কাজ করত তার দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ রয়েছে। সংস্কৃত নাটকের ক্ষেত্রে এই বিষয়ে বেশ ব্যতিক্রম রয়েছে। সংস্কৃত নাট্যকারগণ পুরাণের জগতের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং সংস্কৃতজ্ঞ নাট্যকারগণের পক্ষে পুরাণের মূল কাহিনীর ভিতরে প্রবেশের সহজ সুযোগও ছিল। সংস্কৃত নাট্যরূপ যে যুগে চরম বিকাশ লাভ করে সেই কালিদাসের সময় হিন্দু ধর্মের আধিপত্য কম ছিল না। তৎকালীন সমাজ-জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রচিত না হওয়ায় সংস্কৃত পৌরাণিক নাটকের বিপুল সম্ভাবনা পূর্ণতা লাভ করেনি। রামায়ণ-মহাভারত এবং অন্যান্য পুরাণকে অবলম্বন করে সংস্কৃত সাহিত্যে যে ক'টি পৌরাণিক নাটক রচিত হয়েছিল তাতে পুরাণ কাহিনীর ভিতরে নাট্যকারের কল্পিত ঘটনা এবং মৌলিক চরিত্র অনুপ্রবিষ্ট হওয়ায় সিদ্ধ-রসের হানি ঘটেছে। একমাত্র ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' নাটকটি এর ব্যতিক্রম।

কৃষ্ণোৎসব, শিবোৎসব কিংবা ইন্দ্রোৎসব—যে কোন উৎসবকে উপলক্ষ করেই প্রথম সংস্কৃত নাটক অভিনীত হোক না কেন অথবা গ্রীক ট্রাজেডির প্রভাব সংস্কৃত নাটকের উপর বিস্তারিত হোক বা না হোক, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় সংস্কৃত নাট্যকারগণ জাতীয় চিত্তে পুরাণের ধর্মীয় আবহাওয়া সঞ্চারের চেষ্টা না করে নাট্যশাস্ত্রের অনুসরণে দৃশ্যকাব্য রচনার দিকেই অধিক মনোনিবেশ করেছিলেন। এঁদের ঐতিহাসিক এবং রোমান্টিক কাহিনীর প্রতি আকর্ষণই ছিল বেশী, তবুও যে পুরাণের কাহিনী নিয়ে তাঁরা নাটক লিখেছিলেন তার প্রকৃষ্ট কারণ হল পুরাণের ভিতরও নাটকীয় রস কম নেই। সংস্কৃত সাহিত্যে শক্তিশালী নাট্যকারের সংখ্যা কম নয় এবং পুরাণের কাহিনী নিয়ে রচিত তাঁদের নাটকগুলি 'পৌরাণিক নাটক' হতে পারত। কিন্তু ভারতীয় ধর্মপ্রবণতার প্রতি গভীর মনোনিবেশের অভাব ঘটায় এবং ভরত, ধনঞ্জয়, সাগর নন্দী প্রমুখ নাট্যবিদের নির্দেশ সূক্ষ্মরূপে অনুসরণের প্রবণতা থাকায় সার্থক সংস্কৃত পৌরাণিক নাটক দু'একটি ব্যতীত লেখা হতে পারে নি।

পুরাণের কাহিনীকে আশ্রয় করে রচিত নাটকই পৌরাণিক নাটক হতে পারে না। সংস্কৃত নাটকগুলিতে পুরাণের যে ঘটনাগুলি গৃহীত হয়েছে বাংলা পৌরাণিক নাটকগুলিতেও সেই ঘটনাগুলি গৃহীত হয়েছে।

অথচ সংস্কৃত পৌরাণিক নাটকগুলি যথার্থ পৌরাণিক নাটকের মর্যাদা না পাওয়ার কারণ নাট্যাঙ্গিক এবং কাব্যরসের প্রতি নাট্যকারগণের প্রবণতা। বাংলা পৌরাণিক নাট্যকারগণ পুরাণের কাহিনীকে গ্রহণ করেছেন, ভক্তিবাদের প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন এবং নাট্যাঙ্গিক সম্পর্কেও সচেতন থেকেছেন। তাঁরা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর নিজস্ব ধর্মমতকে যেরূপে পুরাণের পটে উপস্থাপিত করেছেন সংস্কৃত নাট্যকারদের মধ্যে সেই দৃষ্টিভঙ্গি না থাকায় সার্থক পৌরাণিক নাটক বেশী লেখা হয় নি।

কালিদাস-পূর্ব দু'জন নাট্যকারের ভিতর অশ্বঘোষ পুরাণের কাহিনী গ্রহণ করেন নি কিন্তু ভাসের সাতটি নাটক মহাভারত অবলম্বনে এবং দু'টি নাটক রামায়ণ অবলম্বনে রচিত। রামায়ণের কাহিনী নিয়ে বাংলা পৌরাণিক নাট্যকারগণ যে নাটকগুলি লিখেছেন, তার উপর ভবভূতির 'উত্তর রামচরিতে'র প্রভাব স্পষ্ট। এই নাটকের পূর্ব অংশ নিয়ে লেখা ভাসের 'প্রতিমা নাটক' বাংলা পৌরাণিক নাটকের উপর কোন প্রভাব ফেলেছিল কিনা সন্দেহ, কেননা সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে ভাসের নাম শোনামাত্র গেলেও ১৯১০-১১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে তাঁর লুপ্ত গ্রন্থগুলি আবিষ্কৃত হয়নি। গিরিশচন্দ্র এবং তাঁর সমসাময়িক নাট্যকারগণ ভাসের রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। সাত অঙ্কে বিধৃত 'প্রতিমা নাটকে' রামায়ণের প্রায় অর্ধাংশ কাহিনী—রামের বনবাস থেকে সুরু করে রাবণ-বধ এবং অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন ও রাজ্যাভিষেক—বর্ণিত। বাংলায় এই দীর্ঘ কাহিনীকে বিযুক্ত করে রামের বনবাস, সীতাহরণ, জটায়ু বধ, রাবণ বধ, রামের রাজ্যাভিষেক ইত্যাদি নাটক রচিত হওয়ায় পৌরাণিকত্ব এবং নাটকীয়ত্ব উভয়ই রক্ষা পেয়েছে, দীর্ঘ কাহিনী পরিসরে ভাসের পক্ষে যা সম্ভব ছিল না। রামায়ণের ঘটনা নিয়ে কালিদাস-পর নাট্যকার ভবভূতি যে নাটক লিখেছেন তার ভিতর নাট্যকারের কবিশক্তির বিচ্ছুরণ ঘটলেও নাটক দুটি সার্থক পৌরাণিক নাটকের সংজ্ঞায় উত্তীর্ণ হতে পারে না। 'মহাবীর চরিত' যেন নতুন রামায়ণ। বিবাদের পূর্বে রাম-সীতার দর্শনজনিত পূর্বরাগ, সীতাকে রাবণহস্তে অর্পণের জন্য রাবণের প্রেরিত দূতকে উপেক্ষা করে কুশধ্বজ কর্তৃক রাম-সীতার অথবা কৈকেয়ীর অনুশোচনা-জনিত উক্তি রামায়ণে নেই। 'উত্তর রামচরিতে'র পরিণতি মিলনাত্মক, বাল্মীকি রামায়ণে যেখানে

বিয়োগান্তক। ভবভূতির নাটক বাংলা পৌরাণিক নাটকের উপর প্রভাব বিস্তার করলেও একমাত্র দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যতীত আর কোন নাট্যকার বাল্মীকি-রামায়ণের কাহিনী থেকে সরে আসেন নি।

কালিদাস সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক হলেও তিনি ছিলেন অলংকার-শাস্ত্রপ্রিয় নাট্যকার; নাট্যদর্শকের ভক্তিরসার্দ্র হৃদয়ে নয়, কাব্যপাঠকের সৌন্দর্যতন্ময় হৃদয়েই তাঁর অধিষ্ঠান। যজুর্বেদ, ঋকবেদ এবং বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত 'উর্বশী-পুরুরবা'র বিচ্ছেদ-কাহিনীকে অস্বীকার করে তাই তিনি নাটকের যবনিকা টেনেছেন মিলনে। মহাভারতীয় কাহিনী-নির্ভর নাটক 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম'ও কবি কালিদাসের মহৎ কীর্তি বহন করে, নাট্যকার কালিদাসের পরিচয় পাওয়া যায় না। মহাভারতের শকুন্তলা দুষ্মন্তের নিকট নিজেই আত্মপরিচয় দিয়েছেন, কণ্বমুনির আশ্রমেই তাঁর সন্তান জন্মেছে; কালিদাসের শকুন্তলা দুই সখীর মাধ্যমে দুষ্মন্তকে আত্মপরিচয় জানিয়েছেন, তাঁর পুত্র প্রসূত হয়েছে ভগবান মারীচের আশ্রমে। কালিদাস দুর্বাসার যে অভিশাপ নাটকে প্রয়োগ করেছেন তা মহাভারতে নেই। প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি কালিদাস এভাবেই পৌরাণিক সিদ্ধরস অস্বীকার করে নাট্যের আঙ্গিকে কাব্য রচনা করেছেন। হয়ত সেজন্যই বাংলা পৌরাণিক নাটকে দু'একটি ব্যতীত শকুন্তলা এবং উর্বশী বিষয়ক নাটক রচিত হয় নি।

সংস্কৃত পৌরাণিক নাট্যধারায় ক্ষেমীশ্বর রচিত 'চণ্ডকৌশিক' বাংলায় 'হরিশ্চন্দ্র' নামে রচিত বেশ কটি পৌরাণিক নাটকের উপর প্রভাব ফেলেছিল। ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' মহাভারতের বিখ্যাত কাহিনী 'ভীম কর্তৃক কৃষ্ণার অবেণীবদ্ধ কেশের সংহার অর্থাৎ বন্ধন' অবলম্বনে রচিত। এই একটিমাত্রই সংস্কৃত পৌরাণিক নাটক যার ভিতর দিয়ে নবম শতাব্দীর সময়কালীন জাতির ধর্মপ্রবণতার যথাযথ পরিচয় পাওয়া যায়। দুর্যোধনের শৃঙ্গার ও মন্ত্রণা, অর্জুনের সংযত শৌর্য, যুধিষ্ঠিরের ধর্মপরায়ণতা ইত্যাদি যথাযথ পুরাণানুসারী। অথচ বিস্ময়ের কথা, যাদবচন্দ্র তর্করত্নের 'কীচক বধ' (১৮৫৮) ব্যতীত বাংলা ভাষায় এই উল্লেখযোগ্য কাহিনী নিয়ে পৌরাণিক নাটক লেখা হয়নি। ক্ষেমীশ্বরের 'চণ্ডকৌশিকে'র ন্যায় ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার'ও বাংলা পৌরাণিক নাটকের আদর্শ হতে পারত।

অতঃপর সংস্কৃত ভাষায় দু'একটি পৌরাণিক কাহিনী-নির্ভর নাটক

(দামোদর মিশ্রের মহানাটক বা হনূমন্নাটক, মুরারির 'অনর্ঘরাঘব' এবং রাজশেখরের 'বালরামায়ণ') রচিত হলেও সেগুলি সার্থক পৌরাণিক নাটক নয় এবং বাংলা পৌরাণিক নাটকের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সাক্ষাৎ ঘটেনি।

সংস্কৃত মহাকাব্য যেমন নাটক অপেক্ষা পুরাণকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছে বিপরীতে বাংলা নাটক বাংলা মহাকাব্য শাখার চেয়ে পুরাণকে বেশী অনুসরণ করেছে। সেজন্যই বাংলা নাটকের সম্মুখে সংস্কৃত নাটকের পরিচয় থাকলেও তার অনুসরণের ক্ষেত্রে বাংলা নাট্যকারগণ উৎসাহবোধ করেন নি। অন্ততঃ পৌরাণিক নাটক সম্পর্কে এই উক্তি দৃঢ়তার সঙ্গে করা চলে। তবে সংস্কৃত পৌরাণিক নাটকের আত্মার সঙ্গে বাংলা নাটকের আত্মার যোগসূত্র স্থাপিত না হলেও, গঠন, সংগীত এবং বৃত্তচয়ণের দৃষ্টি-কোণ থেকে উভয় নাট্যধারার মধ্যে আংশিক মিল আছে।

পূর্ব ভারতে রচিত পৌরাণিক নাটক : বাংলা পৌরাণিক নাটকের সঙ্গে সম্পর্ক

অসমীয়া ॥

অসমীয়া সাহিত্যের প্রাচীন যুগ (সপ্তম থেকে নবম শতাব্দী) মৌখিক সাহিত্য সৃষ্টিতেই ব্যাপৃত ছিল। এই সময়ের বিহুগান, শিশুদের ঘুম-পাড়ানী ছড়া ইত্যাদির পথ অতিক্রম করে রচিত হল 'মন্ত্র আরু ভণিতা'। এই ধারা অব্যাহত গতিতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত চলে। অতঃপর সমাজ জীবনের পুরাণ-চর্চার গভীর অনুরাগ প্রতিবিম্বিত হল রামায়ণ ও মহা-ভারতের অনুবাদ-উৎসাহে—দেখা মিলল পুরাণ-প্রিয় লেখক কবি হেম সরস্বতী, পীতাম্বর দ্বিজ প্রমুখের। প্রাক্-বৈষ্ণব সেই যুগ অবসিত হওয়ার অব্যবহিত পরে শঙ্করদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কেবল বৈষ্ণব ধর্মাদর্শের প্রসারই ঘটল না, এল সমাজ-জীবনে সার্বিক নবজাগরণ। পরবর্তীকালে এই নবজাগরণের জোয়ারের তীব্রতা কমে এলেও সাহিত্যকর্মের অগ্রগতিতে বিন্দুমাত্র গতিহীনতা দেখা যায় নি। আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের

সূচনা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, ইংরেজ প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে। এক্ষেত্রে বাংলা ও ওড়িয়া সাহিত্যের সঙ্গে অসমীয়া সাহিত্যের ঘনিষ্ঠতা বেশী কারণ হিন্দী সাহিত্যের উপর পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাব পড়েছিল আরও বিলম্বে।

অসমীয়া জাতির ইতিহাস ধর্মপ্রবণতার নিরবচ্ছিন্ন সাক্ষ্যবাহী। নবম-দশম শতাব্দী থেকে শ্রীহট্ট, কামরূপসহ আসামের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার প্রসার ঘটে। এরই পাশাপাশি জন্মলাভ করে বিরাট মন্ত্র-সাহিত্য। পুরাণ-সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য জাতির ব্যাকুলতা, কৃষ্ণ-কথা এবং রামায়ণ-কথার মধ্য দিয়ে তৃপ্ত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের শেষদিকে কবি হেম সরস্বতীর ‘প্রহ্লাদ চরিত্র’ কাব্যে মহাভারতীয় কাহিনীর সুন্দর রূপদান লক্ষণীয়। বাংলা, হিন্দী ও ওড়িয়া সাহিত্যের মত অসমীয়া জনজীবনে রামায়ণ কাহিনীর আবেদনও গভীর। দশম শতাব্দীতে দেওপর্বতে ভগ্ন মন্দিরে রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব প্রভৃতির প্রাপ্ত মূর্তি দেখে বোঝা যায় জনজীবনে রামায়ণের প্রভাব কত গভীর ছিল। বাংলা সাহিত্যে কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনুবাদ যেরূপ পরবর্তীকালে মহাকাব্য এবং পৌরাণিক নাটকরচনার প্রধান আদর্শ হয়েছিল অসমীয়া সাহিত্যে কবি মাধবকন্দলীও সেই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এরপর অনন্ত কন্দলী, শঙ্করদেব, মাধবদেব, কবি দুর্গাবর, অনন্ত ঠাকুর প্রমুখ কবির রচনাতেও রামায়ণ কাহিনী ‘বিশ্বাস্ত’ রূপে অনূদিত।

বাংলা সাহিত্যের মত অসমীয়া সাহিত্যের প্রারম্ভিক যুগেও ধর্মাশ্রয়ী সাহিত্য রচনায় ছিল প্রবল আগ্রহ। নাটকের ভিতর দিয়ে পৌরাণিক কাহিনী চিত্রণের বহু পূর্বে ‘বিয়ানাম’ প্রভৃতি কথা-কাহিনীর ভিতর দিয়ে পুরাণের অমর গাথাগুলি বর্ণিত হত। এই সূত্রে হরগৌরীর বিয়া, রাম-সীতার বিয়া, কৃষ্ণ রুক্মিণীর বিয়া, ঊষা-অনিরুদ্ধর বিয়া প্রভৃতি বিয়ানামগুলি স্মরণীয়। পরবর্তীকালে এই বিষয়গুলি পৌরাণিক নাটকে গৃহীত হয়। রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতের কাহিনী-মালায় পরবর্তীকালে যাত্রা ও নাটক রচিত হয়।

অসমীয়া নাটকের পূর্বসূরী হিসেবে এযাবৎ তিনটি শাখার পরিচয় পাওয়া যায়—যাত্রা, ঝুমুর এবং নাট। এ ছাড়া ধুলিয়া নাচ, পুতুল নাচ,

নৃত্যগীত এবং মুখোস পরে কথাকলির ন্যায় নৃত্যগীত আসামের মূল অঞ্চল থেকে প্রান্তীয় অঞ্চল পর্যন্ত সমশক্তিতে প্রবাহিত ছিল।[৫] মনসা পূজায় দেওধানী নাচের বিশেষ প্রাধান্য স্মরণীয়। বাংলা নাটক রচনার পূর্বে যেমন দেশীয় যাত্রা ধারা বর্তমান ছিল, তেমনি অসমীয়া সাহিত্যে ছিল 'ওজাপালী'।[৬] অসমীয়া 'অংকীয়া নাটে'র বীজ এই ওজাপালীর ভিতরই নিহিত ছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতে সমগ্র বাংলাদেশে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে যে ভাবপ্লাবন দুর্বার হয়েছিল তার বহিঃপ্রকাশে সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা পল্লবিত হলেও নাটক রচনায় অবিশ্বাস্য নীরবতা! ঐ একই সময়ে শঙ্করদেব ও তাঁর শিষ্য-সমাজ সমগ্র আসামে ভাবের প্লাবন বইয়েছিলেন। রামানুজ এবং ভক্ত কবির প্রভাবিত এই অব্রাহ্মণ পণ্ডিত স্বীয় বিদ্যা, বিচক্ষণতা এবং একেশ্বরবাদী দৃষ্টির সাহায্যে একদিকে যেমন ব্রাহ্মণেতর সমাজের অবিসংবাদী গুরু হয়েছিলেন অন্যদিকে তেমনি সাহিত্যাকাশেও উজ্জ্বল ধ্রুবতারায় পরিণত হয়েছিলেন। বেদান্ত, গীতা এবং মদ্ভাগবতের অনুবাদের পাশাপাশি কবি-সুরকার শঙ্করদেব পৌরাণিক নাটক রচনাতেও ঝুঁকে ছিলেন। পৌরাণিক চরিত্রের ভাবরূপ রক্ষা করে রচিত তাঁর 'রুক্মিণী হরণ' এবং 'পারিজাত হরণ' নাটক দুটির ব্যাপক জনপ্রিয়তা হয়েছিল। চৈতন্যদেব ধর্মপ্রচারক ছিলেন, কাব্যরসিক ছিলেন, কিন্তু শঙ্করদেবের ন্যায় সাহিত্যিক ছিলেন না। চৈতন্যদেব কলম ধরলে বাংলা পৌরাণিক নাটকের জন্য হয়ত বাঙালী দর্শকদের আরও তিনটি শতাব্দী অপেক্ষা করতে হত না।

শঙ্করদেব এবং তাঁর শিষ্য মাধবদেব উভয়েরই পৌরাণিক নাটকের মুখ্য চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ। শঙ্করদেবের অঙ্কিত কৃষ্ণ কিন্তু ভাগবত অথবা মহাভারতের প্রচণ্ড দৈবশক্তিসম্পন্ন দেবতাই নন, তিনি তৎকালীন মানবিকতায় সমৃদ্ধ, ঘরের মানুষ। কৃষ্ণ চরিত্রে এই মানবিকতা আরোপের প্রয়োজনীয়তা বঙ্কিমচন্দ্র উপলব্ধি করলেও বাংলা পৌরাণিক নাটকে কৃষ্ণচরিত্রে এই গুণ

৫. সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়: অসমীয়া সাহিত্য, কলিকাতা, ১৩৫৯, পৃঃ ৪৬

৬. Barua, B. K. : History of Assamese literature, Sahitya Academy, New Delhi, 1964.

আরোপিত হতে দেখা যায় না। অতঃপর আসে নারদ-প্রসঙ্গ। বাংলা যাত্রা এবং পৌরাণিক নাটকের মত অসমীয়া পৌরাণিক নাটকেও নারদ চরিত্র কাহিনীতে দ্বন্দ্ব এবং জটিলতা সৃষ্টির সহায়ক। শঙ্করদেবের 'পারিজাত হরণ' নাটকে কৃষ্ণ কর্তৃক রুক্মিণীকে পারিজাতদানের সংবাদটি নারদের সূত্রে সত্যভামার নিকটে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে নাটকীয় উৎকণ্ঠা তীব্র আকার ধারণ করেছে। তাঁর 'কেলিগোলাপ' নাটকেই প্রথম রাধার নাম ('রাধাং বিধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজঘোষিত') পাওয়া যায়। বাংলা পৌরাণিক নাটকের ধারায়ও রামনারায়ণের 'রুক্মিণী হরণ' নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পারিজাত হরণ', বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের 'রুক্মিণীরঙ্গ' ইত্যাদি নাটক প্রসিদ্ধ হয়েছিল।

অসমীয়া নাট্যসাহিত্যের ধারায় মাধবদেবের পুরাণাশ্রয়ী নাট্যধর্ম গোবর্ধন যাত্রা, পিপরা গুচুরা নাটক, চোরধরা ঝুমুর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া রামচরণ ঠাকুরের কংসবধ, গোপাল আটার বলিছলন, অনন্ত কন্দলীর সীতার পাতাল প্রবেশ ইত্যাদি নাটকের আবেদন আধুনিক অসমীয়া রঙ্গমঞ্চেও বিদ্যমান।

বাংলা সাহিত্যের মত অসমীয়া সাহিত্যেও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার (১৮২৬ খৃীষ্টাব্দ) একটি সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছিল। অসমীয়া ভাষায় ব্যাকরণ গ্রন্থ, অভিধান ইত্যাদির প্রকাশ, 'অরুণোদয়' (১৮৪৬) পত্রিকাকে আশ্রয় করে গল্প, কবিতার বাহুবিস্তার এবং পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের অনুকরণ উনবিংশ শতাব্দীতে অসমিয়া সাহিত্যের অগ্রগতির প্রেক্ষাপট। এযুগেও পৌরাণিক নাটক রচনা স্তিমিত হল না, তার প্রমাণ লম্বোদর বরার 'শকুন্তলা' এবং দুর্গাপ্রসাদ দত্তর 'বৃষকেতু' নাটকসমূহ। ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব সত্ত্বেও বাঙালী নাট্যকারগণ যেমন নিজেদের প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ভুলে যাননি, অসমীয়া নাট্য-কারগণও তেমনি বৈষ্ণব মহাপুরুষগণের কথা ও কাহিনী, জাতীয় পুরাণ ও দর্শনের প্রতি মমতা হারাননি। অসমীয়া সাহিত্যের সঙ্গে গত দু'শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জাগরূক আছে। আধুনিক সাহিত্য পুরাণ-কাহিনী বর্জিত নয়, যদিও আধুনিক সামাজিক এবং রাষ্ট্রীক সমস্যা অসমীয়া সাহিত্যের একটি দীর্ঘ অংশ অধিকার করে আছে। বিংশ

শতাব্দীতেও হ্যুট হামসুনের 'Growth of the Soil'-এর অনুবাদের পাশাপাশি হেমচন্দ্র বড়ুয়ার 'কানিয়ার কীর্তন', গুণাভিরামের 'রামনবমী,' অতুলচন্দ্র হাজারিকার 'কুরুক্ষেত্র'-র মত নাটকও রচিত হচ্ছে। ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় অন্যান্য রাজ্যগুলির মত অসমীয়া সমাজ-জীবনেও যে ধর্মের গতিটি আজও অব্যাহত এটিই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ওড়িয়া ॥

উড়িষ্যা এবং বাংলা—এই দুই প্রতিবেশী রাজ্যের ভিতর ঘনিষ্ঠতার মধ্যে যে সকল কারণ রয়েছে তার অন্যতম হল উভয় অংশের মানুষের মধ্যেই ধর্মভাব শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রায় সমান্তরাল গতিতে অগ্রসর হয়েছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মনোমোহন চক্রবর্তী, নগেন্দ্রনাথ বসু, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, বিমানবিহারী মজুমদার প্রমুখ গবেষকরা উড়িষ্যার প্রত্নতত্ত্ব, ভাষা-সাহিত্য, ধর্মচিন্তা, স্থাপত্যশিল্প ইত্যাদি সম্পর্কে নানা আলোচনা করেছেন। তাঁদের বক্তব্যের ভিতর থেকে যে কথাটি মূল সুর রূপে পাওয়া যায়, তা হল, উড়িষ্যার ভাষা ও সাহিত্যের উপর বাংলা সাহিত্যের মতই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব প্রবল। সুদূর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যে পুরাণ-চর্চা উড়িষ্যার জনজীবনে বিস্তৃত হয় তার তৃপ্তি ঘটে শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণে রচিত মার্কণ্ডদাসের 'মাধব কোইলি' গ্রন্থে। কবি সরলা দাসের 'মহাভারত'-অনুবাদকর্ম ১৪৩৬ থেকে ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়। বলরামদাসের রামায়ণ এবং পীতাম্বর দাসের নৃসিংহপুরাণ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক কবি জগন্নাথ দাস ভাগবতের অনুবাদ করেন। তাঁর গুপ্তভাগবত (শুক-পরীক্ষিৎ সংবাদ) এবং তুলাভিণা (হর-পার্বতী সংবাদ) গ্রন্থদুটিও বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল।

সমাজে ধর্মভাব জাগরণের যুগে পৌরাণিক নাটক -রচনার সুবর্ণসুযোগ থাকে। বাংলাদেশের মত আসাম এবং উড়িষ্যায় চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম ব্যাপক-প্রসারিত হয়। "পূর্ব হইতেই উড়িষ্যার বৈষ্ণবধর্মে প্রবণতা ছিল, মহাপ্রভু দীর্ঘকাল পুরীতে বাস করিয়া তাহাকে ভিন্ন একটা রূপ দিলেন। ফলে উড়িষ্যার বৈষ্ণবধর্ম ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম, উড়িষ্যার বৈষ্ণবধর্ম দুই

স্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিল।...একটিতে ভক্তির প্রাবল্য, অন্যটিতে জ্ঞানের ; একটিতে প্রাণশক্তি রাধা, অন্যটির বৃন্দা।'[৭] অথচ অসমীয়া সাহিত্যে এই সময়ে পৌরাণিক নাটক রচনায় যে উন্মাদনা দেখা দিয়েছিল, বাংলা এবং ওড়িয়া লেখকগণ সেই সুযোগ ব্যবহার করেননি। ওড়িয়া কবি অচ্যুতানন্দ, দীনকৃষ্ণ দাস, ভূপতি পণ্ডিত, বৃন্দাবতী দাসী, ভীমা ধীবর, ভক্তচরণ দাস, সদানন্দ প্রমুখ লেখকরা পৌরাণিক কাহিনী-আশ্রয়ে অসংখ্য কাব্য রচনা করলেও পৌরাণিক নাটক রচনার প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ অনুভব করেন নি।

যাত্রা রচনার প্রেক্ষাপটটি অবশ্য ওড়িয়া সাহিত্যে সম্পূর্ণ অনুজ্জ্বল নয়। পৌরাণিক কথা 'লীলা'-র সঙ্গে হাস্যরস 'সুয়াঙ্গ'র মিশ্রণে ওড়িয়া সাহিত্যের মধ্যযুগে বেশ কিছু সংখ্যক যাত্রা রচিত হয়েছিল। বাংলা যাত্রায় হাস্যরস থাকলেও ওড়িয়া যাত্রায় যেমন পুরাণ কাহিনীকে অতিক্রম করে হাস্যরস প্রাধান্য বিস্তার করত, বাংলা যাত্রায় দীর্ঘদিন তা হত না। কিন্তু ওড়িয়া যাত্রার কেলা-কেলুনী নাট, ধোবা-ধোবানী নাট, কেউট-কেউটনী নাট, স্বামী-স্ত্রী নাট, ইত্যাদির অনুসরণে গোপাল উড়ে বাংলা যাত্রায় মালিনীর নৃত্য ব্যবহার করেন। এরপর বাংলা যাত্রার ভিতরও ওড়িয়া যাত্রার ন্যায় অপ্রাসঙ্গিকভাবে কালুয়া-ভুলুয়া, মেথর-মেথরাণী, ঘেসেড়া-ঘেসেড়ানী প্রভৃতির রুচিহীন নৃত্যের অনুপ্রবেশ ঘটে।

ওড়িয়া পৌরাণিক নাটকের আত্মপ্রকাশ আসলে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, বাংলা পৌরাণিক নাটক রচনার প্রায় সমকালে। কিন্তু বাংলা পৌরাণিক নাটকে যে বিপুল শ্রীবৃদ্ধি দেখা দিল, ওড়িয়া ভাষায় তা দেখা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব অসমীয়া এবং বাংলা সাহিত্যের মত ওড়িয়া সাহিত্যেও পড়েছিল, কিন্তু ওড়িয়া সাহিত্য জাতির ধর্মপ্রবণতাকে এজন্য যেরূপ উপেক্ষা করেছে অসমীয়া এবং বাংলা সাহিত্য তা করে নি। উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিনটি দশকে উড়িষ্যায় কাব্যসাহিত্যের যেমন বিকাশ ঘটেছে তার তুলনায় পৌরাণিক নাট্যরচনা অপ্রতুল। উনবিংশ শতাব্দীর উড়িষ্যার প্রতিষ্ঠিত লেখক ফকিরমোহন সেনাপতি রামায়ণ-মহাভারতের

৭. প্রিয়রঞ্জন সেন : 'ওড়িয়া সাহিত্য', কলিকাতা, ১৩৫৮, পৃষ্ঠা ২৭.

অনুবাদ করেছিলেন, ছান্দোগ্য উপনিষদের অনুবাদ শেষ করলেও ভাগবত অনুবাদ সম্পূর্ণ করতে পারেন নি—ভ্রমণ সাহিত্য, জীবনী কাব্য, উপন্যাস ইত্যাদি রচনা করলেও পৌরাণিক নাটক রচনায় তাঁর নীরবতা বিস্ময়কর ঘটনা সন্দেহ নেই। আসলে পদ্মনাভ নারায়ণদেবের 'বাণদর্পদলন' এবং 'দাতাকর্ণ', কামপাল মিশ্রের 'সীতা বিবাহ' 'হরিশ্চন্দ্র' এবং ভিখারীচরণ পট্টনায়কের 'লঙ্কাদানে'র ন্যায় আর দু'চারটি নাটক ছাড়া ওড়িয়া সাহিত্যে পৌরাণিক নাটকের ধারাটি অত্যন্ত দীন। অত্যাধুনিক ওড়িয়া নাট্যসাহিত্যে বাংলা নাট্যসাহিত্যের মতই সমকালীন সমাজ-জীবন প্রধান স্থান গ্রহণ করেছে, সুতরাং আপাততঃ পৌরাণিক নাটক রচনার মানসিকতা ওড়িয়া নাট্যকারদের খুবই কম বলা চলে।

হিন্দী ॥

১৪শ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে ১৭শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত হিন্দী সাহিত্যের যুগকে 'ভক্তিকাল' রূপে চিহ্নিত করা হয়। বাংলা-অসমীয়া এবং ওড়িয়া সাহিত্যে যেমন ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বেই সাহিত্যের নানা শাখা-প্রশাখা ব্যাপ্ত হয়েছিল হিন্দী সাহিত্যে সেই জাতীয় বিকাশ ঘটেনি। তবে ষোড়শ শতাব্দী থেকে হিন্দী সাহিত্যে কাব্যরচনায় যে গতি-প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছিল তা ভারতের অন্যান্য ভাষা থেকে কম শক্তিসম্পন্ন ছিল না। কৃষ্ণভক্তি, রামভক্তি, সুফিভক্তি এবং নিগু'ণভক্তির চতুরঙ্গে অজস্র কবি-গীতিকার দেখা দিয়েছিলেন। কৃষ্ণভক্তি শাখার তুলসীদাসের অমর গান ভারতবর্ষের প্রান্তীয় অঞ্চলগুলিতে পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছিল। সুরদাস, পরমানন্দ-দাস, কৃষ্ণদাস, কবীর, দাদু প্রমুখের নাম এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। কিন্তু বিস্ময়ের কথা, আখ্যানকাব্যের বিস্তৃতি যদিও এই কালে ঘটেছিল তবু নাট্য-সাহিত্যের দেখা মিলল না। পৌরাণিক নাটক রচনায় অসমীয়া নাট্য-সাহিত্য বাংলা, ওড়িয়া এবং হিন্দীর বহুপূর্বেই যাত্রা শুরু করেছিল।

তবু বলতেই হয় অসমীয়া 'অংকীয়া নাটে'র উপর মিথিলার 'কীর্তনীয়া নাটকে'র প্রভাব কম নয়। বাংলাদেশের যাত্রা ও গম্ভীরা, মথুরার রাজ ও রামলীলা, গুজরাটের ভবাই এবং মহারাষ্ট্রের ললিতার সঙ্গে 'কীর্তনীয়া নাটকে'র মিল রয়েছে। উমাপতি উপাধ্যায়ের 'পারিজাতহরণ', রামদাস ঝা'র 'আনন্দবিজয়', গোবিন্দ-র 'নলচরিত', রমাপতি উপাধ্যায়ের 'রুক্মিণী-

হরণ', লালকবির 'গৌরী স্বয়ম্বর' এবং নন্দীপতির 'শ্রীকৃষ্ণকেলিমালা' কীর্তনীয়া নাটকের ধারায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন। কীর্তনীয়া নাটকেই হিন্দী পৌরাণিক নাটকের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। গানের সঙ্গে নৃত্যের মিলন এই নাটকগুলির বৈশিষ্ট্য।

অষ্টাদশ শতাব্দী অন্যান্য সাহিত্য ধারাব মত হিন্দী সাহিত্যেও অবসাদের যুগ। রাষ্ট্রীক অবক্ষয় এবং মুঘল শাসনের বিদায়ের ফলে হিন্দী সাহিত্য রাজ-পৃষ্ঠপোষকতা-বঞ্চিত হয়ে পড়ে। তুলসীদাস তাঁর সময় মিথিলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রামকথাকে নানা অংশে বিভক্ত করে যাত্রার রীতিতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে হিন্দী নাটকের দেখা মেলেনি। পাশ্চাত্ত্য প্রভাব অন্যান্য অঞ্চলের মত হিন্দী-ভাষাভাষী অঞ্চলেও ছায়া ফেলল সত্য কিন্তু বাংলা সাহিত্যেব মত পৌবাণিক নাটক হিন্দীতে রচিত হল না। উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত লালা শ্রীনিবাসদাসের 'প্রহ্লাদ চরিত্র' মুষ্টিমেয় পৌরাণিক নাটকের মধ্যে একটি। এই একই বিষয় নিয়ে উনবিংশ শতাব্দীতেই কয়েকটি বাংলা পৌরাণিক নাটক বচিত হয়।

হিন্দী সাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র (১৮৫০-৮৫) বাংলা নাটকের ছায়ানুসরণ করেছেন, আঙ্গিকের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছেন। পরবর্তী নাট্যকার জয়শঙ্কব প্রসাদ (১৮৯০-১৯৩৬) 'হিন্দুস্তানী প্লে'-র প্রভাব অতিক্রম করে পাশ্চাত্ত্য আদর্শে নাট্যবচনায় মন দেন। তাঁর পৌরাণিক নাট্যকাব্য 'সজ্জন' 'করুণালয়' এবং 'উর্বশী'র উপর রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব স্পষ্ট। তিনি সংস্কৃত নাটক এবং গিরিশচন্দ্রের আদর্শে বিদূষক-ধর্মী চরিত্র সৃষ্টি করেন। প্রসাদজীর পর রামকুমার ভার্মা, লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্র প্রমুখ নাট্যকারগণ সার্থক পৌরাণিক নাটক লিখেছেন।

বিংশ শতাব্দীব চল্লিশের দশকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে যে বিপুল পরিবর্তন ঘটে তার অবক্ষয়ের চিত্র হিন্দী নাট্যসাহিত্যেও প্রতিফলিত। বাংলা এবং ওড়িয়া নাটকেও সেই একই ঘটনা ঘটে। কিন্তু হিন্দী পৌরাণিক নাট্যরচনা এর ফলে বন্ধ হয়ে যায় নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ছায়ায় বচিত হিন্দী নাটক 'ধর্মযুদ্ধ' অসাধারণ জনপ্রীতি লাভ কবে।

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলার পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলির সাহিত্যে

পৌরাণিক এবং পুরাণ-নির্ভর নাটকের কাহিনী এবং উপস্থাপনায় বিশেষ তারতম্য ঘটতে দেখা যায় নি। এর একটাই কারণ হল, বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া এবং হিন্দী ভাষাভাষী জনসাধারণের মনে পুরাণ-চর্চা কয়েক শতাব্দীর একনিষ্ঠ উৎসাহে সমৃদ্ধ। তা ছাড়া পূর্ব ভারতের বিভিন্ন ভাষায় রচিত পৌরাণিক নাটকের আলোচনায় দেখা যায় সেগুলির মধ্যে একটি অপ্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' নাটগীতের প্রভাবেই হিন্দীতে কীর্তনীয়া নাটক, উড়িষ্যায় লীলা ও সুয়াঙ্গ-মিশ্রিত রচনা, এবং আসামে অংকীয়া নাটকের সূচনা। নাটগীত আসলে নৃত্য ও গীতের সহযোগে অভিনয়। নাট্যসাহিত্যের উদ্ভব এই নৃত্য ও গীতের সহযোগিতার মধ্য দিয়েই। ওড়িয়া, অসমীয়া, হিন্দী এবং বাংলা নাট্যধারায় এই নাটগীতের আঙ্গিকই একটি সমৃদ্ধতর মার্জিত অবয়ব লাভ করেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলা নাটকের ইতিহাস একশ' বছরেব কিছু বেশী হলেও নাটক বচনার পূর্ব প্রস্তুতির জন্য বাঙালী যে কয়েক শতাব্দী ধরে একনিষ্ঠ চর্চা চালিয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাটকের উপর পাশ্চাত্ত্য নাটক এবং সংস্কৃত নাটকের প্রভাব তীব্র হলেও পূর্ববর্তী কয়েক শতাব্দীর বাঙালীর নাট্যস্বভাবের কোন প্রভাবই বাংলা নাটকে পড়েনি, এমন কথা বলা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা পৌরাণিক নাটক জন্মের পূর্বে নাটগীত, লোকনাট্য এবং কৃষ্ণযাত্রাই বাঙালীর নাট্যতৃষ্ণাকে আংশিক সন্তুষ্ট করেছিল, পুরাণের কাহিনীকে নাট্যপাত্রে পরিবেশনের চেষ্টা করেছিল। অভিজাত সমাজে নাটগীত এবং অনভিজাত সমাজে লোক-নাট্যগুলি বাঙালীর নাট্যবোধ স্ফুরণে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল বাংলা পৌরাণিক নাট্য-সম্পর্কিত আলোচনার পূর্বে তার আলোচনা প্রয়োজন।

নাটগীত ॥

'নাট' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ নৃত্য [নট্ + অ (ভাবে ঘঞ্)] এবং বিস্তারিত অর্থ নৃত্যাভিনয়। নৃত্য-গীত বা নৃত্যাভিনয়-যুক্ত গীতকেই নাটগীত বলা যায়। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই মানুষের আনন্দোৎসবের উৎস ছিল নৃত্য ও গীত। পরে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অভিনয়। যাই হোক নাটগীতের অনুষ্ঠানস্থল ছিল দুটি। 'স্থাবর আসর' বসত দেবমন্দিরের সম্মুখে অথবা নাটমন্দিরে, আর 'জঙ্গম আসর' অনুষ্ঠিত হত শোভাযাত্রার গতিপথে ; দোলযাত্রা, স্নানযাত্রা ইত্যাদি অনুষ্ঠানে।

মধ্যযুগের বাঙালীর ধর্মীয় সংস্কারে বারিসিঞ্চন করেছিল নাটগীতগুলি। কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়ে জানা যায় বাঙালী সমাজে নাটগীতের সমাদর

যথেষ্টই ছিল,

নাটগীত দেখি শুনি পরম কুতূহলে।
কেহ বেদ পড়ে কেহ পড় এ মঙ্গলে॥
নানা মঙ্গল নাটগীত হিমালয়ের ঘরে।
পরম আনন্দে লোক আপনা পাসরে॥[১]

কৃত্তিবাস জয়দেবের নামোল্লেখ না করলেও বোঝা যায় তাঁর 'গীত-গোবিন্দ' তৎকালে নাটগীতিরূপে সুপরিচিত ছিল। সংস্কৃত ভাষায় রচিত বাঙালী কবির এই গ্রন্থটিতেই প্রথম বাঙালীর নাট্যাঙ্কুর উদ্গত হল।

গীতগোবিন্দের সংজ্ঞা নির্ণয়ে নানা মত প্রকাশিত হয়েছে। এটিকে বৈষ্ণবরা বলেছেন 'মহাকাব্য', বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন 'গীতিকাব্য'[২], আধুনিক সাহিত্য-ইতিহাসকার বলেছেন 'খণ্ডকাব্য'[৩]—আর বিদেশী সমালোচকদের মধ্যে উইলিয়ম জোনস্ বলেছেন **'Pastoral Drama'**, পিশেল বলেছেন **'Melodrama'**, লেভি বলেছেন **'Opera'** এবং শ্রোয়েডারের মতে **'গীতগোবিন্দ'** একটি 'উন্নতযাত্রা'। এই মতামতগুলি থেকে যে সত্যটি বেরিয়ে আসে তা হল গীতগোবিন্দে গীত, নৃত্য এবং অভিনয়ের যথেষ্ট গুণ উপস্থিত থাকলেও এটির সঙ্গে যাত্রার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই। নাটগীত অপেক্ষা যাত্রায় নাট্যধর্ম অনেক বেশী থাকে। নাটগীতে অঙ্ক বা দৃশ্যসজ্জাব পদ্ধতি অনুসৃত হয় না, যাত্রায় এগুলির স্থান আছে। যাত্রায় চরিত্রের সংখ্যা বেশী থাকে, গীতের পাশাপাশি সংলাপেরও একটি বিশেষ স্থান থাকে। সুতরাং যাত্রাকেই বরং নাটগীত অপেক্ষা উন্নততর নাট্যসৃষ্টি বলা যায়।

গীতগোবিন্দে একটি নাট্যকাহিনী আছে, আছে সংগীত আর আছে কয়েকটি নাটকীয় মুহূর্ত।

জয়দেব তাঁর নাটগীতের কাহিনী নির্বাচন করেছেন ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ এবং পদ্মপুরাণ থেকে। উভব পুরাণেই বসন্ত-রাসের প্রসঙ্গ আছে। গীত-

১. রামায়ণ, সাহিত্য পরিষদ্ সংস্করণ, উত্তরাকাণ্ড, পৃঃ ৬.
২. সাহিত্য গ্রন্থাবলী, বসুমতী সংস্করণ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩২
৩. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৩, পৃঃ ৮৬

গোবিন্দের সূচনায় দেখি রাধা বৃন্দাবনের গভীর প্রদেশে শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধানে ব্যাপৃতা। সে সময় জনৈকা সখী এসে রাধাকে একস্থানে নিয়ে গেলেন এবং দেখালেন বিলাসমত্ত কৃষ্ণ গোপীমণ্ডলী-বেষ্টিত হয়ে লীলারত। রাধা সেই স্থান ত্যাগ করার কিছু পরে রাধা-ধ্যানে ব্যাকুল কৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গ ত্যাগ করে যমুনা তীরবর্তী কুঞ্জে বিলাপ করতে শুরু করলেন। রাধা-প্রত্যাগতা সখীর মুখে রাধার মানসিক অবস্থা শুনে কৃষ্ণ সখীকে অনুরোধ করলেন রাধাকে আনবার জন্য। বিরহার্ত রাধা গমনে অসমর্থ হওয়ায় কৃষ্ণই তাঁর কুঞ্জে এলেন এবং প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে গেলেন। কিন্তু রাধার আকর্ষণকে অতিক্রম করা কৃষ্ণের সাধ্য নয়, তাই পুনরায় তাঁকে রাধা-সমীপে আসতে হয়, বলতে হয়—

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনম্
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্॥

[দশমঃ সর্গঃ, ১৯ সংখ্যক গীত]

জয়দেবের কাহিনী নির্বাচনে কোন ফাঁক নেই, কেননা প্রায় একই বিষয় নিয়ে পরবর্তীকালে ভাল কৃষ্ণযাত্রাও রচিত হয়েছিল। নাটগীতে গীতের জোয়ার বয়ে যায়, গীতগোবিন্দেও তার বিপরীত ঘটেনি। এই গ্রন্থে সখীর মুখে ১৪টি, রাধার মুখে ৮টি এবং কৃষ্ণের মুখে ৩টি গান ব্যবহৃত। দুটি গান সম্ভবতঃ সূত্রধারের এবং সর্বপ্রথম গীতটিকে স্তোত্র বলে ধরে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। এই গানগুলি, বলতে বাধা নেই, গীতগোবিন্দের প্রাণসম্পদ স্বরূপ জেগে রয়েছে।

নাটকের প্রধান উপাদান হল নাটকীয়তা। নাটগীতে নাটকীয়তা ব্যবহারের যেটুকু সুযোগ থাকে জয়দেব ততটুকু সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সংলাপের অভাবে এই নাটকীয়তা জমে উঠতে পারে নি। তা ছাড়া গীতগোবিন্দের পৌরাণিক কাহিনীতে তেমন কোন অংশ নেই যার মধ্য দিয়ে রাধা ও কৃষ্ণের চিত্তপ্রদেশে প্রচণ্ড ঝড় উঠতে পারে—ঘটনার আকস্মিক উত্থান-পতন ঘটতে পারে। একমাত্র অষ্টম সর্গে রাধার গীতের মধ্য দিয়ে নাট্যাভাস প্রকাশিত হয়েছে। চরিত্রের দ্বন্দ্ব ঈষৎ দানা বেঁধেছে।

জয়দেবের গীতিপ্রতিভা তাঁর নাট্যপ্রতিভা অপেক্ষা সজীব ছিল বলে 'গীতগোবিন্দ' নাটগীত লক্ষণাক্রান্ত রচনামাত্র হয়ে রইল, নাটক হল না।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—'গুজরাতের কবি রামকৃষ্ণ রচিত গোপাল কেলিচন্দ্রিকা নাটক গ্রন্থেও গীতগোবিন্দের অনুরূপ পদাবলী দৃষ্ট হয়; এই রচনাটি নামে নাটক হইলেও সংস্কৃত নাটকের লক্ষণাক্রান্ত নহে বরং পুরাতন দেশীয় যাত্রার প্রভাবে ইহাতে নাট্যকলা বা প্রকৃত নাট্যবস্তুর অভাব, গানের আধিক্য ও ভাবপ্রবণতার প্রতি সুস্পষ্ট পক্ষপাত দেখা যায়।...পরবর্তী সময়ের আনন্দলতিকা, নন্দঘোষ বিজয়, চিত্রযজ্ঞ প্রভৃতি নাটক নামধেয় রচনাগুলিও বোধ হয় এই ধারারই অনুসরণ করিয়াছে।... নেপালে আবিষ্কৃত হরিশ্চন্দ্র নৃত্যও এই ধরণের মিশ্র রচনা।'[৪] জয়দেব-অনুসৃত পথেই ওড়িয়া, অসমীয়া এবং হিন্দী সাহিত্যে পুরাণাশ্রয়ী ভক্তি-নাটক রচনায় সাড়া জেগেছিল। ঐ সকল অঞ্চলের নাটকেও জয়দেবের ন্যায় শুরুতে স্তোত্র প্রয়োগ, অতঃপর সন্দর্ভ শ্লোক এবং গীত ব্যবহৃত হয়েছে। আঙ্গিক এবং রস উভয় দিক থেকেই ভারতের অনেকগুলি প্রাদেশিক সাহিত্যে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র গুরুত্বপূর্ণ অনুসরণ ঘটেছে।

বাঙালীর নাট্যস্বভাবের দ্বিতীয় স্ফুরণ বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থটি। গীতগোবিন্দের ভাষা ছিল সংস্কৃত, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা হল বাংলা। গীতগোবিন্দে ছিল বর্ণনার প্রাধান্য, কৃষ্ণকীর্তনে ঘটনা প্রায়শঃ এগিয়েছে সংলাপের মধ্য দিয়ে। এবং সেজন্যই কৃষ্ণকীর্তনে নাট্যরস জমে উঠেছে।

চৈতন্য-পূর্ব দুটি নাটগীতই কৃষ্ণ-লীলা বিষয়ক। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণকথার ভিতর এমন একটি মাধুর্য আছে যা বাঙালীর জীবনচর্যার সঙ্গে অচ্ছেদ্য-জড়িত। লক্ষণীয় কেবলমাত্র এই দুটি নাট্যোপম রচনাতেই নয়, মধ্যযুগের নাট্যসাহিত্যের প্রধানতম বিষয়বস্তু এই রাধা-কৃষ্ণলীলা। আরও একটু অগ্রসর হয়ে বলা যায় সমগ্র মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষেই কৃষ্ণ-কথার জয়জয়কার —কি কাব্যে কি নাট্যজাতীয় রচনায়। রাম-কাহিনীর জনপ্রিয়তা নাটকের পৃষ্ঠায় পৌঁছুতে পারেনি, কৃষ্ণ-চরিত্রের পদপাত সর্বত্র।

৪. 'কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ', কলিকাতা, ১৩৭২, ভূমিকা, পৃঃ ৭৩

গীতগোবিন্দের তুলনায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নাটগীতে নাটকের আবেদন অপেক্ষাকৃত অধিক। কাহিনীর ব্যাপ্তিই এই নাট্যরস ঘনীভূত হওয়ায় সহায়ক হয়েছে। সূচনার জন্মখণ্ড এবং পরিণতির 'রাধাবিরহ' খণ্ডকে পাশে সরিয়ে রাখলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে একটি নাট্যসংঘাতময় কাহিনীর দেখা মেলে। 'জন্মখণ্ড'টিকে যদি প্রস্তাবনা রূপে ধরা যায় তাহলে ক্ষতি হয় না। তাম্বুলখণ্ডে নাট্যসূত্রের আভাস মিলেছে। বড়াই-এর মুখে রাধার আনুপূর্বিক রূপ বর্ণনা শুনে অস্থির কৃষ্ণ বড়াইর মাধ্যমে প্রেম প্রস্তাব পাঠান, তাম্বুল উপহার দেন। রাধা বড়াইকে এক চড় মারেন, কৃষ্ণ-প্রেরিত ফুল-পান-কর্পূরে পদাঘাত করেন।

তাম্বুলখণ্ডেই রাধা-কৃষ্ণের সংলাপে নাট্যরস জমে উঠেছিল, দান এবং নৌকাখণ্ডে পৌঁছে নাট্যরস আরও ঘন হল। এই দুই খণ্ডে রাধা-কৃষ্ণের পাশাপাশি বড়াইও একটি মুখ্য চরিত্রে পরিণত হয়েছে। দানখণ্ডে অসহায় রাধার কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণের ছবিটি নাটকীয়তায় উজ্জ্বল। যে রাধার মুখ থেকে কৃষ্ণের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি ঝরেছিল সেই রাধাই আজ কিংকর্তব্য-বিমূঢ়া। তাঁর চরিত্রের দ্বন্দ্ব বড়াইয়ের প্রতি উক্তিতেই প্রতিফলিত হয়েছে—

হেন মনে করে বিষ খাআঁ মরি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥১॥ ..

রাধার পূর্ণ দেহদান ঘটেছে নৌকাখণ্ড থেকে; আর আত্মদান ঘটেছে বংশীখণ্ডে। রাধাচরিত্রের মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্বের ঝড় উঠেছে সেই ঝড়ই প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থটিকে নাটকীয় সম্ভাবনার দিকে নিয়ে গিয়েছে। যমুনাখণ্ড এবং হারখণ্ডে রাধা কৃষ্ণের প্রতি দেহমন সমর্পণ করেছেন এবং এই সমর্পণের সঙ্গে তাঁর লজ্জা এবং ভয় যুক্ত করে নাটকীয় উৎকণ্ঠা বাড়িয়েছেন। বংশীখণ্ডের রাধা-বড়াই সংলাপের মধ্য দিয়ে কাহিনী একটি বাঞ্ছিত পরিণতির দিকে এগিয়েছে।

সংলাপ নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান। নাট্যসংঘাতময় সংলাপে চরিত্র এবং কাহিনী উভয়েরই পুষ্টি ঘটে। 'গীতগোবিন্দে' সংলাপ ছিল না কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তাম্বুলখণ্ড থেকে 'রাধাবিরহ' পর্যন্ত প্রতিটি খণ্ডেই সংলাপের মধ্য দিয়ে কাহিনী প্রায়শঃ এগিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে

নাটকীয় গতি বা action সৃষ্টিতে মাঝে মাঝে সংলাপ যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা দু'একটি উদাহরণ দিলেই বোঝা যায়।—

কৃষ্ণ। পুরব জনমে কৈল জলধি মথানে।
তোহ্মে লক্ষ্মী রাধা এবেঁ আহ্মে হরি কাহ্নে ॥ ৬ ॥

রাধা। সকল পুরুবকথা মিছা কহ তোহ্মে।
কথাঁ কাহ্ন হরি তোহ্মে কথাঁ লক্ষ্মী আহ্মে ॥৭ ॥

কৃষ্ণ। তোহ্মে ত না জান রাধা আহ্মার মায়া।
স্বগ্‌গ মর্ত্য পাতালে আহ্মার এক কায়া ॥ ৮ ॥

রাধা। রাখোআল হআঁ বোল জগতনিবাস।
সুণিআঁ করিব তোরেঁ লোক উপহাস ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণ। বিণি দান পাইলেঁ আজি না এড়িবোঁ তোরে।..........

[দানখণ্ডং]

অথবা —

কৃষ্ণ। এহা যমুনাত মো অধিকারী।
আহ্মার বচন সুণ সুন্দরী ॥ ৭ ॥

রাধা। তোর মোর আর বচন নাহীঁ।
বুঝিল তোহ্মার মতী কাহ্নাঞিঁ ॥ ৮॥

কৃষ্ণ। সুদ্ধ সুবন্নের মোর কিঙ্কিনী।
এহা নেহ মোর ধরহ বাণী ॥ ৯ ॥

রাধা। গোআলিনী আহ্মে নহোঁ নাচুনী।
মোর কাজ নাহি তোর কিঙ্কিনী ॥ ১০ ॥

[বস্ত্রহরণ খণ্ডঃ]

সংলাপের মধ্য দিয়ে যেরূপ, সেইরূপ বিভিন্ন 'খণ্ডে'র মধ্য দিয়ে এই নাট্গীতে চরিত্রের বিকাশ হয়েছে। নাটকে অঙ্কগুলি যে ভূমিকা পালন করে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'খণ্ড'গুলি সেই কাজ করেছে। তবে নাটকের পূর্বাপর

সঙ্গতি এবং নিটোল বিবর্তন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সর্বত্র রক্ষিত হয়নি। সুরেশ মৈত্র যথার্থই বলেছেন—"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন একটি অখণ্ড নাটক নয়, এটি অনেকগুলি পালা বা নাটকের সমষ্টি।"[৫] স্থান-কাল এবং ঘটনাঐক্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে না থাকার ফলে পূর্ণাঙ্গ নাট্যাদর্শ গড়ে ওঠেনি। এ ছাড়া রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস স্বয়ং কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে হাজির হয়ে নাটকের সর্ত লঙ্ঘন করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মূল কাহিনী ভাগবত অনুসারী হলেও কবি অপৌরাণিক গ্রামীণ কাহিনীর উপরও নির্ভর করেছিলেন। এর কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি অভিমত মনে আসে—"বড়ু চণ্ডীদাস গ্রাম্য সমাজের জন্য তাঁর কাব্য লিখিয়াছিলেন বলিয়া ইহার মধ্যে নাটকীয়তা আরও তীক্ষ্ণভাবে প্রকট হইয়াছে—ইহার কাব্যগুণকে ছাড়াইয়া ইহার নাট্যগুণই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে।"

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি এবং জয়দেবের রচনার পাশাপাশি রায় রামানন্দের 'নাটকগীতি'ও চৈতন্যদেবকে আনন্দ দিত।[৬] কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কাহিনীকে নিয়ে রচিত যাত্রায় মহাপ্রভু স্বয়ং অভিনয় করতেন, এ তথ্য 'চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে আছে।[৭] সংস্কৃত ভাষায় রচিত রায় রামানন্দের 'জগন্নাথবল্লভ' নাটগীত চৈতন্যদেবকে বেশী আকৃষ্ট করেছিল। গীতগোবিন্দ অথবা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত গীতপ্রাধান্য এই গ্রন্থে নেই, গীতের পাশাপাশি এসেছে গদ্য সংলাপ। জয়দেবের পথ ধরে যেমন এসেছেন রামানন্দ রায়, তেমনি রামানন্দের পথানুসরণ করেছেন রূপ গোস্বামী। পৌরাণিক বিষয়বস্তুকে

---

৫. 'বাংলা নাটকের বিবর্তন,' কলিকাতা, ১৯৭৩, পৃঃ ৩১.

৬. "চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ দামোদর সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায়, শুনি পরমানন্দ॥"
—চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ৫ম অধ্যায়

৭. "তবে আচার্যের ঘরে কৈলা কৃষ্ণলীলা।
রুক্মিণী স্বরূপ প্রভু আপনে হৈলা॥" —চৈ. চ, আদিলীলা

নিয়ে মধ্যযুগীয় এই নাট্যচর্চার ধারাই পরবর্তী যুগে কৃষ্ণযাত্রার মধ্য দিয়ে পূর্ণবিকশিত হয়।

'জগন্নাথবল্লভ নাটকে'র সঙ্গে পরবর্তী কৃষ্ণযাত্রার কোন কোন ক্ষেত্রে সাদৃশ্য রয়েছে। প্রথমতঃ অন্যান্য নাটগীতের তুলনায় 'জগন্নাথবল্লভে'র কাহিনী ঈষৎ সমৃদ্ধ হলেও সঙ্গীত যথেষ্ট প্রাধান্য পাওয়ায় কাহিনীর যথাযথ বিকাশ হয়নি। কৃষ্ণযাত্রাগুলিতেও কাহিনী-দৈন্যের এইটিই কারণ। দ্বিতীয়তঃ 'জগন্নাথবল্লভে' গদ্যসংলাপের পরিপূরক হিসাবে একটি করে গান এসেছে। এখানেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে 'জগন্নাথবল্লভ' নাটগীতের পার্থক্য। যাত্রায় চরিত্রের সংলাপ উক্ত হওয়ার পরই গান আসে। তৃতীয়তঃ 'গীতগোবিন্দ' অথবা 'কৃষ্ণকীর্তনে' কোন অঙ্কবিভাগ ছিল না, 'জগন্নাথবল্লভে' পৌঁছে প্রথম অঙ্ক-বিভাগ পাওয়া গেল—পূর্বরাগো নাম প্রথমোঽঙ্কঃ, ভাব-পরীক্ষা নাম দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ, ভাব-প্রকাশো নাম তৃতীয়োঽঙ্কঃ প্রভৃতি। এই রসের ভিত্তিতে অঙ্ক-বিন্যাস রীতি পরবর্তী যাত্রা সাহিত্যেও আচরিত হয়েছে।

'জগন্নাথবল্লভ' নাটগীতে রাধা-কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা উপস্থিত। কিন্তু গীতগোবিন্দ অথবা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে উভয়ের মিলন-দৃশ্য যেরূপ অবারিতভাবে চিত্রিত এই নাটগীতে তা নেই। পঞ্চাঙ্কে বিন্যস্ত এই নাটগীতে শেষ অঙ্কে রাধাকৃষ্ণের সম্ভোগের আভাসমাত্র দেওয়া হয়েছে। ক্লাসিকাল নাট্যকলার সংযম-নির্দেশ রামানন্দ মেনেছিলেন বলেই তাঁর রচনায় কোন অসংযম নেই।

'জগন্নাথবল্লভে' প্রথম সখীর নামকরণ করা হয়েছে, সে মদনিকা। আর একটি চরিত্র হল মধুমঙ্গল—সংস্কৃত নাটকে এবং বাংলা পৌরাণিক নাটকে যার পরিচয় বিদূষক রূপে। এ ছাড়া সূত্রধার এবং নটীও উপস্থিত। 'নান্দ্যন্তে অলমতি বিস্তারেণ' উক্তির পর সূত্রধার নটীকে আহ্বান করেন। অতঃপর নট ও সূত্রধারের কথোপকথন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নাটগীতের আসল কাহিনীর সূচনা।

লোক-নাটগীত ॥

গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং জগন্নাথবল্লভ—এই ত্রয়ী নাটগীতের রচয়িতারাই অভিজাত সমাজের মানুষ, তাঁদের রচনা পুরাণকে অভিজাত

সমাজের রসাবেদনের জন্যই উৎসাহ দিল। সাধারণ সমাজের মানুষের কাছে এই নাটগীতগুলির গভীর রস প্রবাহিত হতে পেরেছিল কিনা জানা যায় না। সেজন্যই মধ্যযুগে আর এক জাতীয় নাটগীত দেখা দিয়েছিল, সেগুলিকে লোকনাট্য (Folk Drama) রূপে চিহ্নিত করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। নিরক্ষর অথবা স্বল্পশিক্ষিত রচয়িতারা সহজভাষায় এবং জনরুচির প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই লোক-নাটগীতগুলি রচনা করতেন। ঝুমুর, ধামালী, কথকতা, পাঁচালী, জাগ-গান, গম্ভীরা এবং ছৌ ইত্যাদির ভিতর বাংলা লোক-নাট্যের বিকাশ হয়েছে এবং কৃষ্ণযাত্রার জনপ্রিয়তার পূর্বে এগুলিই সাধারণ বাঙালীর নাট্যপিপাসাকে তৃপ্ত করেছে। এই লোকনাট্যগুলি পল্লীবাংলার জনচিত্ত এমনভাবে আকৃষ্ট করেছিল যে এই অত্যাধুনিক যুগেও গ্রাম বাংলার মানুষের মন থেকে তাদের আবেদন মুছে যায়নি।

'ধামালি' বা 'ঢামালি' মধ্যযুগের বাঙালীর রঙ্গরসকে অনেকটা তৃপ্ত করেছিল। পূর্ববর্তী পুরাণগুলিতে দেব-চরিত্রে রঙ্গরসিকতা আরোপিত হয়নি, ধামালিতে এর সূচনা। পৌরাণিক কৃষ্ণ এই লোক-নাটগীতের প্রায়শঃ নায়ক ছিলেন বলেই 'ধামালি'র সাধারণ্যে পরিচিতি 'কৃষ্ণধামালি' রূপে। কিন্তু 'কৃষ্ণধামালি'র কৃষ্ণ চরিত্রে যে গ্রাম্য রুচিহীনতার প্রয়োগ ঘটেছে তা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ব্যতীত অন্য নাটগীতে দুর্লভ।

কৃষ্ণধামালির বিষয়বস্তু আহরিত হয়েছে প্রধানতঃ অর্বাচীন পুরাণ থেকে। দানলীলা, নৌকাবিলাস এবং ভারখণ্ডের কৃষ্ণ চরিত্রে মানবীয় কামনা অধিক প্রতিফলিত বলে রচয়িতারা সেই কাহিনীই অনুসরণ করেছেন। এই সূত্রে লোচনদাসের ধামালির কথা মনে আসে। কৃষ্ণলীলার কাহিনী যে পরবর্তীকালে রূপান্তরিত হয়েছিল সেই কথাপ্রসঙ্গে কালিদাস রায় লিখেছেন—"রাধা-কৃষ্ণের ঢামালি শিব-দুর্গার ঢামালিতে পরিণত হইয়াছে, শুকসারীর দ্বন্দ্বে নবরূপ লাভ করিয়াছে, মঙ্গলকাব্যের সপত্নী কলহে এবং অন্যান্য রসকলহে রূপান্তরিত হইয়াছে।···ঢামালির বড়াইটী বিদ্যাসুন্দর কাব্যে কুট্টনীর রূপ ধরিয়াছে।"[৮]

লোক-নাট্যের আর একটি ধারা হল ঝুমুর। পশ্চিম বাংলার রাঢ়

৮. 'প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য', তৃতীয়াংশ, কলিকাতা, ১৩৫৮, পৃঃ ২১৬

অঞ্চলেই ঝুমুরের ব্যাপক প্রচার ছিল সত্য কিন্তু ঝুমুরের আদিম রূপটি যে বিহারের ছোটনাগপুর থেকে সুদূর গুজরাটের প্রান্তীয় অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল সে সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্য বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[৯]

ঝুমুর লোক-নাট্যে গায়কদল দু'টি বা তিনটি দলে বিভক্ত হয় এবং ভূমিকা বিভাজন হয় এক এক জনকে আশ্রয় করে। প্রধানতঃ সঙ্গীতের মধ্য দিয়েই উক্তি-প্রত্যুক্তি চলে। এই প্রসঙ্গে পীতাম্বর দাসের চারটি 'ঝুমুর সঙ্গীত' পালার নাম করা যায়—দানলীলা, গোষ্ঠলীলা, সুবল সংবাদ ও কলঙ্কভঞ্জন। পীতাম্বরের ঝুমুর পালায় আদিরসের পরিবর্তে কৃষ্ণলীলার স্নিগ্ধরস স্থান পেয়েছে। বাৎসল্য এবং সখ্যরস-পূর্ণ কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক 'অংকীয়া নাট' অসমীয়া ভাষাতেও আছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি পীতাম্বর দাসের 'গোষ্ঠলীলা' পালা। এই পালার শুরু যশোদা ও আয়ানের উক্তি-প্রত্যুক্তিতে। সেই সময় রাখালরা কৃষ্ণকে গোষ্ঠে যাবার জন্য ডাকতে এলেন—

জীবন কানাই আয় রে গোচারণে।

জননী যশোদা এতে রাজী নন—

গোষ্ঠে বিদায় দিব না গোপালে।

সুবলও ছাড়বার পাত্র নন—

জননী গো বিনয় করি তোরে।

যশোদার কিন্তু স্থির প্রতিজ্ঞা—

আজ পাঠাব না গোচারণে।

সুবল প্রশ্ন করেছেন—

নন্দরাণী চিন্তা কর কেনে ?

এরপর স্বয়ং কৃষ্ণ বলেন—

ও মা আমায় দে গো বিদায় গোচারণে যাই।

অগত্যা যশোদাকে সম্মতি দিতে হল। এই সব ঝুমুর-পালায়

---

৯. 'বাংলার লোকসাহিত্য'; তৃতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৫, পৃঃ ১৩৪-১৩৫.

আদি রসাত্মক কোন উক্তি-প্রত্যুক্তি না থাকলেও জনপ্রীতি জয়ে কোন বাধা ঘটত না।

পুরুলিয়ার 'ছৌ' নাচে কৃষ্ণ-কাহিনী একটি দীর্ঘ অংশ জুড়ে আছে। কৃষ্ণ-কথা ছাড়া রামায়ণ, মহাভারত এবং অন্যান্য পুরাণের নাট্যসমৃদ্ধ কাহিনী-অংশ নিয়ে এক একটি ক্ষুদ্র পালা রচিত হয়। রাম-কথা এবং ভারত-কথার যে যে অংশে যুদ্ধের বর্ণনা আছে, ছৌনাচে প্রধানতঃ সেই বীররসাত্মক অংশগুলিই অবলম্বিত হয়।

উত্তরবঙ্গের মালদহ অঞ্চলে প্রচলিত গম্ভীরা লোকনাট্যেও ছৌ নাচের মত মুখোশ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ছৌ নাচে যেমন সর্বত্র মুখোশের ব্যবহার, গম্ভীরাতে তা নয়। গম্ভীরা নাট্যকলার শেষ দিনে অনুষ্ঠিত হয় 'আলকাপ' —গম্ভীরার মূল অনুষ্ঠানের মত 'আলকাপ' ভাবগম্ভীর নয় বরং বলা যায় তা লঘুভাব-প্রকাশক।

ছৌ নাচে উক্তি-প্রত্যুক্তিহীন সংক্ষিপ্ত নৃত্য ও নাট্যানুষ্ঠানে একটি সুন্দর নাট্যজগৎ গড়ে ওঠে। নাটকের মত ছৌ নাচেও কাহিনীর Rising action, climax এবং catastrophe আছে। কথোপকথন না থাকলেও গ্রামীণ জনমণ্ডলী তাদের চিত্তসঞ্চিত পৌরাণিক গল্পের সঙ্গে নর্তকদের অঙ্গভঙ্গি এবং বাদ্যের উত্থান-পতনের একটি সুন্দর সেতুবন্ধন করে নেয়।

গম্ভীরা এবং ছৌ-নাচে যাত্রার অভিনেতাদের মত পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহৃত তবে ছৌনাচে মুখোশ ব্যবহারের বিষয়টি অত্যাবশ্যক। গ্রীক নাটকের অভিনয়ে, ইতালীর কমেডিয়া-ডেল-আর্টে বা মুখোশ-কমেডিতে মুখোশ ব্যবহারের প্রথা ছিল। তবে মাসক বা মুখোশ ব্যবহারের চূড়ান্ত ঘটে বেন জনসনের সময়। পুরুলিয়ার মত সরাইকেলার ছৌ এবং দাক্ষিণাত্যের কথাকলিতেও মুখোশ ব্যবহৃত হয়। বাংলা নাটকে 'তাসের দেশ' এর সহচর। তবে সে নাটকে সংলাপও আছে।

গম্ভীরা এবং ছৌ নাচ-এ দুটি লোক-নাটগীতের মধ্যেই নাটক গড়ে ওঠার সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল। কিন্তু অত্যধিক কৌম-আনুগত্যের ফলে যেমন গম্ভীরা নাটক হতে পারেনি তেমনি সংলাপের অভাবে ছৌ-নাচও নাটকীয় সম্ভাবনাকে সফল করতে পারেনি।

যাইহোক মধ্যযুগের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় নাটগীত এবং লোক-নাট্যগুলির মধ্য দিয়েই সে যুগে বাঙালী তার নাট্যরসপিপাসা তৃপ্ত করেছিল। নাটগীত, পাঁচালী, ঝুমুর, কথকতা, জাগ-গান এবং অন্যান্য লোক-নাট্যের মধ্যে যে পৌরাণিক বাতাবরণ সৃষ্টি হত পরবর্তীকালের কৃষ্ণযাত্রার উপর তা সর্বত্র প্রভাব ফেলেছে এমন কথা বলা যায় না। তবে এ কথা সত্য মধ্যযুগীয় এই রচনাগুলি নানা আঙ্গিকে পুরাণের গল্প-কাহিনীকে সজীব ও চিত্তাকর্ষক করে রেখেছিল। বাংলা পৌরাণিক নাটকের উদ্ভবের পূর্ব পর্যন্ত ঠিক এই দায়িত্বটি সমভাবে পালন করেছিল কৃষ্ণযাত্রা। কৃষ্ণযাত্রা আলোচনার পূর্বে নাটগীতের আলোচনা না করলে যেমন একটি অধ্যায় অনালোকিত রয়ে যায়, তেমনি বাংলা পৌরাণিক নাটক আলোচনার পূর্বে কৃষ্ণযাত্রার আলোচনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী নাট্যকারগণ পাশ্চাত্ত্য ইংরেজী নাটক এবং সংস্কৃত নাটকগুলিকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন। অপরদিকে দীর্ঘকালের যাত্রার ধারাটিও তাঁদের সামনে ছিল। বাংলা নাটকের জন্মের দীর্ঘকাল পূর্ব থেকে জাতির চিত্তে আনন্দদানের দায়িত্ব নিয়েছিল যাত্রা। যাত্রার জন্মেতিহাস থেকে যৌবন-বিকাশ পর্যন্ত যে ধারাটি চলেছে তার গভীরে দৃষ্টিপাত করলে সহজেই বোঝা যায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের যাত্রার সঙ্গে তার পূর্ববর্তী যাত্রার মিল খুব কম। কেবলমাত্র উৎসব অর্থেই মধ্যযুগে 'যাত্রা' বোঝাত, যাত্রার কোন অভিনেয় রূপের পরিচয় মধ্যযুগে পাওয়া যায়নি। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বাংলা নাটকের জন্মকাল পর্যন্ত বাঙালী যাত্রার ভিতর দিয়েই নাট্যপিপাসা চরিতার্থ করেছে। এই পর্বে রচিত কৃষ্ণযাত্রাগুলি লোকশিক্ষার ব্রত যেমন গ্রহণ করেছিল, তেমনি উপহার দিয়েছিল পুরাণের নাট্যরসসমৃদ্ধ কাহিনীর। আমাদের জাতীয় জীবনের কৃষ্টিকে কৃষ্ণযাত্রাগুলি সযত্নে রক্ষা করেছিল বলেই উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাটকের উপর এই যাত্রাগুলির প্রত্যক্ষ প্রভাব না পড়লেও পৌরাণিক নাটকগুলির উপর নানা দিক থেকে কৃষ্ণযাত্রার প্রভাব পড়েছিল।[১]

---

১. At the sametime it must be said that some of the particular features of Yatra, such as its overflow of song and dance, its long drawn-out theme, its predilection for declamation, Rhetoric, and irrelevant farcical episodes, continued to manifest themselves throughout the history of the Bengali theatre to the days of Girishchandra Ghosh and Kshirod Prosad, and even upto the present time.

—De, S. K. : Bengali literature in the Nineteenth century, Calcutta, 1962, pp 643-44.

যাত্রার উদ্ভব ॥

কৃষ্ণযাত্রা-সম্পর্কিত আলোচনায় প্রবেশের সূত্রে যাত্রার জন্ম সম্পর্কে আলোচনা এসে পড়ে। সংস্কৃত 'যা' ধাতু থেকে উৎপন্ন 'যাত্রা' শব্দের অর্থ 'গমন'। বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে দেবতাকে নিয়ে ভক্তদের উৎসবই মধ্যযুগে যাত্রা রূপে পরিচিত হত। 'রথযাত্রা', 'স্নানযাত্রা' ইত্যাদি উৎসবে এই রীতি এখনও বাংলা, উড়িষ্যা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত রয়েছে। রথযাত্রার সূত্রপাত হয়েছিল সুপ্রাচীন বৌদ্ধযুগে, স্নানযাত্রার সূত্রপাত পৌরাণিক যুগে। বৌদ্ধযুগের পর বাংলাদেশে সূর্যপূজার প্রচলন ঘটে। সৌরোৎসবকে কেন্দ্র করেই সর্বপ্রথম এই উৎসবের প্রচলন।[২] পরবর্তীকালে এই সৌরোৎসবই কৃষ্ণোৎসব, শিবোৎসব ইত্যাদি উৎসবে পরিবর্তিত হয়। লক্ষ্য করলে দেখা যায় সমগ্র পূর্ব-ভারত জুড়ে এককালে কৃষ্ণোপাসনা জনপ্রিয় ছিল। প্রতি বছর সূর্যের চারবার চারটি 'যাত্রা' বা কক্ষপরিবর্তন ঘটে। তার ভিতর প্রধান দুটির নাম সূর্যের 'উত্তরায়ণ' এবং দক্ষিণায়ন'। বর্ষাকালে সমগ্র পূর্ব ভারত জুড়ে সূর্যের দক্ষিণদিকে যাত্রাকে কেন্দ্র করে প্রধান সূর্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবই পরবর্তীকালে 'রথযাত্রা' রূপে পরিচিত হয়। সূর্যের দক্ষিণায়নকে উপলক্ষ করে যে উৎসব তার নাম চড়কোৎসব। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে, চৈতন্য-ভাবনায় বাংলার নগর ও গ্রাম নবজীবনের পরিচয় পায়। স্বাভাবিক-ভাবেই এই সময় কৃষ্ণকেন্দ্রিক উৎসব 'কৃষ্ণযাত্রা' রূপে পরিচিত হয়, যেমন দোলযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা।[৩] সূর্য সেখানে কৃষ্ণ এবং দ্বাদশ রাশি দ্বাদশ গোপিনীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। রথাসীন সূর্যের স্থানে বসেছেন কৃষ্ণ অথবা জগন্নাথ। সূর্যদেব এইরূপে শিবঠাকুরেও রূপান্তরিত হয়েছিলেন।

২. আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬০) গ্রন্থে এ বিষয়ে দীর্ঘ মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন (পৃঃ ৬৬-৬৮)।

৩ "বৎসরের তিনটি পূর্ণিমায় তিন যাত্রা হইয়া থাকে। এক দোল পূর্ণিমা—দোল যাত্রা। দ্বিতীয় ঝুলন পূর্ণিমা—ঝুলন যাত্রা। তৃতীয় রাস পূর্ণিমা—রাস যাত্রা। নাচ—নাচ—নাচ, নাচ ছাড়া পুষ্টি নাই, নৃত্য ছাড়া প্রকৃতির উন্মেষ ঘটে না। এই তিন যাত্রায় প্রকৃতির তিন স্তরের নৃত্যের বিকাশ ঘটান আছে।"—বাঙ্গালী : ১৩২৬

মন্মথমোহন বসু তাঁর 'বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' গ্রন্থে একটি যাত্রাপালার দীর্ঘ আলোচনা করে দেখিয়েছেন কিরূপে সূর্য ধীরে ধীরে কৃষ্ণ এবং শিবের মধ্যে বিবর্তিত হয়েছিলেন। প্রাসঙ্গিকক্রমে বলা যায় বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী ছোটনাগপুরের 'ওঁরাও যাত্রা', দাক্ষিণাত্যের 'মারী-যাত্রা', সাঁওতাল পরগণার 'যাত্রা-পরব' এবং উড়িষ্যার 'সাহীযাত্রা'ও দেবোৎসব-নির্ভর।

বাংলা যাত্রার উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনাসূত্রে একাধিক সমালোচক পাঁচালীর কথা বলেছেন। সুকুমার সেন লিখেছেন—'পাঁচালী হইতেই যাত্রার উদ্ভব"।[৪] মন্মথমোহন বসুর অভিমত হ'ল—'পাঁচালী গানের ক্রমিক পরিণতির ফলে যাত্রাগানের উৎপত্তি।'[৫] যে পাঁচালীকে যাত্রার উৎস রূপে তাঁরা বেছে নিয়েছেন সেগুলি নতুন পাঁচালী বলেই মনে হয়। কেননা প্রাচীন পাঁচালীর ভিতর কোন নাট্যরস ছিল না, ছিল অপার ধর্মভাবের প্রস্রবণ। এই প্রাচীন পাঁচালীর বিকাশের সময় যাত্রারও দেখা মিলেছিল। সুতরাং যাত্রা যে নতুন পাঁচালীর অগ্রপথিক সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রাচীন পাঁচালীতে রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতের কাহিনী যেমন উপস্থিত হত তেমনি শনির পাঁচালী, লক্ষ্মীর পাঁচালী ইত্যাদিও রচিত হত।

রূপাঙ্গিকের দিক থেকে প্রাচীন পাঁচালী এবং নবীন পাঁচালীর ভিতর দুস্তর প্রভেদ। গল্পকাহিনী বর্ণনা মুখ্য লক্ষ্য ছিল বলে প্রাচীন পাঁচালীতে পয়ার ছন্দই ব্যবহৃত হত। মাঝে মাঝে ত্রিপদীর দেখা মিললেও তা সংখ্যায় অপ্রতুল। চৈতন্য-পূর্ব কবি মালাধর বসুর পাঁচালী পয়ার নির্ভর, চৈতন্য-পর মুকুন্দরাম অথবা কাশীরাম দাসের পাঁচালীতে ত্রিপদী যথেষ্ট ব্যবহৃত। দাশরথি রায়ের পাঁচালীতেও এই রীতি অনুসৃত। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালীতে খানিকটা অংশ ছড়ার, পরে কিছুটা অংশ গানের; অতঃপর পুনরায় ছড়ার যে রীতি দেখা যায় সেই শ্রেণীবদ্ধ রীতি প্রাচীন পাঁচালীতে দুর্লভ। প্রাচীন পাঁচালীতে যেখানে কেবল পয়ার ও লাচাড়ীই

৪. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড, অপরার্ধ), কলিকাতা, ১৯৬৫, পৃঃ ৫৯০

৫. বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, কলিকাতা, ১৯৫৯, পৃঃ ৪৮

ব্যবহৃত হত সেখানে নবীন পাঁচালীতে নানা রাগ-রাগিণী যুক্ত হয়েছে। আর একটি কথা, পাঁচালী গদ্য-সংলাপহীন রচনা। যাত্রায় গদ্য সংলাপের স্থান নগণ্য ছিল না। সে জন্যই বলা যায় নবীন পাঁচালীর প্রকৃতি দেখে বাংলা যাত্রার উপর প্রাচীন পাঁচালীর প্রভাব খোঁজা ঠিক নয়। তবে একথা ঠিক প্রায় সমসময়ে কবিগান, নবীন পাঁচালী এবং কৃষ্ণযাত্রা রচিত হওয়ার ফলে বিশেষতঃ সংগীতের দিক থেকে তাদের ভিতর একটি ঘনিষ্ঠতা দেখা যায়। এই সূত্রে বলা যায় পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের যুগেও বাংলা নাটক-গুলির উপর যাত্রার সংগীতময়তা স্পষ্ট প্রভাব সঞ্চারিত করেছিল। নবীন পাঁচালীর সঙ্গে এদিক থেকে যাত্রার স্বাভাবিক সাদৃশ্য ঘটলেও প্রাচীন পাঁচালীর প্রভাবের কথা চিন্তা করা বৃথা।

কৃষ্ণযাত্রা ॥

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সকল শাখা-প্রশাখাই প্রধানতঃ ধর্মীয় ভাবকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল। রাধা-কৃষ্ণলীলা, চৈতন্যলীলা এবং দেব-দেবীর মাহাত্ম্য কাহিনীই ছিল মধ্যযুগের যাত্রার বিষয়বস্তু। চৈতন্য-সমকালে চৈতন্যদেবেরই উৎসাহে কৃষ্ণকথা-বিষয়ক পালাগান একটি মূর্ত রূপের প্রকাশ করছিল। রূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধ মাধব' নাটক পর্যন্ত এই গতি অব্যাহত ছিল।

সমগ্র মধ্যযুগে বৈষ্ণব-ধর্মাশ্রয়ী রচনাসমূহের ভিতর জীবন-প্রসঙ্গ বর্ণনাই মূল লক্ষ্য ছিল বলে কৃষ্ণ-জীবন নির্ভর যাত্রাগুলি কৃষ্ণযাত্রা রূপে পরিচিত হয়। কৃষ্ণ চরিত্রে দেবত্ব-প্রতিষ্ঠা প্রধান লক্ষ্য হওয়ায় এই যাত্রাগুলিতে দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম প্রায় ছিলই না এবং স্বাভাবিকভাবেই কৃষ্ণযাত্রাগুলিতে নাটকীয় কৌতূহল সৃষ্টির সুযোগও ছিল সীমিত। দর্শনের সঙ্গে কবিতার বিমিশ্রণের ফলে কৃষ্ণযাত্রার কাহিনীতে যে নাটকীয় সম্ভাবনা ছিল তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটতে পারেনি।

কৃষ্ণযাত্রার ভিতর কৃষ্ণের দীর্ঘ লীলা-কাহিনী বর্ণিত হত, কিন্তু 'কালীয়দমন' যাত্রায় কৃষ্ণের কালীয় নামক সর্পের দমন-কাহিনীর প্রতি বিশেষভাবে আলোকপাত করা হত। কৃষ্ণযাত্রার পাশাপাশি কালীয়দমন যাত্রার ব্যাপক দেখা যায়। অজিতকুমার ঘোষের অভিমত হল—

'মহাপ্রভুর পরে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক যাত্রাকে 'কালীয় দমন' এই সাধারণ নামে অভিহিত হইত।"[৬] এই উক্তি সম্পূর্ণ যথার্থ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে কৃষ্ণযাত্রা অথবা কালীয়দমন যাত্রার অভিনয় হলেও তার কোন তথ্য প্রমাণ আমরা পাইনি। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে ব্যাপক রুচিহীনতার অধ্যায় শুরু হয়েছিল। মুর্শিদকুলী খাঁ থেকে শুরু করে আলীবর্দী খাঁর সময় পর্যন্ত দেশে যেটুকু নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় ছিল, সিরাজদ্দৌলা-শাসনকালীন এবং তৎপরবর্তী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনে দেশ থেকে সে অবস্থা অন্তর্হিত হল। ঢাকা থেকে ইতিপূর্বেই মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছিল, নাগরিক জীবনের প্রলুব্ধ হাতছানি সেদিনের বাঙালী এড়াতে পারেনি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর এই ভাঙনের ভূমিতে দাঁড়িয়েও তৎকালীন উচ্চতর সমাজ কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পুরাণ অনুবাদে যে সক্রিয় ছিল একথা স্মরণ করতেই হয়। যদিও এই অনুবাদের মধ্যে কবিত্ব অপেক্ষা পাণ্ডিত্য প্রকাশের প্রতিই সযত্ন প্রচেষ্টা ছিল কিন্তু, এর ফলে "উচ্চতর সমাজে বাংলা ভাষার মারফতে পৌরাণিক ভাব ও সংস্কার বেশ দৃঢ়মুল হইতেছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।"[৭] অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা অনুবাদ কার্যে কৃষ্ণলীলার প্রতি এই অনুরাগের কারণ বাঙালী সমাজে বৈষ্ণবপ্রভাব।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত কৃষ্ণযাত্রাগুলিতে বিকৃত রুচিপ্রবাহের জন্য বিস্ময় প্রকাশের কারণ নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালীর জীবনে কোন স্বপ্নসুন্দর ভবিষ্যতের সুখ অপেক্ষা করে ছিল না; লাম্পট্য, কামবিলাস এবং উদ্দাম ভোগের মধ্য দিয়ে তদানীন্তন সমাজের মানুষ তাদের হতাশা এবং যন্ত্রণার উপর আনন্দের তুলি প্রয়োগ করত। বৈষ্ণব পদাবলীর ভাব এবং বিষয় নিয়ে কৃষ্ণযাত্রাগুলি রচিত হলেও যে কারণে কবিগানের ভিতর অশ্লীলতা এবং রসবিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল সেই একই কারণে কৃষ্ণযাত্রাও তার ভাবগাম্ভীর্য রক্ষা করতে পারেনি। অষ্টাদশ

৬. বাংলা নাটকের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৬৬, পৃঃ ১১

৭. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৬, পৃঃ ১০৬৯

শতাব্দীর শেষাশেষি কৃষ্ণযাত্রা অত্যন্ত নিম্নস্তরে নেমে এসেছিল। সে সময় স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে যে যে বিষয় নিষিদ্ধ ছিল তার ভিতর যাত্রোৎসব ছিল অন্যতম—"স্ত্রী লোকের অকর্তব্য এই২ দুষ্টবুদ্ধিতে অন্যপুরুষ অবলোকন ও সহবাস ও যাত্রোৎসবে গমন ও একাকিনী গমন ও ব্যাভিচারিণীর সংসর্গ। এই সকল কর্ম স্ত্রীলোকের ধর্মনাশের কারণ হয়'।[৮]

কৃষ্ণযাত্রার এই রুচিহীনতা উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় পৌঁছে অবসিত হয়। এক্ষেত্রে কবিগানের সঙ্গে কৃষ্ণযাত্রার পার্থক্য সুস্পষ্ট। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় কবিগান আরও অশ্লীলতার দিকে ঢলে পড়ে এবং বিকৃতরুচিসম্পন্ন জনসাধারণের কাছে জনপ্রিয় হয়। অপরদিকে যাত্রার মধ্যে নূতন উপাদান প্রবেশ করতে শুরু করে এবং পুরানো যাত্রার রূপ লুপ্ত হয়। পূর্ববর্তী কৃষ্ণযাত্রায় ছিল অবিমিশ্র ভক্তিবাদ, উনবিংশ শতাব্দীতে ভক্তির সঙ্গে নূতন বিষয়ও যুক্ত হল। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে যাত্রায় গদ্য সংলাপ স্থান পেতে শুরু করে, সঙ্গীতের বাহুল্য কমতে থাকে। এইভাবেই মধ্যযুগের কৃষ্ণযাত্রা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং উনবিংশ শতাব্দীতে নূতন রূপ পেল।

কৃষ্ণযাত্রায় এই সংস্কারের উৎসাহ যিনি প্রথম অনুভব করেছিলেন সেই শিশুরাম সম্পর্কে ইতিহাস প্রায় নীরব। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের রচনা থেকে জানা যায় শিশুরাম কেঁদেলী গ্রামনিবাসী ছিলেন। তিনি লিখেছেন—"তৎপূর্ব হইতে বহুকালাবধি নাটকের জঘন্য অপভ্রংশ স্বরূপ একপ্রকার যাত্রা এতদ্দেশে বিদিত আছে, সংকীর্তন এবং পরে কবির প্রচারের মধ্যে তাহার প্রায়শঃ লোপ হইয়াছিল। শিশুরাম হইতে তাহার পুনর্বিকাশ হয়। শিশুরামের পর শ্রীদাম, সুবল ও তৎপরে পরমানন্দ প্রভৃতি অনেকে যাত্রার পরিবর্ধনে নিযুক্ত হইয়া অনেকাংশে কৃতকার্য হইয়াছেন।"[৯]

শিশুরামের শিষ্য পরমানন্দ অধিকারী 'কালীয়দমন যাত্রা' রচনায় গুরুর উদ্দেশ্য নির্ভুলভাবে অনুসরণ করেছিলেন। হুগলী জেলা নিবাসী পরমানন্দ প্রথমে শ্রীদাম-সুবলের দলে সখী সাজতেন, পরে তিনি নিজেই যাত্রাদল গড়েছিলেন। নিজে অভিনয় করতে গিয়ে পরমানন্দ অনুভব

৮. বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন, ১২৮৯।

৯. বিবিধার্থ সংগ্রহ, মাঘ, ১২৬৫ সাল।

করেছিলেন গদ্যসংলাপ ব্যবহার করলে যাত্রায় স্ফূর্তি আসা সম্ভব। একদিকে যেমন তিনি যাত্রায় গদ্য সংলাপের প্রয়োগ করলেন অন্যদিকে তিনি যাত্রাগানে প্রয়োগ করলেন 'তুক্কো' রীতি। 'At the last end of the rhymed couplets he used to sing in the tune of Kirtan ………That was known as "Tukko" and Paramananda was its creator'[১০] পরমানন্দর 'তুক্কো' গীতে যে কবিত্ব মূর্ছিত হত একটি উদ্ধৃতি দিলেই তার গভীরতা বোঝা যাবে—

সারা বন বুলে বুলে
বনফুল আনলাম তুলে
তার বোঁটাগুলি দিলাম ফেলে
তোমার শ্যামঙ্গে বাজিবে বলে ॥

অন্যান্য যাত্রারচয়িতারা যেমন জনচিত্ত আকর্ষণের জন্য যাত্রার ফাঁকে ফাঁকে ভাঁড় অথবা চটুল চরিত্র হাজির করতেন পরমানন্দ তার বিরোধী ছিলেন।

শ্রীদাম ও সুবল দুই সহোদর। এঁরা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুটি দশকে 'কালীয়দমন যাত্রা' অভিনয়ের দ্বারা বাঙালী দর্শককে প্রভূত আনন্দদান করেছিলেন। এই দুই ভাই অভিনয় এবং সঙ্গীতে কৃষ্ণযাত্রাকে উন্নত রুচির পর্যায়ে তুলেছিলেন। 'ইঁহারা প্রত্যেকেই কবি ছিলেন—এইজন্য ইঁহারা প্রত্যেকেই বাঙ্গালীর গুরু হইতে পারিয়াছিলেন।'[১১] শ্রীদাম সুবল ও পরমানন্দের সমকালীন আর একজন যাত্রা রচয়িতার নাম প্রেমচাঁদ। তিনি বৈষ্ণব পদগুলিকে ঈষৎ মার্জিত করে 'চৌপদী'র মত যাত্রায় গীতাকারে ব্যবহার করেছিলেন। ইতিপূর্বে মহিলার কণ্ঠে কীর্তন গান নিষিদ্ধ ছিল, প্রেমচাঁদের এই চর্চিত কীর্তন নারী কণ্ঠে স্থান পেল।

প্রেমচাঁদ-শিষ্য বদন অধিকারী কৃষ্ণলীলার দান, মাথুর এবং মান কাহিনীকে নিয়ে কৃষ্ণযাত্রা অভিনয় করতেন। তিনিও প্রেমচাঁদের ন্যায়

১০. Dasgupta, Hemendranath : The Indian Stage, Calcutta, P 218-219.

১১. বঙ্গদর্শন—ফাল্গুন, ১২৮৯.

বৈষ্ণব পদকে সহজ ভাষায় রূপান্তরিত করে যাত্রায় ব্যবহার করতেন। বিদ্যাপতির দুটি চরণ :

অঙ্গনে আওব যব রসিয়া।
পলটি চলব হম ঈষৎ হসিয়া॥

বদন এই চরণ দুটির সুন্দর পরিবর্তন করেছেন—

আমার অঙ্গনে আওব যব রসিয়ারে।
কব কব কব কথা, কথা কব না গো॥

মৌলিক গান রচনাতেও বদন্ সফল হয়েছিলেন :

যাও যাও যাও কালাচাঁদ, হেথা এস না।.........
ঘুমের ঘোরে নিশিভোরে,
(তুমি) কোথা হ'তে এলে বল না। ....

অথবা—

এত করে চরণ ধরে সাধলেম কথা কইলে না
রাই! আমার জীবনের জীবন জীবনে মন আইল না।......

পরমানন্দ প্রবর্তিত 'তুক্কো' প্রথাকে বদন এগিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর পুত্র ক্ষেত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্র যদুনাথ ও ব্রজনাথ 'তুক্কো' প্রথাকে গ্রহণ করেছিলেন।

বদনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণযাত্রা তথা কালীয়দমন যাত্রার পুরাতন রীতির শেষ ঘণ্টাধ্বনি মিলিয়ে গেল। অতঃপর উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের জনরুচির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কালীয়দমন যাত্রা লিখে যিনি প্রচুর খ্যাতি এবং জনপ্রীতি লাভ করেছিলেন তাঁর নাম গোবিন্দ অধিকারী। কৃষ্ণযাত্রার পূর্বগতি আর বজায় ছিল না। উত্তর পশ্চিম এবং দক্ষিণ ভারত থেকে আগত সস্তা জনরুচির উপযোগী নৃত্য-গীত তখন বাঙালী দর্শকদের মনোহরণ করছিল। তৎকালীন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে জানা যায়—"Jatras of this season were chiefly dramatic representations of the loves of Krishna and the Gopees, performed by the boys of the Brahmin Caste and appeared to us to

possess great resemblance to the ancient chorous of the Greeks." ১২ সেজন্যই গোবিন্দ অধিকারীকে পুরাতন রীতি ত্যাগ করতে হয়— কালীয়দমন যাত্রায় একটি নতুন রীতির জন্ম ঘটে।

গোবিন্দ অধিকারীর কালীয়দমন যাত্রায় ব্যবহৃত প্রস্তাবনার সঙ্গে সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত প্রস্তাবনার তফাৎ হল এই যে সংস্কৃত প্রস্তাবনায় যেখানে নাটকের ভবিষ্যৎ ঘটনার কোন পূর্বাভাসই দেওয়া হত না সেখানে গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রার প্রস্তাবনায় পাত্র-পাত্রীর ভবিষ্যৎ সংলাপ-কথনের এবং ক্রিয়াকর্মের একটি পরিচয় দিয়ে দেওয়া হত। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে কোন কোন পালার সূচনায় কবির উক্তি অনেকটা এই ধরণের—

দধি দুধে পসার সজাআঁ।
নেত বাস ওহাড়ন দিআঁ ।। ল রাধা ।।
সব সখিজন মেলি রঙ্গে।
একচিত্তে বড়ায়ির সঙ্গে ।। ল রাধা ।। ১ ।।
নিতি জাএ সর্বাঙ্গসুন্দরী।
বনপথে মথুরা নগরী ।। ল রাধা ।। ধ্রু ।।
একদিনে মনের উল্লাসে।
সখি সমে রস পরিহাসে ।।
আগু গেলি সত্বর গমনে।
বড়ায়িক না করী যতনে ।। ২ ।।

[তাম্বুল খণ্ড, ১ সংখ্যক পদ]

গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রার সূচনা এইরূপ :

গোষ্ঠভূমি।
বড়াইয়ের প্রবেশ।

বড়াই,

সঙ্গে সখাগণ নন্দের নন্দন গোধন চরাতে যায়।
নাচিয়া নাচিয়া বেণু বাজাইয়া রাধানাম গুণ গায় ।।

১২. Asiatic Journal, July, 1816.

চৌদিকে রাখাল মাঝে নন্দলাল অদূরে গো পাল ভ্রমে।
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিতে অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে চলে সবে ক্রমে ক্রমে ॥
দেখি কানু-ভাব ভাবে কত ভাব যে জন যেমন ভাবে।
চলে ধীরি ধীরি সখা সঙ্গে করি গোষ্ঠ মাঝে বংশীধারী ॥...
কত খেলা খেলি হয়ে কুতূহলী বসিলেন কূলে কালা।
বলে সখাগণে সাজাও বৎসগণে গাঁথিয়া মুক্তার মালা ॥

[মুক্তালতাবলী]

এরপর একটি গান, তারপর কৃষ্ণ-শ্রীদাম-সুদাম-বসুদাম প্রভৃতির ভিতর সংলাপ. তারপর আবার গান। এইভাবে কাহিনী এগিয়ে চলে। প্রস্তাবনা-রীতিতে সামান্য হেরফের দেখা দিলেও গোবিন্দ-পরবর্তী কৃষ্ণযাত্রা বা কালীয়দমন-যাত্রা রচয়িতাগণ কাহিনীর অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রায় একই রীতি অনুসরণ করতেন।

যাত্রার মাধ্যমে অনাবিল হাসির ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করার দক্ষতা গোবিন্দ অধিকারীর ছিল। তাঁর চাঁদধরা যাত্রায় কণ্-দাসী-যশোদার কথোপকথন, দানলীলা যাত্রায় বৃন্দা-কৃষ্ণ উক্তি-প্রত্যুক্তি এবং ননীচুরি যাত্রায় হড়াই-যশোদা কথোপকথনে সুন্দর কৌতুকরস উৎসারিত হয়েছে। 'ধ্বন্যুক্তি. যমক, অনুপ্রাস, শ্লেষ, বক্রোক্তি, ব্যাজস্তুতি, বিরোধ ইত্যাদি অলঙ্কারই প্রধানতঃ হাস্যরস উদ্রেক করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত। কোন কোন স্থানে যমকের মত একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার না করিয়া একই অর্থে বারবার ব্যবহৃত হইত।'[১৩] যমক ও শ্লেষ ব্যবহারের ফলে কোন কোন স্থানে যে সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি হত গোবিন্দ অধিকারীর 'দানলীলা' যাত্রার একটি অংশ উদ্ধৃত করলেই তা স্পষ্ট হবে।

বৃন্দা। এক আনায় হব পার, একা নায় হব পার,
ভাল আট আনা দিব কড়ি, পার কর ত্বরা করি,
আট আনা আট আনা—আ টানা রেখো না,
কৃপা করে টেনে নাও ॥

১৩. অজিতকুমার ঘোষ: বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, কলিকাতা, ১৩৬৭, পৃঃ ২৪১

কৃষ্ণ। আট আনা আট আনা—তাতে আঁটে না
মাঝে মাঝে ভুলে যাই, আমি আধুলি ছুঁই না
এক গোপীর চরণ ধুলি বিনা

বৃন্দা। নয় আনা দিব কড়ি, পার কর ত্বরা করি,
আমার হরিণনয়না—নয় আনা নয় আনা
এ পারে আমার নয়ানা নয়ানা

তরীখানি নয়া না, ঝলকে ঝলকে জল ওঠে
কেবল মাঝিটি পুরাণা, তাও আবার পুরা না,
তিন জায়গা ভাঙা তার, তাও আবার পুরাণা ॥

গদ্য সংলাপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে গোবিন্দ অধিকারী গম্ভীর এবং সরল উভয় প্রকার রীতিই গ্রহণ করেছেন। যখন কোন বিশিষ্ট চরিত্র গভীর তত্ত্বপ্রধান বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করেন তখন যাত্রারচয়িতা তাঁর মুখে প্রয়োজনীয় দার্শনিকতাপূর্ণ সংলাপই প্রয়োগ করেন। যেমন—

কন্ব। ···· যদি বল, বনফুলহার পাবে কোথায় গো? তা আমার জীবন হবে বন, প্রেম হবে বৃক্ষ, ভক্তি তাতে হবে লতা, আর অষ্টাঙ্গ যোগ পুষ্পযোগ হবে গো। .. সবই তো হল গো, কিন্তু এখন যে ঐ বালকের ষড়-অঙ্গ সাজাতে হবে গো, তা কি দিয়ে সাজাব গো? (চিন্তা) হ্যাঁ হয়েছে, আমার রিপুর মধ্যে প্রধান রিপু হচ্ছে ক্রোধ, তা মানুষের যখন ক্রোধ হয়, তখন তার সীমা থাকে না গো. তা হলে তাকে অসীম বা অনন্ত ক্রোধ বলা যেতে পারে গো। তা আমার ক্রোধকে অনন্ত করে ঐ বালকের বাহুমুখে প্রদান করব গো।···তা আমি আজ বিনা সাধনায় শ্রীপতির সেই শ্রীচরণ যুগলে নূপুর হয়েছি, সুতরাং আমারই জিত হয়েছে গো। তাই বলছি মন, জগতে এসে যদি জয়লাভের বাসনা থাকে গো, তবে অসার বিষয়নেশায় মেতে না থেকে ব্রহ্মচর্য পালন কর, প্রাণায়াম যোগ অভ্যাস কর গো!......

[চাঁদধরা]

সফল গদ্য সংলাপ রচনায়ও গোবিন্দ সিদ্ধহস্ত। কুটিলাকে কেন্দ্র করে রাধা-ললিতার কথোপকথনের একাংশ উদ্ধৃত করা যাক্—

রাধা । ওগো ললিতে, ঘরে যাই চল গো।

ললিতা। হ্যাঁ শ্রীমতি, তাই চল গো, লোকে কত কথা বলবে গো।

রাধা। ওগো ললিতে! আর কেউ কিছু না বললেও আমার বাঘিনী ননদিনী কত টিটকারী দেবে গো।

ললিতা। ওগো কুঠারাণি, কুটিলের সে কুকথায় কান না দিলেই হবে গো!

রাধা। ওগো ললিতে, ননদিনীর কথা যেন শীতকালের সেঁচা জল গো।

[অক্রূর সংবাদ]

অক্রূর-সংবাদ কাহিনী আশ্রয়ে গোবিন্দ অধিকারীর সমসাময়িক-কালে লোচন অধিকারী কৃষ্ণযাত্রা লিখে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। প্রায় একই সময়ে কালীয়দমন যাত্রার অনুকরণে রচিত ফরাসডাঙার গুরুপ্রসাদ বল্লভের চণ্ডীযাত্রা, বর্ধমানের লাউসেন বড়ালের মনসার ভাসান যাত্রা এবং পাতাই হাটার প্রেমচাঁদ অধিকারীর রামযাত্রা তৎকালীন দর্শকদের বহুমুখী আনন্দ দান করেছিল। পৌরাণিক যাত্রা কাহিনীর পাশাপাশি নন্দ বিদায়, বিদ্যাসুন্দর ইত্যাদি যাত্রার ব্যাপক প্রসারে কৃষ্ণযাত্রার ধর্মীয় পরিবেশ ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল। উনিশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের নতুনযাত্রা বা সখের যাত্রার অশ্লীল নৃত্য-গীত এবং কথোপকথন কৃষ্ণযাত্রার ভিতরও সঞ্চারিত হতে থাকে। কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১৮১০-৮৮) কৃষ্ণযাত্রার ঐতিহ্য স্মরণে রেখে কৃষ্ণযাত্রায় নতুনভাবে প্রাণ-সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন। কৃষ্ণকমল প্রধানতঃ কৃষ্ণযাত্রা বা কালীয়দমন যাত্রা লিখেছিলেন। অবশ্য রামায়ণের কাহিনীও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। বাংলা পৌরাণিক নাটকের জন্মলগ্নে কৃষ্ণকমলের এই যাত্রাগুলি আশীর্বচনের দায়িত্ব নিয়েছিল বলা যায়।

কৃষ্ণকমলের 'স্বপ্ন বিলাস' 'বিচিত্র বিলাস' এবং 'রাইউন্মাদিনী' নামক কৃষ্ণযাত্রা তিনটি পূর্ববঙ্গের ঢাকা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অভূতপূর্ব জনসমাদর লাভ করে। 'বিচিত্র বিলাসে'র ভূমিকায় কৃষ্ণকমল যে তথ্য দিয়েছেন তাতে জানা যায় তাঁর 'স্বপ্নবিলাস' গ্রন্থটির অতি স্বল্প সময়ে ২০,০০০ কপি বিক্রয় হয়। তৎকালীন বৃহত্তর বঙ্গে সখের যাত্রার যে

প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল সেই গ্রাম্যতা থেকে ঢাকা আত্মরক্ষা করেছিল। পরবর্তীকালে নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় ঢাকা থেকে কৃষ্ণকমলের এই তিনটি কৃষ্ণযাত্রা সংগ্রহ করে বর্লিনে চলে যান এবং বাংলা নাটকের উপর যে গ্রন্থটি লেখেন তাতে এই তিনটি বাংলা যাত্রা-সাহিত্যের উপরই মাত্র আলোচনা করেছিলেন। এ থেকেই কৃষ্ণকমলের ধর্মভাব, সাহিত্যরস এবং চিন্তার গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষ্ণকমল চেয়েছিলেন কৃষ্ণযাত্রা চিরস্থায়ী হোক। তাই নদীয়ার সেই যুবক সুদূর ঢাকা পর্যন্ত কৃষ্ণনাম গেয়ে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। বাংলা পৌরাণিক নাটকের চিরন্তনত্বের জন্য এই জাতীয় পরিশ্রম করেছিলেন গিরিশচন্দ্র। কৃষ্ণকমলের উপর শ্রীচৈতন্যের জীবন-ভাবনা তীব্রভাবে পড়েছিল।[১৪] তা ছাড়া বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃষ্ণদাস, রামানন্দ রায় এবং যাত্রা রচয়িতা বদন ও গোবিন্দ অধিকারীর ঋণও তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

কৃষ্ণকমল যেসকল কাহিনী নিয়ে কৃষ্ণযাত্রা লিখেছিলেন সেই একই কাহিনী পরবর্তীকালের গীতাভিনয় এবং পৌরাণিক নাটকেও অনুসৃত হয়েছিল। কিন্তু নাট্যাঙ্গিকের ক্ষেত্রে পরবর্তীকালের গীতাভিনয় রচয়িতা-গণ এবং নাট্যকারগণ কৃষ্ণকমলের নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে তেমন কিছু পাননি। কৃষ্ণকমলের কৃষ্ণযাত্রার আঙ্গিক পুরাতন রীতির পরিচয়-বাহী। সেদিক থেকে গোবিন্দ অধিকারীর সংলাপ অনেক বেশী ঝরঝরে, সঙ্গীত যথেষ্ট মার্জিত। বাংলা পৌরাণিক নাটকে সেজন্যই কৃষ্ণকমল অপেক্ষা গোবিন্দ অধিকারীর প্রভাব বেশী।

কৃষ্ণকমলের যাত্রায় কোন অঙ্কবিভাগ নেই। কেবলমাত্র দৃশ্যান্তরের মধ্য

১৪. আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন যথার্থই লিখেছেন—"কৃষ্ণকমল গোস্বামীর চক্ষে চৈতন্যের জীবনী সর্বদা উজ্জ্বল ছিল। রাধাকৃষ্ণের রূপকছলে তিনি আরাধ্যের জীবন কাহিনী শুনাইয়াছেন।.........বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস যে কথা দার্শনিকের ভাষায় কহিয়াছেন, তাহা কবির হস্তে নবজীবন লাভ করিয়াছে। চৈতন্যের কৃষ্ণবিরহের করুণ উচ্ছ্বাসে মাথুরের সৃষ্টি, তাঁহার উন্মত্ত প্রলাপে রাই উন্মাদিনী জীবন পাইয়াছে ও স্বপ্নবিলাস সার্থক হইয়াছে।"...—'কৃষ্ণকমল গ্রন্থাবলী', ১৩৩৫, 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য।

দিয়ে ঘটনাসংস্থানের পার্থক্য দেখান হয়েছে। স্বপ্নবিলাস-এ মোট ১১টি দৃশ্য আছে। সেই তুলনায় 'দিব্যোন্মাদ' এবং 'বিচিত্র-বিলাস'-এ দৃশ্য সংখ্যা কম কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে দৃশ্যগুলি ছোট। 'দিব্যোন্মাদ' পালার বনদৃশ্যটির জন্য কৃষ্ণকমল ছত্রিশটি পাতা ব্যয় করেছেন।

কৃষ্ণকমল গোস্বামী যেমন পূর্ববঙ্গের ঢাকায় কৃষ্ণযাত্রাকে ছড়িয়ে দিয়ে যাত্রার পূর্বগৌরবকে ফিরিয়ে এনেছিলেন তেমনই রাঢ় অঞ্চলে নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণযাত্রাকে শেষ বারের মত উদ্দীপিত করতে চেয়েছিলেন। 'নীলকণ্ঠের কৃষ্ণযাত্রার পালা প্রায় গানসর্বস্ব, বলা যেতে পারে গীতিনাট্য।... ওতে গদ্যে রচিত কথা (বক্তৃতাও) ছিল, তার কিছু অংশ সুরে গাঁথা, কিছু অংশ শুধু অর্থাৎ স্বাভাবিক কথা। তাঁর পালা লীলাকীর্তনের মত শুধু গেয় নয়, অভিনেয়। পাত্র-পাত্রীরা সশরীরে উপস্থিত হতেন, আপন আপন ভূমিকা অভিনয় করতেন। সম্ভব ক্ষেত্রে একটু আধটু দৃশ্যেরও ব্যবস্থা করা হোত। দৃশ্য Scene নয়, শুধু একটা কলসী, দুই একটা মাটীর সরা এক আধখানা কাগজ—এমনি সব।'[১৫]

কৃষ্ণকমল এবং নীলকণ্ঠের একান্ত আন্তরিকতা সত্ত্বেও এবং নীলকণ্ঠ-পুত্র কমলাকান্তের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও কৃষ্ণযাত্রার পূর্বগৌরব হারিয়ে যেতে শুরু করল। অতঃপর কৃষ্ণযাত্রা নাগরিক জনমানসকে আর আগের মত তৃপ্তি দিতে পারল না, নতুন যাত্রা বা সখের যাত্রার প্রাদুর্ভাব এবং গীতাভিনয় ও নাটকের উদ্ভব ও জনপ্রিয়তার ফলে কৃষ্ণযাত্রা গ্রামীণ পরিবেশে ফিরে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে তৎপর হল। এই বিংশ শতাব্দীর আধুনিক সমাজচেতনাতেও গ্রামাঞ্চল থেকে কৃষ্ণযাত্রার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটেনি। গ্রামীণ জীবনে মধ্যযুগীয় সংস্কার, শাস্ত্র-চর্চা এবং ভক্তিবাদ কৃষ্ণযাত্রাকে এখনও কিছুটা সক্রিয় রেখেছে।

১৫. শ্যামাপদ চক্রবর্তী : বর্ধমান সম্মিলনী সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা, ১৩১৪-৬৪.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নতুন যাত্রা ।।

কৃষ্ণযাত্রার ভিতর দিয়ে যে পৌরাণিক বিশ্বাসের আদর্শলোক গড়ে উঠেছিল উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে তার অপস্রিয়মান রূপটি সত্য হয়ে উঠতে থাকে। সেই যুগে বাঙালী সমাজে মধ্যযুগীয় ভক্তিবিশ্বাসের প্রতি তার তেমন আস্থা রইল না, কেবলমাত্র দৈবী মাহাত্ম্যসূচক যাত্রারস আস্বাদনের মানসিক ইচ্ছা থেকে বাঙালী সরে এল। একেশ্বরবাদীদের সঙ্গে পৌত্তলিকদের সংঘর্ষের ফলে কৃষ্ণযাত্রার জনপ্রিয়তা হ্রাস পেল এবং সেই শূন্যস্থান পূরণে এগিয়ে এল নতুন যাত্রা বা সখের যাত্রা।[১] বাংলা পৌরাণিক নাটকের আলোচনায় নতুন যাত্রার আলোচনাটি অপরিহার্য, কেননা সখের যাত্রার রুচি-বিকৃতির আবহাওয়া থেকে দর্শকদের মুক্তিদানের এবং পৌরাণিক ভাবাদর্শকে অটুট রাখার জন্যই শক্তিহীন কৃষ্ণযাত্রার স্থান গ্রহণ করেছিল গীতাভিনয় এবং পৌরাণিক নাটক।

নতুন যাত্রাওয়ালারা যে কবিসঙ্গীত দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তা ছাড়া ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের বিদ্যাসুন্দর কাহিনীও তাঁদের আদর্শ ছিল।

নতুন যাত্রা অপৌরাণিক কাহিনীকে যাত্রার মধ্য দিয়ে পরিবেশন করলেও পৌরাণিক কাহিনীকে একেবারে বর্জন করেনি। কিন্তু পুরাণ এখানে ভক্তির রঙে অঙ্কিত নয়, ভক্তিহীনতার স্রোতে পঙ্কিল হয়ে উঠেছে।

"যাত্রার অধিকারী বয়স ১৭ বৎসর, বাবরিকাটা চুল, কপালে উলকী, কানে মাকড়ি। অধিকারী দূতী সেজে গুটিবারো বুড়ো বুড়ো ছেলেকে সখী

---

১. প্রায় ৬০ বৎসর হইতে চলিল এই সখের যাত্রা প্রথম আরম্ভ হয়।
—বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন, ১২৮৯ সাল।

সাজিয়ে আসরে নামলেন। প্রথমে কৃষ্ণ খোলের সংগে নাচলেন, তারপর ব্যাসদেব ও মতি গোঁসাই গান করে গেলেন। সকেষ্ট সখী ও দুতী প্রাণপনে ভোর পর্য্যন্ত 'কালো জল খাবো না।' 'কালো মেঘ দেখবো না।' 'কালো কাপড় পরবো না।' ইত্যাদি কথাবার্তায় ও 'নবীন বিদেশিনী'র গানে লোকের মনোরঞ্জন করেন। থাল, গাড়ু, ঘড়া, ছেঁড়া কাপড়, পুন্নাগ বনাত, পচা শালের গাদী হয়ে গেল।"[২]

হুতোমের এই বর্ণনা পড়লে ভাবাই যায় না যে ইতিপূর্বে শ্রীদাম, সুবল, পরমানন্দ অথবা গোবিন্দ অধিকারীর মত যাত্রা রচয়িতারা সুন্দর কৃষ্ণযাত্রা লিখেছিলেন। সখের যাত্রাওয়ালাদের রচনায় পৌরাণিক দেবদেবী পর্যন্ত সঙ-এর চরিত্রে পরিণত হয়ে গেলেন। কৌতুক রসপ্রবাহ মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়ায় নতুন যাত্রা বা সখের যাত্রা পূর্ব প্রচলিত কৃষ্ণযাত্রার অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ ধর্ম থেকে বিচ্যুত হল।

নলদময়ন্তীর কাহিনী নিয়ে বাংলা সাহিত্যে একাধিক ভাল পৌরাণিক নাটক লেখা হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। কিন্তু শতাব্দীর প্রথমার্ধে নতুন যাত্রাদল যে 'নলদময়ন্তী' যাত্রাভিনয় করেছিল তার কোথাও মহাভারতের কাহিনীর পৌরাণিক ভাবমহিমা রক্ষিত হয় নি। এই প্রসঙ্গে সমাচার দর্পণের একটি মন্তব্য উদ্ধার করা যায়—

"মহাভারত প্রসিদ্ধ নলদময়ন্তীর যে কথা আছে সে অতি সুশ্রাব্য মনোরম নবরস সম্পূর্ণ প্রসাদ অতএব শ্রীহর্ষ প্রভৃতি কবিরা স্বীয় শক্ত্যানুসারে তাহা বর্ণনা করিয়া নৈষধাদি গ্রন্থ রচনা করিয়া মহাকবিত্বে খ্যাত ও মান্য হইয়াছেন। সম্প্রতি কলিকাতার অন্তঃপাতী ভবানীপুরের ভাগ্যবান লোকেরা একত্র হইয়া সেই প্রসঙ্গে এক যাত্রা সৃষ্টি করিয়াছেন।"[৩]

কৃষ্ণযাত্রার বিষয়-বহির্ভূত এই পুরাণাশ্রয়ী নতুন যাত্রায় কিন্তু পুরাণরস বজায় থাকেনি। বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর রস নলদময়ন্তী যাত্রায় অনুপ্রবিষ্ট হওয়ায় পৌরাণিক কাহিনীর গাম্ভীর্য যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। উপরোক্ত পত্রিকাতেই লেখা হয়েছিল—'ঐ যাত্রাতে নল রাজার সং দময়ন্তীর সং ও

২. কালীপ্রসন্ন সিংহ : হুতোম প্যাঁচার নক্সা, বসুমতী সংস্করণ, পৃঃ ৩৫
৩. সমাচার দর্পণ, ৪ঠা মে, ১৮২২

হংসদূতের সং ইত্যাদি নানাবিধ সং আইসে এবং নানাপ্রকার রাগ-রাগিণী সংযুক্ত গান হয় ও বাদ্য নৃত্য ও গ্রন্থমত পরস্পর কথোপকথন।[৪] অর্থাৎ কৃষ্ণযাত্রার অর্জিত রূপ অপেক্ষা মজাদার রঙ তামাসাপূর্ণ সং-এর বাহ্য রূপকেই নতুন যাত্রার রচয়িতারা বেশী আপন ভেবেছিলেন। তাই 'নলদময়ন্তী' যাত্রায় কবিয়াল রাম বসু যে গান ও ছড়া প্রস্তুত করেন তার ভিতরও সখের যাত্রার রঙ্গরস প্রকাশের ইচ্ছাটি ব্যাকুলিত হয়েছে। দুটি গান উদ্ধার করলেই এই অভিমতের যৌক্তিকতা বোঝা যাবে—

যথা—

কেন গো, সজনী আমার, উড়ু উড়ু
করে মন্।
পিঞ্জরের পাখি যেমন, পালাবারি
আকিঞ্চন ॥

তথা

নল্ নাম নল্ বলিস্ কি বা বল্।
দাবানল, মনানল, প্রেমানল, কি অনল,
কি সেই, কুল মজানে কামানল ॥[৫]

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে মণিপুর থেকে যে যাত্রাদলটি এসেছিল সেটি স্ত্রীলোক পরিচালিত ও অভিনীত ছিল। মতিলাল শীলের বৈঠকখানায় ঐ দলের যাত্রাভিনয় কৃষ্ণযাত্রারই পরিচয় বহন করে। কিন্তু তৎকালীন কলকাতার বাবুসমাজ কৃষ্ণযাত্রার প্রতি আর তেমন আকর্ষণ অনুভব করেন না। তৎকালীন সংবাদপত্রে তাই বিরূপ মন্তব্যের অভাব ঘটল না:

আশ্চর্য সম্প্রদায় এই স্ত্রীলোকের দল।
স্ত্রীলোকেতে কৃষ্ণ সাজি করয়ে কৌশল ॥
ললিতা বিসাখা চিত্রা আর রঙ্গদেবী।
সুদেবী চম্পকলতা তং বিদ্যাদেবী ॥

৪. প্রাগুক্ত, ১৪ই জুলাই, ১৮২২
৫. সংবাদ প্রভাকর, ৺রাম বসু—১৬ই সেপ্‌টেম্বর, ১৮৫৪ খ্রীঃ

ইন্দুরেখা সাজি সবে রাসলীলা করে।
পুরুষে বাজায় বাদ্য নারী তাল ধরে॥
কৃষ্ণের সহিত রঙ্গ করয়ে রসিকা।
রসিকার রূপ গুণ নাহিক নাসিকা॥
গুণবতী-দিগের গুণ অতি উচ্চস্বরা।
শুনিলে সে মিষ্টস্বর না যায় পাসরা॥
বাদ্য তালে নৃত্য বটে কিন্তু লম্ফঝম্প।
গান করে জয়দেব মুদ্রা তার কম্প॥[৬]

মণিপুরী দলের এই কৃষ্ণযাত্রা তৎকালীন জনমনোরঞ্জনে সফল হয় নি। এ সময় সখের যাত্রা থেকে কৃষ্ণ-কাহিনী পুরোপুরি বর্জনের ধুম লেগেছিল। তার কারণ সখের যাত্রার স্বেচ্ছাবিহার মহাভারত অথবা অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনীকে অবলম্বন করে সম্ভব নয়। নতুন যাত্রার কাহিনী এল কামরূপ যাত্রা থেকে। কিন্তু সে যাত্রা তেমন জনপ্রিয়তা লাভ করল না। অতঃপর এল বিদ্যা-সুন্দর যাত্রা। এর আগেই লেবেডেফের 'সঙ বদল' পালায় ভারতচন্দ্রের গীত (বিদ্যাসুন্দর থেকে) ব্যবহৃত হয়েছিল। অতঃপর সখের যাত্রায় বিদ্যাসুন্দর কাহিনী বিপুল জনপ্রীতি লাভ করল।

প্রায় চল্লিশ বছর ধরে 'বিদ্যাসুন্দর যাত্রা' অপ্রতিহত গতিতে অভিনীত হতে থাকে এবং কৃষ্ণযাত্রার পুনরুত্থানের ইতস্তত: প্রচেষ্টাকে স্তব্ধ করে দেয়। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় প্রথম বিদ্যাসুন্দর যাত্রা অভিনয় করেন।[৭] ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুরদাস দত্ত বিদ্যাসুন্দর যাত্রাদল গড়েন। এ ছাড়া বৈকুণ্ঠনাথ রায়চৌধুরীর সখের বিদ্যাসুন্দর যাত্রাদল এবং কৈলাসচন্দ্র

৬. সমাচার দর্পণ, রাম বসু—১৯শে আগষ্ট, ১৮২৬ খ্রীঃ

৭. The information of an amateur Yatra party... seemed to be at Adiadaha in 24 Pgs. distt. In 1822 a Brahmin named Thakurdas Mukherjee formed a party in the name of his father Ramjay..... he selected scenes from it (Vidya Sundar)."

—Dasgupta, H. N. : The Indian stage, Vol. I, Cal, 1846, P. I24

রায়ের বিদ্যাসুন্দর যাত্রাদলের পরিচয়ও পাওয়া যায়।[৮] কটকের যাজপুর নিবাসী গোপাল উড়ের 'বিদ্যাসুন্দর যাত্রা' সর্বাধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। শ্যামবাজারের নবীন বসুর গৃহে ১৮৩৫ সালে বিদ্যাসুন্দর অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়।[৯]

সখের যাত্রার প্রমোদকলার প্রতি আকৃষ্ট এক শ্রেণীর বাঙালীর মন থেকে কিন্তু তখনও কৃষ্ণযাত্রার সুরটি বিলীন হয়ে যায় নি। হুতোমের পাতায় গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর পালার দর্শক এক বাবুর চমৎকার বর্ণনা আছে—"......শেষে ভোর ভোর সময়ে দক্ষিণ স্থানে কোটালের হাঙ্গামাতে বাবুর নিদ্রাভঙ্গ হল, কিন্তু আসরে কেষ্টকে না দেখে বাবু বিরক্ত হয়ে 'কেষ্ট ল্যাও, কেষ্ট ল্যাও' বলে ক্ষেপে উঠলেন। অন্য অন্য লোকে অনেক বুঝালেন যে, 'ধর্ম-অবতার! বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় কেষ্ট নাই।' কিন্তু বাবু কিছুতেই বুঝলেন না: কেষ্ট তাঁকে নিতান্ত নির্দয় হয়ে দেখা দিলেন না বিবেচনায়, ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগলেন।"[১০]

কৃষ্ণযাত্রার অবক্ষয় এবং নতুন যাত্রার ব্যাপক প্রসারের জন্য তৎকালীন জনরুচি যেরূপ দায়ী সেইরূপ কৃষ্ণযাত্রা রচয়িতাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনও কম দায়ী নয়। পূর্ববর্তী কৃষ্ণযাত্রা প্রণেতৃগণ ধর্মপ্রাণ ছিলেন এবং শ্রোতৃগণ অপেক্ষাকৃত রসজ্ঞ ছিলেন। ক্রমে উভয়েরই এক্ষণে অধঃপতন হইয়াছে। অধিক কি, পূর্বে যে যাত্রার যে স্থলে দেবতা এবং দেবতুল্য ঋষি সাজাইত, এক্ষণে সেই স্থলে মেতর মেতরানী সাজিয়া শ্রোতাদিগের মনোরঞ্জন করা হয়।"[১১]

কৃষ্ণযাত্রার সুশ্রাব্য ভক্তিগীত সখের যাত্রার হাফ-আখড়াই সঙ্গীত-

৮. হরিমোহন মুখোপাধ্যায়: বঙ্গভাষার লেখক, কলিকাতা, ১৩১১ সাল, পৃঃ ৩২৬

৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: বঙ্গীয় নাট্যশালা, কলিকাতা, ১৩৬১ সাল, পৃঃ ৬

১০. কালীপ্রসন্ন সিংহ: হুতোম প্যাঁচার নক্সা, বসুমতী সংস্করণ, পৃঃ ৩৬

১১. বঙ্গদর্শন—যাত্রা সমালোচনা, বৈশাখ, ১২৭৯ সাল

প্রাধান্যে ভেসে গিয়েছিল। নৃত্যের ক্ষেত্রেও সখের যাত্রা পূর্ববর্তী নাটগীত অথবা কৃষ্ণযাত্রার রসকে অস্বীকার করে খেমটা নাচের প্রতি অনুরাগ দেখাল।[১২] পৌরাণিক চরিত্রকে অকারণে সখের যাত্রার আসরে টেনে এনে নিজ উদ্দেশ্য সাধন করল সত্য কিন্তু পৌরাণিক চরিত্রের সিদ্ধমহিমার আর কোন চিহ্ন অবশিষ্ট রইল না। "নৃত্যের ব্যাপারে যাত্রার সমস্ত শোভা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কি মেথর, কি ভিস্তি, কি মালিনী, কি বিদ্যা সকলেই নৃত্য দ্বারা দর্শকমণ্ডলীর তৃপ্তি সাধন করিতে প্রয়াস পাইত। যাত্রায় কৃষ্ণের নৃত্য, রাধার নৃত্য, রাবণের নৃত্য, সীতার নৃত্য, কৈকেয়ীর নৃত্য প্রভৃতি অরুচিকর ও সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত এবং অসম্ভাবজনক ব্যাপারের অবতারণা বড়ই ক্লেশকর।[১৩]

সখের যাত্রা রচয়িতাদের পৌরাণিক কাহিনীর যথাযথ অনুসরণের বিষয়ে কালাপাহাড়ী মনোভাবই শেষপর্যন্ত সখের যাত্রার পতনের মূল কারণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে হিন্দুধর্মের অধঃপতন হলেও এবং বাবু সমাজ গোখুরী, ঝকমারী ও পক্ষীর দলে বিভক্ত হলেও সমাজজীবন থেকে ধর্মপ্রাণ দর্শক নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। এঁরা কৃষ্ণযাত্রার পুনরুজ্জীবন অথবা স্বতন্ত্র এক ধরণের শিল্পরীতির জন্মমুহূর্তের প্রতি উন্মুখ হয়ে তাকিয়েছিলেন যার ভিতর দিয়ে পুরাণকথার সুস্থ সুন্দর নাট্যপ্রকাশ সম্ভব হতে পারে। রাজেন্দ্র-লাল মিত্র এই স্বতন্ত্ররীতির প্রত্যাশা করে লিখেছিলেন—

"ইহার (নাট্যাভিনয়ের) প্রাদুর্ভাবে যাত্রা কবি খেউড় প্রভৃতি দুষ্য উৎসবের দূরীকরণ ঘটে—ইহা কর্তৃক বঙ্গদেশে কু-নীতির উৎসেদ ও নির্মল ব্যবহারের প্রাদুর্ভাব হয়—ইহাই আমাদিগের নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।[১৪]

গীতাভিনয় ॥

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ন্যায় তৎকালীন বিদগ্ধ রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিদের আনন্দ-

১২. বিশ্বকোষ : ১৫শ খণ্ড

১৩. প্রাগুক্ত

১৪. বিবিধার্থ সংগ্রহ, মাঘ, ১২৮০ শকাব্দ

দানের জন্য জন্ম নিল গীতাভিনয়।[১৫] বাংলা নাটকের উপর যাত্রার প্রভাব পড়লেও [১৬] গীতাভিনয়ের সঙ্গে বাংলা নাটকের যেরূপ নিকট সম্পর্ক যাত্রার সঙ্গে ততখানি নয়। গীতাভিনয় যাত্রা ও নাটকের মাঝামাঝি একশ্রেণীর নাট্যকর্ম যার দেহ ও আত্মা মূলতঃ পুরাণ-আশ্রয়ী। কৃষ্ণযাত্রা প্রধানতঃ কৃষ্ণকথা, কিন্তু গীতাভিনয়ের মধ্যে অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনীও স্থান পেল। 'সাবিত্রী সত্যবান', 'জানকী বিলাপ', 'পদ্মাবতী', 'মানিনী', 'মায়াবতী', 'লক্ষ্মণ-ভোজন' ইত্যাদি গীতাভিনয় কৃষ্ণকথা-বহির্ভূত পৌরাণিক ঘটনা। এই সূত্রে বলা যায় কৃষ্ণযাত্রায় ব্যবহৃত সঙ্গীতসুর ছিল বৈচিত্র্যহীন অন্যদিকে গীতাভিনয়ে দেশী-বিদেশী বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে নানা রাগিনীর ব্যবহারে এক নব্যরীতি এল। অবিন্যস্ত কৃষ্ণকথা নিয়েই যাত্রাগুলি রচিত হত কিন্তু গীতাভিনয় উপহার দিল বহুশাখান্বিত বৈচিত্র্যময় সুবিন্যস্ত পৌরাণিক কাহিনীর। কৃষ্ণযাত্রার মত কেবলমাত্র অহৈতুকী ভক্তির প্রচার নয়, গীতাভিনয়গুলির ভিতর এল পুরাণের আবরণে নতুন ভক্তিবাদ।

গীতাভিনয়গুলির সঙ্গে যাত্রা এবং নাটকের সম্পর্ক নিবিড়। "আঙ্গিকের দিক দিয়া স্থূল দৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কৃষ্ণযাত্রা হইতে ইহার গীত, নূতন যাত্রা হইতে ইহার নৃত্য ও তদানীন্তন বাংলা নাটক হইতে ইহার সংলাপের অংশ গৃহীত হইয়াছে। রসের দিক দিয়া ইহাতে প্রাচীন যাত্রার ভক্তি, নূতন যাত্রার আনন্দ ও ইংরেজী আদর্শে রচিত বাংলা

১৫. প্রচলিত যাত্রাগুলির প্রতি যথার্থ সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তিগণের নিদারুণ বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। রঙ্গভূমি করিয়া নাটকের অভিনয় করা অধিক ব্যয়সাধ্য বিবেচনায় কলিকাতার কয়েকজন শিক্ষিত যুবক সামান্যতঃ তৎপ্রণালীতে গীতাভিনয় প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। —সংবাদ প্রভাকর, ১লা অগ্রহায়ণ, ১২৬৬ বঙ্গাব্দ।

১৬. **But the Yatra, in however crude and underdeveloped form, contained within itself the germs of a regular Drama.**

—De, S. K.: Nineteenth Century Bengali Literature, Calcutta, 1962. P—402

নাটকের কারুণ্য একসঙ্গে গৃহীত হইয়াছে।"[১৭] যাত্রার মত গীতাভিনয়েও কোন রঙ্গমঞ্চ বা দৃশ্যপট ব্যবহৃত হত না, পৌরাণিক নাটক অপেক্ষা গীতাভিনয়ে বেশী সঙ্গীত ব্যবহৃত হত। আবার নাটকের স্থায় পঞ্চাঙ্ক বা তার বেশী অঙ্কে গীতাভিনয়ে কাহিনী সজ্জিত হত।

হিন্দু পেট্রিয়টের সংবাদ অনুসারে[১৮] জানা যায় অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শকুন্তলা গীতাভিনয়'ই প্রথম বাংলা গীতাভিনয়। ১৮৬৪-তে এটির অভিনয়ের একবছরের ভিতর কালিদাস সান্যালের 'নলদময়ন্তী', রামনারায়ণের 'রত্নাবলী' এবং মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' মঞ্চস্থ হয়। ১৮৬৭-তে অভিনীত হয় হরিমোহন কর্মকারের 'জানকী-বিলাপ' গীতাভিনয়। অতঃপর গীতাভিনয়ের রচনা এবং অভিনয়ের উৎসমুখ খুলে গেল। অজস্র ধারায় গীতাভিনয় রচিত হতে শুরু করায় সখের যাত্রাদলগুলির চিন্তা-ভাবনাও আংশিক রূপান্তরিত হতে শুরু করল।

রূপ এবং রসের দিক থেকে যাত্রা ও গীতাভিনয়ের ভিতর সম্পর্ক থাকায় উভয় ধারার দু'জন রচয়িতার দু'টি গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করলে ধারা দুটির নিজস্বতা সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে। কৃষ্ণকমল গোস্বামী এবং মনোমোহন বসু উভয়েই রাধাকৃষ্ণের কাহিনী নিয়ে যথাক্রমে যাত্রা এবং গীতাভিনয় রচনা করেছেন। কৃষ্ণকমলের 'দিব্যোন্মাদ' যাত্রার কাহিনীটি হল :

> গোপরাজ নন্দ শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় রেখে আসার পর থেকেই যশোদা কৃষ্ণশোকে অধীরা। রাত্রে দু চোখে ঘুম আসে না, সখীদের সান্ত্বনা, যুক্তি ইত্যাদি কিছুই যশোদার ভাল লাগে না। এরই সঙ্গে নিরানন্দের স্রোত নেমে এসেছে শ্রীদাম, সুদাম, সুবল, দাম ও বসুদামের মনে। স্বপ্নে সুবল-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন এই ব্যথার কেন্দ্রে তরঙ্গ তুলল। আবার এই কৃষ্ণ-বিরহে রাধা আত্মহারা, পাগলপারা। নিদারুণ কৃষ্ণবিরহে তাঁর অন্তর ক্ষত-বিক্ষত। তাঁর প্রশ্ন কৃষ্ণ যদি

১৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য: বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬০, পৃঃ ৭৮-৭৯.

১৮. Hindu Patriot, May 22, 1865.

মথুরাতেই গেলেন তবে তাঁর বেঁচে থেকে লাভ কি? অতঃপর চিত্রার কথায় ক্ষীণাঙ্গী রাধা কৃষ্ণান্বেষণে বার হলেন। কদম্ব-কাননে গিয়ে তাঁর মনে পড়ে যায় বৃক্ষের মূলে কেমন চাঁদের হাট বসত। চাঁপা ফুল দেখে রাধার মনে পড়ে যায় সুবলের কাছে রাধাকে আনয়নের জন্য কৃষ্ণের সেই ব্যাকুলতার ছবি। অতঃপর কদম্ববন থেকে নিকুঞ্জবন। রাধার দিব্যোন্মাদের সূচনা ঘটল। সারসপক্ষীর কণ্ঠস্বরে জল-ভারাক্রান্ত মেঘের আবির্ভাবে রাধার মনে হল কৃষ্ণ এসেছেন। ভুল ভাঙল, ঘটল মূর্ছা। এরপর কানে কৃষ্ণনাম জপ করবার সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য ফিরে এলো বটে কিন্তু তিনি তখন স্মৃতিহারা। তিনি নিজেই প্রশ্ন করলেন, রাধা কে? কেনই বা তিনি বনে এলেন? সখীরা তাঁর পূর্বস্মৃতি ফিরিয়ে আনলে স্মৃতিপ্রাপ্তা রাধা পুনরায় মূর্ছা গেলেন। অনেক সাধ্য-সাধনাতে জ্ঞান ফিরে না আসায় সখীরা ভাবল, রাধা মৃতা। এই নিদারুণ আঘাতে সখীরা যখন মূর্ছায় ঢলে পড়লেন তখন সেখানে চন্দ্রাবলীর আবির্ভাব। সখীদের আবার জ্ঞান ফিরে এলো। চন্দ্রাবলীর পরামর্শে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গবাসিত মৃগমদের গন্ধে রাধার জ্ঞান ফিরে এলো। কিন্তু তিনি তখন যোগিনী হতে ব্যাকুলা। এই কথা শুনে চন্দ্রাবলী শ্রীকৃষ্ণকে আনবার জন্য মথুরা যাত্রা করলেন। চন্দ্রাব মুখে রাধার নাম শুনে কৃষ্ণের সব মনে পড়ল। যাত্রা পালার শেষে ঘটল রাধা-কৃষ্ণের যুগল মিলন।

অপরদিকে মনোমোহন বসুর 'রাসলীলা' (১৮৮৩) রাধাকৃষ্ণের 'ভাগবত' এবং 'গীতগোবিন্দ' বর্ণিত রাসলীলা আখ্যান অবলম্বনে রচিত। কৃষ্ণকমলের 'দিব্যোন্মাদ' যাত্রায় গদ্য-সংলাপ প্রায় নেই-ই, সমগ্র পালাটিতে মাত্র পাঁচ ছ'টি গদ্য বাক্য আছে। ছড়া এবং পয়ারের যোগসূত্রে এক একটি দীর্ঘ গান পালাটির সর্বাঙ্গ-বিস্তৃত। ভিন্ন ভিন্ন তালে বিভক্ত কোন কোন গান প্রায় দু'পৃষ্ঠা জুড়ে আছে। কেবল রাসলীলা নয়, মনোমোহনের সকল গীতাভিনয়েই যাত্রার সঙ্গীত-প্রাধান্য অনুপস্থিত। এ প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্টই লিখেছিলেন:

"আমি এমন কথা বলিতেছি না, যে, যাত্রাওয়ালারা যেমন কথায় কথায়, অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্তৃতার পর কেবলই গানের আধিক্য করিয়া

থাকে, নাটকেও তদ্রূপ হউক। আমার অভিপ্রায় এই, যে, স্বভাবোক্তির পর যেখানে যেখানে গান খাটিতে পারে, তাহা উক্ত স্বাভাবিক নিয়মে যতই কেন হউক না, ফলতঃ যে কয়টি গান হইবে, সে কয়টি যেন উত্তম রূপে গাওয়া হয়।...আমরা চাই, সেই যাত্রার গান সংখ্যায় কমাইয়া ও গাইবার প্রণালীকে শোধিত করিয়া নাটকের স্বভাবানুযায়ী কথোপকথনাদি বিবৃত হউক।"

এই উক্তি বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় মনোমোহন প্রমুখ গীতাভিনয় রচয়িতারা কেন যাত্রা না লিখে গীতাভিনয় রচনার দিকে ঝুঁকেছিলেন।

যাত্রায় পৌরাণিক কাহিনীকে অবলম্বন করা হলেও রচয়িতাদের গণ্ডী ছিল সীমিত। অপরদিকে গীতাভিনয় লেখকরা তাঁদের কাহিনীর উৎস সন্ধানে মূলতঃ রামায়ণ এবং মহাভারতের পৃষ্ঠায় দৃষ্টিপাত করলেও অন্যান্য পুরাণও তাঁদের দৃষ্টি থেকে বিশেষ বাদ যায় নি। পৌরাণিক নাট্যকারদের মত গীতাভিনয় রচয়িতারাও অষ্টাদশ পুরাণের নানা স্থান থেকে কাহিনী চয়ন করেছিলেন। কয়েকটি গীতাভিনয়ের উৎস সম্পর্কে আলোকপাত করলেই এই মন্তব্যের সত্যতা বোঝা যাবে—

গীতাভিনয়	লেখক	উৎস
ভরতগমন	মতিলাল রায়	বাল্মীকি রামায়ণ
রাবণ বধ	ঐ	কৃত্তিবাসী রামায়ণ
ভীষ্মের শরশয্যা	ঐ	মহাভারত
যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ	ঐ	কাশীদাসী মহাভারত
প্রমীলা উপাখ্যান	ঐ	জৈমিনী ভারত
নলদময়ন্তী	ঐ	মহাভারত
ব্রজলীলা	ঐ	ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ
হরিপাদপদ্মলাভ	ঐ	গরুড়পুরাণ ও বায়ুপুরাণ
পারিজাতহরণ	ঐ	শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ

গীতাভিনয়	লেখক	উৎস
কর্ণের দান পরীক্ষা	পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য	মহাভারত
প্রবীরপতন বা জনা	ঐ	ঐ
পারিজাতহরণ	ঐ	মহাভারত এবং শ্রীমদ্ভাগবত
শ্রীরামচন্দ্রের মহাবিলাপ	নীলকণ্ঠ দত্ত	রামায়ণ
দণ্ডীপর্ব	অহিভূষণ ভট্টাচার্য	মহাভারত
বিরাট পর্ব বা উত্তরা পরিণয়	ঐ	ঐ
রামাশ্বমেধ	ঐ	রামায়ণ
জয়দ্রথ বধ	অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল	মহাভারত
বভ্রুবাহনের যুদ্ধ	ঐ	ঐ
নলদময়ন্তী	হারাধন রায়	মহাভারত
সুরথ উদ্ধার	ঐ	মার্কণ্ডেয় পুরাণ
লক্ষ্মণ বর্জন	মতিলাল ঘোষ	রামায়ণ
ধ্রুব	ঐ	বিষ্ণুপুরাণ
কবচ সংহার	ধর্মদাস রায়	মহাভারত
শ্রীকৃষ্ণের গুরুদক্ষিণা	ঐ	শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ
মথুরা বর্জন	ঐ	শ্রীমদ্ভাগবত
যাদবী উপাখ্যান	ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায়	বিষ্ণুপুরাণ
শ্রীশ্রীচণ্ডিল উপাখ্যান	ঐ	মহাভারত
অর্জুন কীর্তি বা সত্যভামা উদ্ধার	ঐ	ঐ
শ্রীশ্রীকিশোরী লীলা বা ধনুর্যজ্ঞ	ঐ	শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ
লক্ষ্মণের শক্তিশেল	ব্রজমোহন রায়	রামায়ণ
সাবিত্রী সত্যবান	ঐ	মহাভারত

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত তালিকাটি দেখলেই বোঝা যায় যাত্রা-রচয়িতারা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত যে কেন্দ্রীভূত অংশে চলাফেরা করতেন, গীতাভিনয় রচয়িতারা সেই সঙ্কীর্ণ পথ থেকে দর্শকদের মুক্তি দিয়েছেন।

অবশ্য মতিলাল, ব্রজমোহন এবং ধর্মদাসের রচনায় যাত্রা-পালার রেশ ছিল সত্য, কিন্তু তৎকালীন গীতাভিনয় এবং পৌরাণিক যাত্রার প্রভাবে তাঁরা পূর্বের যাত্রারীতির পথ থেকে সরে এসেছিলেন।

যাত্রার নিকট আপেক্ষিক ঋণ থাকা সত্বেও গীতাভিনয় এবং পৌরাণিক নাটক ঊনবিংশ শতাব্দীর যাত্রা রচনার গতিকে প্রায় স্তব্ধ করে দিয়েছিল। গীতাভিনয়-রচয়িতা মনোমোহন বসু একাধিক স্থানে এর প্রয়োজন নির্দেশ করেছেন। ন্যাশানাল থিয়েটারের প্রথম সাম্বৎসরিক সভায় তিনি যে মূল্যবান মন্তব্য করেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য :

> ....—"যাত্রাওয়ালারা স্বভাবের ঘাড় ভাঙ্গিয়া অপ্রাকৃত সং, রং, ঢং ইত্যাদি তামাসা দেখাইবার পরেও সহস্র সহস্র লোকের যে এতদুর চিত্তরঞ্জন করিতে সমর্থ হয়, সে কি শুদ্ধ দেশস্থ লোকের অভিজ্ঞতা ও গুণ গ্রহণের অক্ষমতাপ্রযুক্ত ? কদাচ নহে। স্বভাবের বৈপরীত্যে মনুষ্যলোকে যে যাহা করিবে, তাহা সভ্য, অসভ্য, শিক্ষিত, অশিক্ষিত মনুষ্য মাত্রেরই ভাল লাগিবে না ; তবে যে যাত্রাওয়ালারা সুসিদ্ধ হয় তাহা কেবল তাহাদের গান ভিন্ন আর কিছুই না।"

যাত্রার সঙ্গীতাধিক্য, স্থান-কাল-চরিত্রে অনৈক্য এবং রুচিহীনতা গীতাভিনয় এবং পৌরাণিক নাটকে যথেষ্ট কমে এসেছিল বলা যায়।

মধ্যযুগের ধর্মপ্রবণ মানুষের মনে ভক্তিভাব প্রকাশের জন্য যে যাত্রার জন্ম হয়েছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে সেই যাত্রার পদস্খলন ঘটল। যাত্রায় ভক্তিরসের দৈন্যই গীতাভিনয় এবং পৌরাণিক নাটক রচনায় স্ফূর্তি এনেছিল। যাত্রার বিবর্তনে শেষ পর্যন্ত ভক্তিরসের অনুপস্থিতির কথা পাওয়া যায় ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায়ের 'শ্রীশ্রীরাধা গীতাভিনয় বা রোষণ মর্ষণ দৈত্যবধ'-এ বৃদ্ধশর্মার উক্তিতে—···"এ রাজ্যে যাত্রার সময় কোন দেবতার নাম পর্যন্ত শুনতে চায় না। কি চায় জান ঠাকুর, কেবল আনন্দ, আনন্দ। যাত্রা করে যদি দুঃখই হ'ল. চোখের জলে ভাসলাম, ভবে সে যাত্রায় লাভ ?" (দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য)। যাত্রার পরিবর্তে গীতাভিনয়ে এল দেবপ্রসঙ্গ ও ভক্তিমার্গীয় ধ্যান। এই ভক্তির কথা মতিলাল রায় তাঁর 'ব্রজলীলা' গীতাভিনয়ে কর্ণের উক্তির মধ্যে জোর দিয়ে শুনিয়েছিলেন :

'যিনি মুক্তি কামনা করবেন, তিনি অগ্রে ভক্তি সঞ্চয় করুন, ভক্তি ভিন্ন হরিকে পাওয়া যায় না। আর হরি ভিন্ন কাহারও মুক্তি দিবার ক্ষমতা নাই, ভক্তি ভিন্ন কি হরি মিলে ?'

গীতাভিনয়ের মধ্য দিয়েই উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের বাঙালী দর্শক-সমাজ একদিকে নবীন ভক্তিরসের সন্ধান পেল অন্যদিকে নাটকীয় রূপ-রীতির সঙ্গেও পরিচিত হল। তাই দেখি তৎকালীন সামাজিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক, প্রহসন, এবং পৌরাণিক নাটকের পাশাপাশি গীতাভিনয়ের অবিরল সৃষ্টি প্রাচুর্য। তবু যে একই সময়ে 'পৌরাণিক যাত্রা' রূপে একশ্রেণীর রচনার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল তার কারণ গীতাভিনয়ের গীত এবং নৃত্য অংশকে কিঞ্চিৎ পরিবর্জিত করে এক শ্রেণীর দর্শক সংলাপধর্মী অভিনয়ের প্রত্যাশা করছিল। গীতাভিনয় অপেক্ষা সঙ্গীত কম থাকলেও পৌরাণিক নাটকের মত নিটোল নাট্যরীতি না থাকায় 'পৌরাণিক যাত্রা' নামে একটি স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্ট হয়। উনিশের শতকের শেষ তিনটি দশকে পুরাণের ভক্তি ও বিশ্বাসের আবরণে সংলাপধর্মী গীতাভিনয়-সদৃশ রচনাগুলিই 'পৌরাণিক যাত্রা' রূপে পরিচিত। এই শ্রেণীর যাত্রার মধ্যে পুরানো যাত্রার ভক্তিরস আবার নূতন মর্যাদা ফিরে পেয়েছিল বলা যায়। পৌরাণিক যাত্রাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল :

ক. পৌরাণিক যাত্রাগুলিতে কৃষ্ণ-জীবন কাহিনীই অনুসৃত হত। স্বাভাবিকভাবেই এই যাত্রাসমূহের উৎস হল মহাভারত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ এবং হরিবংশ।

খ. পুরাণ কাহিনীর মাধ্যমে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সেতুবন্ধন সৃষ্টি করার ইচ্ছা এই শ্রেণীর যাত্রা রচয়িতাদের মানসিকতায় ছিল।

গ. পৌরাণিক যাত্রাগুলির আবেদন প্রধানতঃ ছিল পল্লী-জীবনের গভীরে। পৌরাণিক নাটকের আবেদন ক্ষেত্রটি তুলনামূলকভাবে অনেকবেশী প্রসারিত ছিল।

ঘ. পৌরাণিক যাত্রাগুলিতে অদৃষ্টবাদ এবং কর্মফলের প্রতি অপার বিশ্বাস উচ্চারিত।

ঙ. পৌরাণিক যাত্রার পরিণতি ট্র্যাজিক হলেও একটি ক্রোড়-অঙ্ক যুক্ত করে মিলনান্তক পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হত।

গীতাভিনয় এবং পৌরাণিক নাটকে নতুন নতুন পরীক্ষা চললেও লক্ষ্য করলে দেখা যায় যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রাও নিজেকে রূপান্তরিত করে নিতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় স্বদেশী যাত্রা এবং অতি-সাম্প্রতিক কালে ঐতিহাসিক এবং সামাজিক বিষয়-নির্ভর যাত্রা এই অভিমতেরই সাক্ষ্য বহন করে। মধ্যযুগের কৃষ্ণ-যাত্রা অথবা চৈতন্যযাত্রার সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর যাত্রার মিল খুব স্বল্প। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর যাত্রার ভিতর পার্থক্য প্রচুর। প্রকৃত কথা হ'ল, যাত্রা এমনই একটি শিল্পরূপ যা স্বতন্ত্র হয়েও রূপান্তরের পক্ষপাতী।

পৌরাণিক নাটকের সঙ্গে যাত্রার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। উনবিংশ শতাব্দীর নাট্যসাহিত্যের একটি বৃহৎ অংশ অধিকার করে আছে পৌরাণিক নাটক। তারাচরণ শীকদার থেকে শুরু করে গিরিশচন্দ্র ঘোষ পর্যন্ত বেশ ক'জন নাট্যকার পুরাণের বহুপ্রচলিত এবং স্বল্পপ্রচলিত কাহিনীগুলিকে অবলম্বন করে যে পৌরাণিক নাটক-গুলি লিখেছিলেন সেগুলির উপর একদিকে যেমন প্রথাসিদ্ধ ধর্মীয় জীবনের প্রভাব পড়েছিল তেমনি যুক্ত হয়েছিল উনিশ শতকীয় পাশ্চাত্ত্য আদর্শ। বাংলা পৌরাণিক নাটকগুলির ক্ষেত্রে যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব পড়েছিল তা দেহের, আত্মার নয়। আসলে পৌরাণিক নাটকগুলি তাদের প্রাণসম্পদ সঞ্চয় করেছিল দেশীয় ভাণ্ডার থেকে। সেদিক থেকে যাত্রা এবং পৌরাণিক নাটকের কাহিনী-উৎস প্রায়শঃ একই। উনবিংশ শতাব্দীর সখের যাত্রার রচয়িতাদের পাশে সরিয়ে রাখলে দেখা যায় পৌরা-ণিক নাট্যকারদের মত যাত্রারচয়িতাদের অন্তরেও ধর্মবোধ এবং ভক্তিভাবের স্রোতটি উচ্ছল ছিল। পুরানো যাত্রায় বিকশিত ধর্মভাব যে বাংলা পৌরা-নিক নাটকের মূলে শক্তিসঞ্চার করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

হরচন্দ্র ঘোষ এবং মধুসূদন দত্ত যাত্রার প্রভাবমুক্ত হয়ে পাশ্চাত্ত্য অনুসারী নাটক লিখতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। হরচন্দ্র 'ইংলণ্ডীয় নাটকের প্রচলিত প্রণালী'তে 'কৌরব বিয়োগ নাটক' লিখতে গিয়ে 'historical tragedy'-র

পথচ্যুত হয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত কাশীদাসী মহাভারতের অংশবিশেষের গদ্যরূপ মাত্র দিয়েছেন। মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা'ও সার্থক পৌরাণিক নাটক হয়ে উঠতে পারেনি। ধর্মবিশ্বাসী বাঙালীর জাতীয় রস-চৈতন্য পৌরাণিক নাটকের মধ্যে রসাস্বাদ খুঁজে ফিরেছে। গিরিশ-পূর্ব নাট্যকারগণ যাত্রা-রচয়িতাদের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ করলেও এ কথা অস্বীকার করা যায় না মধ্যযুগের নাটগীত, লোক-নাটগীত, এবং পরবর্তীকালের কৃষ্ণযাত্রা, কালীয়দমনযাত্রা ইত্যাদির ভিতর দৈববিশ্বাস এবং ভক্তিবাদের ফল্গুস্রোত প্রবাহিত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য নাট্যলক্ষণের সঙ্গে বাংলার যাত্রাসমূহের ভক্তি-রসের মিশ্রণে যে পৌরাণিক নাটকগুলির জন্ম ঘটেছে সেগুলি ব্যাপক জন-প্রিয়তা লাভ করে। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলির অসামান্য সাফল্যের পিছনে এই বিষয়টি নিহিত আছে।

কলকাতার রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্র যখন প্রথম উপস্থিত হন তখন নাগরিক জীবনে যাত্রা, কবি এবং অন্যান্য লোকসংগীতের যথেষ্ট সমাদর—দেশীয় যাত্রাগুলির মধ্যে উত্তর-ভারত থেকে আগত নানা রাগসঙ্গীত বিমিশ্রিত হওয়ার ফলে একটি নূতন ধারা জন্মলাভ করে এবং যাত্রার এই নবরূপ তৎ-কালীন জনসাধারণের মত গিরিশচন্দ্রকেও আকৃষ্ট করে। 'বিশেষতঃ যাত্রার পৌরাণিক আবহাওয়া তখনও বাঙ্গালী রসিকদের চিত্তাকাশ আচ্ছন্ন করিয়া-ছিল।'[১৯] যাত্রার রসবোধ ও ভক্তিবাদে অনুপ্রাণিত গিরিশচন্দ্র সামাজিক নাটক, প্রহসন অথবা ঐতিহাসিক নাটক না লিখে পৌরাণিক নাট্যরচনায় প্রস্রবণ বইয়ে দিলেন। যাত্রার ভক্তিভাব এবং দেবচরিত্রের মাহাত্ম্যের সঙ্গে মানবিক অনুভূতির সংযোগ ঘটিয়ে গিরিশচন্দ্র যে পৌরাণিক নাটকগুলি লিখলেন তা জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছে গেল। গিরিশ-পূর্ব অথবা গিরিশ-উত্তর আর কোন পৌরাণিক নাট্যকার যাত্রার সু-আদর্শকে এমনভাবে গ্রহণ করেন নি।

পৌরাণিক নাটকে যাত্রার ন্যায় গীতাধিক্য না ঘটলেও যাত্রার গীতরীতি পৌরাণিক নাটকে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। 'যাত্রা' প্রকৃতপক্ষে 'যাত্রাগান'।

১৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য: বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬০, পৃঃ ৩৬৬

"যাত্রাভিনয়ে প্রচুর গানের সন্নিবেশহেতু, সংক্ষেপে গান সর্বস্ব অভিনয়ের জন্য যাত্রা শব্দের সঙ্গে গান শব্দটি যুক্ত হয়ে যাত্রাগান নামে একধরণের সঙ্গীত-বহুল অথবা সঙ্গীতাত্মক অভিনয়কে বোঝাতে থাকে। যাত্রাগান তাই শ্রোতব্য—দ্রষ্টব্য নয়।"[২০] উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত যাত্রায় সঙ্গীতবাহুল্য একটি রুচির পথ ধরে এসেছিল। শ্রীদামের আখড়াই গান, পরমানন্দের 'তুক্কো', যাত্রাগানকে সমৃদ্ধ করেছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে যাত্রাসঙ্গীতে পরিবর্তন দেখা দেয়। বঙ্গদর্শন পত্রিকা এই প্রসঙ্গে লিখেছিল :

> "কয়েক বৎসর হইল, আর এক পদ্ধতির যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। ইহাকে কেহ কেহ অপেরা বলে, কেহ বা উপহাস করিয়া অপ্পেরা বলে। ইহাতে শামলা আছে, পেণ্টুলান আছে, কোট আছে, চীৎকার আছে, পতন আছে, উত্থান আছে, ইহাতে দেখিবার জিনিস যথেষ্ট। পূর্বে লোকে যাত্রা শুনিত, এখন লোকে যাত্রা দেখে। তাহাতেই এই নূতন যাত্রাতে বেশভূষার এত জাঁক, সঙ্গীত ও কাব্যরসের এত অভাব।"[২১]

'বঙ্গদর্শনে' পূর্বের যাত্রার গীতাধিক্য ক্ষীণ হয়ে আসায় দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু পৌরাণিক নাটকে যাত্রা এবং গীতাভিনয়ের সঙ্গীত প্রভাব যে এই কারণে অনুভূত হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গীতাভিনয়ের মত পৌরাণিক নাটকও যাত্রাসঙ্গীতকে পরিশীলিত করে নিয়ে নতুন সঙ্গীত রচনা করেছে। তবে যাত্রার তুলনায় যেমন গীতাভিনয়ে সঙ্গীত কমে এসেছে তেমনি গীতাভিনয়ের তুলনায় পৌরাণিক নাটকেও সঙ্গীত কমে এসেছে। যাত্রা এবং গীতাভিনয়ে প্রয়োজনের তুলনায় বহু গান ব্যবহৃত হয় কিন্তু অধিকাংশ পৌরাণিক নাটকে কেবলমাত্র নাট্যিক প্রয়োজনেই সঙ্গীত ব্যবহৃত। যাত্রায় অপ্রয়োজনে হাসির গান ব্যবহার

২০. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য : যাত্রাগানে মতিলাল রায়, কলিকাতা, ১৩৭৪, পৃঃ ৪

২১. বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন, ১২৮৯ বঙ্গাব্দ।

প্রায় সিদ্ধ-নিয়ম কিন্তু পৌরাণিক নাটকে এমন গান খুব কমই আছে। যাত্রা এবং গীতাভিনয়-সঙ্গীতকে অতিক্রম করে পৌরাণিক নাটকের সঙ্গীতে কয়েকটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, সেগুলি হল—

ক. পৌরাণিক নাটকে ভক্তি-আবেদন সৃষ্টির জন্য সঙ্গীত ব্যবহার করা হত।

খ. এই শ্রেণীর নাটকে কোন কোন গানের যথেষ্ট 'Entertainment Value' ছিল—যে চরিত্রের পক্ষে এই জাতীয় গান গাওয়া শোভন কেবল তার মুখেই দেওয়া হত।

গ. পৌরাণিক নাটকের সমস্ত সঙ্গীতই পৌরাণিক সঙ্গীত নয়—সামাজিক ও ঐতিহাসিক নাটকের মত এই নাটকেও জনপ্রিয় সঙ্গীত ব্যবহৃত হত।

ঘ. পৌরাণিক নাট্যসঙ্গীতের অনুপ্রেরণাতেই সমসাময়িককালে পৌরাণিক গানের জন্ম।

যাত্রায় চরিত্রের বিকাশ অপেক্ষা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠাই বেশী স্থান জুড়ে আছে। গীতাভিনয়ের ক্ষেত্রেও এই মন্তব্য আংশিকভাবে উচ্চারণ করা যায়। এর ফলে যাত্রা এবং গীতাভিনয়ে দ্বন্দ্বের স্থান তেমন উচ্চে নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যে কৃষ্ণযাত্রাগুলি রচিত হয়েছিল সেগুলির কাহিনী দ্বন্দ্বহীন—ঈশ্বর-বিশ্বাসের উত্তাল আতিশয্যে প্রতিটি চরিত্রই নিষ্ক্রিয়। পৌরাণিক নাটকের মর্মকোষেও ভক্তির স্থান তীব্র ছিল সত্য কিন্তু তারাচরণ, হরচন্দ্র, মধুসূদন প্রমুখ নাট্যকারগণ সংস্কৃত নাটক এবং যাত্রার দ্বন্দ্বহীনতা থেকে তাঁদের নাটককে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তা সত্বেও মধুসূদনের মৌলিক পৌরাণিক নাটক 'শর্মিষ্ঠা' যাত্রার অলৌকিকতা এবং অতিপ্রকৃত থেকে সরে এলেও তাঁর নাট্যচরিত্রগুলি দ্বন্দ্বমুখর হতে পারে নি। তারাচরণের 'ভদ্রার্জুন' নাটকের নায়ক অর্জুন সুভদ্রাকে অপহরণ করার সময় যদি বিরোধীদের সঙ্গে সংগ্রাম করতেন তাহলে তাঁর অর্জুন চরিত্র 'সজীব' হয়ে উঠতে পারত। নায়িকা সুভদ্রা দ্বন্দ্ব-সংঘাতহীনা, সত্যভামা দ্বিধাহীনা একটি যন্ত্রচালিতা নারীমাত্র। হরচন্দ্র তাঁর 'কৌরব বিয়োগ' নাটকটিকে 'historical tragedy'-র পথে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ

করলেও ট্রাজেডির প্রধান অবলম্বন দ্বন্দ্ব এই নাটকে অনুপস্থিত। নায়ক ধৃতরাষ্ট্র শ্রোতামাত্র, নায়িকা গান্ধারী মূক নারী। অর্থাৎ যাত্রার দ্বন্দ্বহীনতা থেকে উত্তরণের ইচ্ছা থাকলেও পৌরাণিক নাট্যরচনাকালে নাটকারগণ সেই ত্রুটি থেকে মুক্ত হতে পারেননি। পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্রও যাত্রার এই দ্বন্দ্বহীনতাকে এড়িয়ে যেতে পারেন নি। ঐতিহাসিক নাটকে দ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে সফল হলেও দ্বিজেন্দ্রলাল পৌরাণিক নাটকে দ্বন্দ্বকে অঙ্কুরিত করতে পারেন নি। তাঁর 'পাষাণী' নাটকের নায়িকা অহল্যা একদিকে গৃহজীবনের কর্তব্য, অন্যদিকে প্রাণের দাবী—এই দুই মেরুর মধ্যবিন্দুতে দোলায়িত হয়ে একটি সার্থক দ্বন্দ্বমুখর চরিত্র হতে পারত। অথচ নাটকে তার ভূমিকা নীরব দর্শকের। সুতরাং বলা যায় বাংলা নাটকের অন্যান্য ধারা অপেক্ষা পৌরাণিক নাট্যের ধারায় দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ছবি যথেষ্ট কম এবং এর কারণ তার উপর যাত্রা এবং গীতাভিনয়ের প্রভাব।

পাশ্চাত্ত্যের অধিকাংশ ভাল নাটকই ট্র্যাজেডি-মধুর। প্রাচ্যের, বিশেষতঃ ভারতীয় সংস্কৃত নাটকগুলি এবং যাত্রাসমূহ করুণরস সৃষ্টির ঘোরতর বিরোধী। সুপ্রাচীন গ্রীক নাটকে এবং এলিজাবেথের যুগে ইংরেজী নাটকে ট্র্যাজেডির স্থান ছিল সর্বোচ্চে। পাশ্চাত্ত্য নাট্য-সমালোচকগণ ট্রাজেডির রসকে শ্রেষ্ঠ রস বলেছেন। কিন্তু 'নাট্যশাস্ত্র' প্রণেতা ভরতমুনি সংস্কৃত নাটকে বিয়োগান্ত রসকে নিষিদ্ধ করেছেন। এদেশের লোকনাট্যগুলিও (Folk Drama) সেই নির্দেশ পালন করেছে। যাত্রায় কোথাও কোথাও করুণরস সৃষ্টির জন্য বিলাপের সঙ্গে 'পতন ও মূর্ছা'র বহুল প্রয়োগ চোখে পড়ে। কৃষ্ণচিন্তায় দ্রৌপদী মূর্ছিতা হন, তাঁর মূর্ছা দেখেন অর্জুন চেতনা হারান, অর্জুনের অবস্থা দেখে সহদেব এবং সঙ্গে সঙ্গে নকুলেরও মূর্ছা ঘটে।[২২] কোন

২২. এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত নাট্য সমালোচক Lajos Egri-র একটি উক্তি উদ্ধার করা যায়—Characters who cannot make decision in a play are responsible for static conflict—or, rather, let us blame the dramatist who chooses the characters. You cannot expect a rising conflict from a man who wants nothing or does not know what he wants.

—The Art of Dramatic writing, U.S.A, 1963, P—136.

কোন ক্ষেত্রে সাময়িক করুণরস সৃষ্টির জন্য অস্বাভাবিকতার আশ্রয়ও নেওয়া হত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভক্তিরসের উদ্দীপক হিসাবে দায়িত্ব পালন করায় যাত্রাগুলি কমেডির কাছে আত্মসমর্পণ করে।

বাংলা নাটকের জন্মলগ্নের নাট্যকার যোগেশচন্দ্র গুপ্ত ভারতীয় নাট্য মন্দিরে করুণরসের অভাবের কথা তাঁর 'কীর্তিবিলাস' নাটকের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন এবং সেজন্য তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন। তাঁর এই ক্ষোভ স্বাভাবিক। কিন্তু লক্ষ্য করার ব্যাপার হল পরবর্তী বাংলা পৌরাণিক নাট্যকারগণ বিদেশী ট্র্যাজেডিসমূহের সঙ্গে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও এবং যাত্রায় ট্র্যাজেডির অভাব সম্পর্কে সচেতন হয়েও সার্থক ট্র্যাজিক নাটক দু'একটির বেশী লিখতে পারেননি। মনোমোহন বসু তাঁর প্রথম রচনা 'রামাভিষেকে'র প্রস্তাবনায় নটের মুখে তৎকালীন নূতন যাত্রা বা সখের যাত্রা রীতিকে 'জঘন্য' বলে বিদ্রূপ করলেও তাঁর গীতাভিনয়-নাটকে যাত্রার রসরূপটি অস্বীকৃত হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর 'হিতবাদী' পত্রিকা লিখেছিল:

> "রসাবতারণায়, বিশেষতঃ করুণরস অবতারণায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার নাটক পড়িয়া ও উহার অভিনয় দেখিয়া বাঙ্গালী হাসিয়াছে এবং কাঁদিয়াছে।"[২৩]

কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায় একটি ছাড়া মনোমোহনের আর সব পৌরাণিক রচনাই মিলনান্তক। তাঁর 'সতী নাটকে'র বিষয় সতীর দেহত্যাগ। এই করুণ কাহিনীকে নিয়ে তিনি প্রথমে বিষাদান্ত নাটকই লিখেছিলেন, কিন্তু নাটকটি প্রচারের কিছুদিন পর 'হরপার্বতী মিলন' নামে একটি ক্রোড়-অঙ্ক যুক্ত করে নাট্যকার 'পুনর্মিলনানুরাগী' জনসাধারণের মন রেখেছিলেন। রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে এই দ্বৈত আচরণ সম্পর্কে মনোমোহন নিজেই বলেছেন—

> 'আমি কোন পক্ষের পক্ষ কি বিপক্ষ হইতে আসি নাই, ব্যক্তিবিশেষকে তোষামোদ বা শ্লেষাস্ত্রের লক্ষ্য করিতে আসি নাই; আমি আমোদজনক নীতি প্রসঙ্গের সঙ্গে এক পক্ষকে এই কথা বলিতে আসিয়াছি—এই চীৎকার করিতে আসিয়াছি—এই দোহাই

২৩. হিতবাদী, ৪ঠা ফাল্গুন, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ

পাড়িতে আসিয়াছি,—স্থির হও ; উন্নতির পথে যাইতেছ উত্তম ! কিন্তু একটু মন্থর গতিতে চল ; শনৈঃশনৈঃ পাদক্ষেপ কর ; সমযাত্রীদের কুড়াইয়া লও ; সঙ্গী ছাড়িয়া কোথা যাও ? সঙ্গীহারা কেন হও ।'[২৪]

(গিরিশচন্দ্রের 'জনা' নাটকে করুণরসের যথাযথ বিকাশ হলেও শেষ পর্যন্ত ক্রোড়-অঙ্কে পৌঁছে সেই রস অকস্মাৎ বঞ্চিত হল ।) ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নর নারায়ণ' নাটকে কর্ণ চরিত্রে যে ট্রাজেডি-মহত্ত্ব নিহিত ছিল, 'নরে নারায়ণ বোধ' সেই ট্রাজেডি-সম্ভাবনাকে খর্ব করেছে নিঃসন্দেহে। বাংলা পৌরাণিক নাট্যকারগণের নাটকে ট্রাজেডির যে সম্ভাবনা ছিল তা কমেডির ফুৎকারে বিলীন হয়ে গেছে।

বাঙালীর ধর্মবিশ্বাস এবং ভক্তিবোধ তার বহু শতাব্দীর জন্মগত সংস্কার। এই সংস্কার যুগে যুগে নানা স্রোতঃপথে প্রবাহিত হয়েছে। পাঠ্যকাব্যের মধ্যে বাঙালী যেমন ভারতীয় পুরাণ কাহিনীকে আত্মস্থ করেছে, দৃশ্যকাব্যের মধ্য দিয়েও ধর্ম, সমাজ এবং রসোপলব্ধির স্বার্থে পুরাণের অনুসরণ করেছে। অন্যদিকে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা এবং সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত পৌরাণিক নাট্যধারাকে বিপুলভাবে না হলেও সামান্যভাবে অবশ্যই প্রভাবিত করেছে। এই দ্বৈত আদর্শের সমবায়ে সৃষ্ট পৌরাণিক নাটক ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী দর্শক-সমাজকে প্রভূত আনন্দ বিতরণ করেছিল।

পৌরাণিক নাট্যকারদের এরূপ একটি দুরূহ ব্রত সম্পাদন করতে হয় যা যাত্রা অথবা গীতাভিনয় রচয়িতাদের ভাবিত করে না। পুরাণ এবং নাটকের জগৎ দুটি ভিন্ন মেরুতে অবস্থিত। পুরাণের ভক্তিবাদ এবং অলৌকিকতাকে নাটকের বাস্তব দর্পণে প্রতিফলিত করার জন্য গভীর নিষ্ঠা প্রয়োজন। কিছু কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও পৌরাণিক নাট্যকারগণ পুরাণের সঙ্গে নাটকের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। সেই কারণেই বাংলা নাট্যসাহিত্য এবং রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে পৌরাণিক নাটকের একটি নির্দিষ্ট আসন রয়েছে।

২৪. মধ্যস্থ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩ই এপ্রিল ১৮৭২

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পুরাণ ও ইতিহাস : পৌরাণিক নাটক ও ঐতিহাসিক নাটক ॥

প্রাচীন সভ্যতা এবং সংস্কৃতি প্রতিটি দেশের সাহিত্যের উন্মেষ লগ্নেই নিজের স্থানটি করে নেয়। সংস্কৃত সাহিত্যের যে ধারাটি পুরাণ নামে চিহ্নিত, তার ভিতর দিয়ে খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের ইতিহাস, সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং সংস্কারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। ধর্মীয় কথাকাহিনী পরিবেশনের মধ্য দিয়ে মানবমনের নৈতিক ভাব-ভাবনার পথ-নির্দেশই পুরাণ রচয়িতাদের মূল লক্ষ্য ছিল। কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হয় অধিকাংশ পুরাণেই সমকালীন ইতিহাস এবং সমাজ-জীবনের পরিচয় আংশিক হলেও উপস্থিত। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা পৌরাণিক নাটকগুলি আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা যায় ঐ শতাব্দীর ইতিহাস এবং তৎকালীন সমাজের ধর্মীয় জীবন-জিজ্ঞাসা সেগুলিকে নিশ্চিতভাবে প্রভাবিত করছে। সুতরাং বাংলা পৌরাণিক নাটকগুলির আলোচনাসূত্রে ইতিহাসের সঙ্গে পুরাণের এবং সমাজের সঙ্গে পুরাণের সম্পর্কটি আলোচনা করার প্রয়োজন থেকে যায়।

পুরাণগুলির মধ্যে ইতিহাসের বীজ প্রকৃতপক্ষে আছে কিনা এ নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে এবং এ সম্পর্কে শেষ কথা আজও জানা যায় নি। সংস্কৃত পুরাণগুলির তীব্র সমালোচক Goldstucker তাঁর "Inspired writings of Hinduism" গ্রন্থে পুরাণের ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করেছেন (পৃঃ ১০৪)। Monier Williams তাঁর "Hinduism" গ্রন্থে লিখেছেন—"The Itihass are the legendary histories of heroic men before they were actually deified, whereas the Purans are properly the history of the same heroes converted into positive Gods, and made to occupy the highest position in the Hindu Pantheon!" অথচ Williams পুরাণসমূহের ভিতর ইতিহাসের উপাদানের, উপস্থিতির কথা নিজেই স্বীকার করেছেন।

মহাভারতকার ব্যাসদেব তাঁর মহৎ মহাকাব্যের মধ্যে ইতিহাসের

উপস্থিতির কথা নিজেই জানিয়েছেন।[১] মৎস্যপুরাণেও (৫৮-৪) বলা হয়েছে 'বেদবাদিগণ পুরাণসমূহে এই ইতিহাস পাঠ করিয়া থাকেন।' মহাভারতের আদিপর্বে একটি শ্লোকে বলা হয়েছে :

আচখ্যুঃ কবয়ঃ কোচিৎ সম্প্রত্য চক্ষতে পরে।
আখ্যাসন্তি তথৈবাচ্যে ইতিহাসমিমং ভবি ॥[২]

অর্থাৎ কয়েকজন কবি এই ইতিহাস পূর্বে বলে গেছেন, এখন অপর কবিরা বলছেন, আবার ভবিষ্যতে অন্য কবিরাও বলবেন। বায়ুপুরাণেও (১.২০১) ইতিহাস ও পুরাণের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে ইতিহাস ও পুরাণকে 'পঞ্চমবেদ' নাম দিতে দেখা যায়।

পুরাণসমূহের পৃষ্ঠায় অন্যান্য বিষয়গুলির মত "History of Ancient Dynasties" উপস্থাপিত হত। ভবিষ্যপুরাণের মধ্যেই সর্বপ্রথম কলিযুগের রাজকাহিনীর ইতিহাস পাওয়া যায়। স্কন্দপুরাণ ' contains, like Markandeya, Bramha, Matsya and Vayu, the longest lists of countries and peoples of India.'[৩] শিশুনাগ, নন্দ, মৌর্য, শুঙ্গ, অন্ধ্র, গুপ্ত ইত্যাদি রাজবংশের ইতিহাসও পুরাণের পাতায় আছে।

ঐতিহাসিক ধারাবাহিকভাবে অতীত ঘটনা এবং চরিত্রের বিশ্বস্ত প্রতিফলন ঘটাতে চান, কিন্তু পুরাণের ভঙ্গী একান্ত নিজস্ব। পুরাণগুলিকে আশ্রয় করে বিভিন্ন শতাব্দীর দর্শন, অধ্যাত্মবাদ, ইতিহাস ইত্যাদি বিকশিত হয়েছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা যায় যতদিন পর্যন্ত মানুষের লেখ্য প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেনি ততদিন পর্যন্ত জাতির ইতিহাস স্মৃতি-নির্ভর ছিল। পুরাণগুলি রচনার সময়ও এই মানসিকতা হারিয়ে যায়নি। Homer এবং Firdusi-র[৪] মত কবিরা এই মানস-অনুভূত ইতি-

১. অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমীতিহাসং পুরাতনম্—মহাভারত, বনপর্ব, ২৫৯, ৩৫.
২. মহাভারত, আদিপর্ব, ২৬.
৩ Ali, S. Muzafer : The Geography of the Puranas, New Delhi, 1968.
৪. রমেশচন্দ্র দত্ত অনূদিত ইংরাজী "Maha-Bharata" (London, 1898) গ্রন্থের Introduction লিখতে গিয়ে Max. Muller এঁদের সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন (P-VII)।

হাসের উপর ভিত্তি করেই কাব্য লিখেছেন। ঐতিহাসিক-পরিবেশিত কোন তথ্য তাঁদের হাতে ছিল না। ভারতের সাহিত্যে এই ঐতিহাসিক তথ্যের অভাবের আর একটি কারণ আছে। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-৮৫) তাঁর সম্পাদিত 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' গ্রন্থে লিখেছেন—

'এতদ্দেশের প্রাচীন ইতিহাস পুস্তকে অনেক নরপতি ও বীরদিগের দেবপুত্র রূপে বর্ণনা আছে; ইহাতে বোধ হয় পুরাকালীন লোকদের সত্যাপেক্ষা অদ্ভুত বিবরণে অধিক আদর ছিল এবং পুরাণ লেখকেরা কবিতার ছান্দোলালিত্যের প্রতি অনুরক্ত হইয়া শব্দ বিন্যাস করতঃ পাঠকবর্গের মনোরঞ্জন পুরঃসর বিবিধ বিষয়ে উপদেশ করিতে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; সুতরাং অবিকল ইতিবৃত্ত লিখিয়া স্ব স্ব কল্পনাশক্তিকে খর্ব করেন নাই।'

ভারতীয়দের ইতিহাসচর্চায় অনুৎসাহ এবং পুরাণ রচনায় আগ্রহের কারণ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বাঙ্গালার ইতিহাস' নামক প্রবন্ধে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি লিখেছেন:

'ভারতবর্ষীয়দিগের যে ইতিহাস নাই, তাহার বিশেষ কারণ আছে। জগতের যাবতীয় কর্ম দৈব অনুকম্পায় সাধিত হয়, ইহা তাহাদিগের বিশ্বাস। এজন্য সুতের নাম দৈব, তাঁহারা দেবতাই সর্বত্র সাক্ষাৎ কর্তা বিবেচনা করেন। এজন্য তাঁহারা দেবতাদিগেরই ইতিহাস কীর্তনে প্রবৃত্ত; পুরাণেতিহাসে কেবল দেব-কীর্তিই বিবৃত করিয়াছেন। ...মনুষ্য কেহ নহে, মনুষ্য কোন কার্যেরই কর্তা নহে, অতএব মনুষ্যের প্রকৃত গুণকীর্তনে প্রয়োজন নাই। এ বিনীত মানসিক ভাব ও দেবভক্তি ইতিহাস না থাকার কারণ'।[৫]

ইতিহাসে প্রসিদ্ধ তীর্থ এবং রমণীয় দৃশ্যময় স্থানের বর্ণনা যেমন আছে, তেমনি একাধিক পুরাণেও তা আছে। পদ্মাপুরাণের ভূমিখণ্ডে এমনই কয়েকটি তীর্থের বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়; অগ্নিপুরাণে গয়া, ব্রহ্মবৈবর্ত এবং বরাহপুরাণে মথুরা ও পুরী এবং বামনপুরাণে থানেশ্বর অঞ্চলের দীর্ঘ বিস্তৃত বর্ণনা মেলে। মৎসপুরাণে (১১০.৭) সাড়ে তিন কোটি তীর্থস্থানের উল্লেখ আছে। যেহেতু পুরাণগুলি বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন পরিবেশে রচিত তাই সেই সেই যুগের ইতিহাসের ছায়াপাতও গ্রন্থগুলিতে ঘটেছে।[৮]

৫. বঙ্গদর্শন, ১২৮১ বঙ্গাব্দ

R. C. Hazra[৬] এবং P. C. Sircar[৭] তাঁদের মূল্যবান গ্রন্থে পুরাণগুলির ভাষাতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণ করেছেন।

ইতিহাসের প্রতিষ্ঠা যেমন চিরন্তন, পুরাণের আবেদন তেমনই শাশ্বত। রাজশেখর বসু লিখেছেন—"পুরাণকথার একটি মোহিনী শক্তি আছে। যদি নিপুণ রচয়িতার মুখ বা লেখনী থেকে নির্গত হয় তবে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সকলকেই মুগ্ধ করতে পারে। প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি আমাদের একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, তার ত্রুটি আমরা সহজেই মার্জনা করি। শিশু যেমন রূপকথার অবিশ্বাস্য ব্যাপার মেনে নিয়ে গল্প শোনে, আমরাও সেইরূপ পৌরাণিক অতিশয়োক্তি, অসঙ্গতি মেনে নিয়ে প্রাচীন সাহিত্য উপভোগ করতে পারি। এর জন্য ধর্মবিশ্বাস বা পূর্বসংস্কার একান্ত আবশ্যক নয়, উদার পাঠক সর্বদেশের পুরাণই সমদৃষ্টিতে পাঠ করতে পারেন।"[৮]

ইতিহাস সাহিত্য নয় কিন্তু পুরাণের সাহিত্যিক মূল্য তার ঐতিহাসিক মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী। ইতিহাসে কখনও কখনও জনশ্রুতি এবং কিংবদন্তীর কিছু কিছু কথা এসে যায় ঠিকই কিন্তু ঐতিহাসিকের একান্ত লক্ষ্য থাকে তথ্য (fact) পরিবেশনের দিকে। পুরাণে 'তথ্যে'র চেয়ে 'সত্য' (Truth)-এর স্থান অনেক উঁচুতে। ইতিহাসের সঙ্গে পুরাণের এই দিক থেকে দূরত্ব রয়েছে। ঐতিহাসিক বলেন 'ঘটে যা তা সব সত্য' আর পুরাণকার বলেন 'ঘটে যা তা সব সত্য নহে'। এইজন্যই পুরাণ একদিক থেকে সাহিত্য কিন্তু ইতিহাস বিবরণমাত্র।

পৌরাণিক নাটক এবং ঐতিহাসিক নাটকের তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন :

"নাট্যসাহিত্যে ঐতিহাসিক নাটকের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। কারণ, ইতিহাস সত্য ঘটনার বিবরণ, ইহার মধ্যে অলৌকিকতা কিছুমাত্র নাই। ইতিহাসের মধ্যে কেবলমাত্র সত্যঘটনারই বিবরণ থাকে, ঘটনা-

৬. Hazra, R. C. : Studies in the puranic records of Hindu rites and culture, Dacca, 1940.

৭. Sircar, P. C. : Studies in the ancient and medieval India, Varanasi, 1960.

৮. বাল্মীকি রামায়ণ (সারানুবাদ), কলিকাতা, ১৩৬৩, ভূমিকা, পৃঃ ১২

রাশির অন্তরালে চরিত্রগুলির যে একটি সহজ মানবিক পরিচয় আছে, তাহা প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে, ঐতিহাসিক ঘটনারাশির অন্তরাল হইতে ইহার চরিত্রগুলির মানবিক পরিচয় উদ্ধার করাই ঐতিহাসিক নাট্যকারের কাজ। এখানে ঐতিহাসিক নাটক যেমন সত্য, ইহার চরিত্রগুলির মানবিক পরিচয় তেমনই বাস্তব হইয়া উঠিবার সুযোগ পায়।"

সুতরাং ঐতিহাসিক নাটক একদিকে যেমন ইতিহাস অন্যদিক দিয়া তেমনই নাটকও বটে। পৌরাণিক নাটক সম্পর্কে একথা বলিতে পারা যায় না ; কারণ পুরাণের অলৌকিক বিষয় অবলম্বন করিয়া আর যাহাই রচিত হউক, নাটক রচিত হইতে পারে না।"[৯]

এ সত্ত্বেও পৌরাণিক-বিষয়াশ্রিত নাটক সাহিত্যে কেন পৌরাণিক নাটকের মর্যাদা পায় তার কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ভট্টাচার্য লিখেছেন :

> "এই প্রকার পৌরাণিক নাটকের অলৌকিক চরিত্রগুলি নিজের আচরণ বাস্তবধর্মী করিয়া কিংবা কাহিনীর ধারা হইতে দূরবর্তী থাকিয়া নাটকের মধ্যে অবস্থান করিয়া থাকে।"[১০]

'পৌরাণিক' শব্দটিকে যেমন দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, 'ঐতিহাসিক' শব্দটিকেও তেমনই দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা চলে। ব্যাপক ক্ষেত্রে যে কোন ঐতিহাসিক ঘটনা এবং চরিত্রকে অবলম্বন করেই নাটক রচনা সম্ভব। যে অর্থে ইতিহাস সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মনৈতিক ইত্যাদি ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ, সেই অর্থে যে কোন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় বিষয়কে অবলম্বন করে ঐতিহাসিক নাটক রচনা সম্ভব। তবে ঐতিহাসিক নাটক রচনার সময় নাট্যকারের লক্ষ্য হওয়া চাই ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে, ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে জীবনের নিহিত ধূসর পটটিকে ফুটিয়ে তোলা। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ-উক্ত 'ঐতিহাসিক রস' সৃষ্টির দক্ষতা নাট্যকারদের আয়ত্ত করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনার যথাযোগ্য মিলন সম্ভব না হওয়ার ফলে বাংলা ঐতিহাসিক নাটকগুলি ভাল ট্রাজেডি হতে পারেনি। ঐতিহাসিক নাটকে যেমন দেশাত্ম-

৯. বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬০, পৃঃ ৩৬১

১০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬২

বোধের উচ্ছ্বাস এবং চমকপ্রদ দৃশ্যের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শনের ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার বস্তুতন্ত্রতা হারিয়ে ফেলে, পৌরাণিক নাটকও তেমনই অলৌকিকতা এবং অতিপ্রাকৃতের প্রতি বেশী মনোযোগ দেওয়ার ফলে রোমান্স-রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। তবে যেহেতু পুরাণের জগৎ দূর অতীতের তাই এই শ্রেণীর নাটকে কল্পনার বন্ধনটিকে ঐতিহাসিক নাটকের মত সংযত রাখতে হয় না। অলৌকিক ও বিস্ময়কর কার্যাবলীই পুরাণের প্রাণসম্পদ।

ইতিহাসে এমন কোন কোন মানুষের হঠাৎ দেখা মেলে যাঁরা সামাজিক জগতে চলাফেরা করেছিলেন সত্য কিন্তু যাঁদের চরিত্রশক্তির অসীমতা সাধারণ মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে ছিল। এঁরা এক হিসাবে পুরাণের মহানায়ক। অথচ পুরাণের অলৌকিক জগতে এঁদের বাস ছিল না। এঁদের জীবনাশ্রয়ে রচিত নাটকগুলিকে কোন শ্রেণীভুক্ত করা যায় সে নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। সাধনকুমার ভট্টাচার্যের অভিমত হল :

> সমস্যা এই যে, ঐতিহাসিক যুগের অতিবিখ্যাত ব্যক্তির জীবন ও চরিত—যে ব্যক্তিচরিত ইতিহাসেরই সামিল হয়ে উঠেছে এবং যা পৌরাণিক বা সামাজিক বা কাল্পনিক নামে আখ্যাত হবার উপযুক্ত নয়, অগত্যা অর্থাৎ ন্যায়তঃ ঐতিহাসিক ছাড়া আর কোন নামেরই যোগ্য নয়। যেমন ধরা যায় শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তির জীবন। ব্যাপক অর্থে এঁরা প্রত্যেকেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং এঁদের চরিত অবলম্বনে যে নাটকাদি রচিত হবে তাও ঐতিহাসিকই বটে, যদিও চরিতমূলক ঐতিহাসিক।····· এঁরা যেমন ঐতিহাসিক নয়, তেমনই সামাজিকও নয়। সামাজিক কথাটি বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত। কাল্পনিক ত' বলাই চলে না। সুতরাং এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক-কল্প চরিত নাটক বলাই যুক্তিযুক্ত।[১১]

অধ্যাপক ভট্টাচার্যের এই অভিমত যুক্তিগ্রাহ্য হলেও দেখা যায় যে বাংলায় রচিত এই শ্রেণীর নাটকে ইতিহাসের চেয়ে স্বতন্ত্র একটি যুগ প্রাধান্য পেয়েছে। চৈতন্যদেব, বিদ্যাসাগর প্রমুখ ঐতিহাসিক চরিত্রকে

১১। নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা, কলিকাতা, ১৯৬৩, পৃঃ ৪৬৩-৬৪

আশ্রয় করে রচিত নাটকগুলি পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক আদর্শ রক্ষা করতে পারেনি। গিরিশচন্দ্র রচিত 'চৈতন্যলীলা' (১৮৮৬) এবং বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় রচিত 'বিদ্যাসাগর' (১৯৪২) নাটক দুটি পড়লেই এই অভিমতের সত্যতা বোঝা যায়।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'চৈতন্যলীলা' বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থের আদি ও মধ্যখণ্ড অবলম্বনে রচিত। গিরিশচন্দ্র স্বয়ং এই নাটকটিকে ভক্তি-মূলক নাটক বলেছেন। বৃন্দাবনদাসের ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি ছাড়াও এই নাটকে ষড়রিপু, কলি, বিবেক, বৈরাগ্য ইত্যাদি অনৈতিহাসিক এবং আংশিক পৌরাণিক চরিত্র সন্নিবিষ্ট হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজে শ্রীচৈতন্য দেবতার আসনেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। গিরিশচন্দ্র নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে নিমাইয়ের উদ্দেশ্যে অতিথি ব্রাহ্মণের স্তব ব্যবহারের মধ্য দিয়ে চৈতন্য চরিত্রকে পুরাণ মর্যাদা দিয়েছেন।

বিদ্যাসাগর চৈতন্যদেবের মত দূর ইতিহাসের চরিত্র নন। মাত্র সাতাশী বছর পূর্বে তাঁর ইহজীবন শেষ হয়। সুতরাং তাঁকে কেন্দ্র করে পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক-কল্প-চরিত নাটক রচনার সুযোগ অনেক বেশী। কিন্তু নাট্যকার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় একাধিক স্থানে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন এবং বিদ্যাসাগর ব্যতীত অন্যান্য বিখ্যাত চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে ইতি-হাসসম্মত করতে গিয়ে কিছুটা ব্যর্থ হয়েছেন।

শঙ্করাচার্য, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, রামানুজ প্রমুখ সকলেই ঐতিহাসিক চরিত্র। কিন্তু গিরিশচন্দ্র থেকে শুরু করে ক্ষীরোদপ্রসাদ পর্যন্ত কোন নাট্যকারই এই সকল চরিত্রের ঐতিহাসিকতার মধ্যে পৌরাণিক লক্ষণ আরোপ না করে পারেন নি। গিরিশচন্দ্র রচিত 'শঙ্করাচার্য' (১৯০৯) নাটকে মানব-জীবন-স্পর্শ অনুপস্থিত, আগাগোড়া অলৌকিক কাহিনীতে এই নাটকটি আচ্ছন্ন। বালক শঙ্করের নির্দেশে গোদাবরী নদী ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়, শিব-শঙ্করীর বিদ্যায় শিক্ষিত হয়ে তিনি গাছের মাথা ছুইয়ে দেবার শক্তি অর্জন করেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ-রচিত 'রামানুজ' নাটকেও দেখা যায় রামানুজকে গভীর বনে ব্যাধ এবং ব্যাধ-পত্নীর ছদ্মবেশে লক্ষ্মী-নারায়ণ রক্ষা করেছেন, গোণ্ডারণ্যে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্মৃতিপটে পূর্বজন্মের কথা ভেসে উঠেছে। 'রামানুজ' নাটকে বালক মূর্তিতে বলরামের কাঞ্চিপুর্ণের সঙ্গে নিত্যলীলা ইতিহাসের প্রেক্ষাপট থেকে পৌরাণিক যুগে নিয়ে যায়।

বাংলা সাহিত্যে বেশ কিছু নাটক, যেগুলি পুরোপুরি ঐতিহাসিক নয় আবার সার্থক পৌরাণিক নাটকও নয় অথচ ঐতিহাসিক চরিত্র হলেও অলৌকিক ও অতি-প্রাকৃতিক গুণ যাদের ভিতর উপস্থিত সেই সব চরিত্রনির্ভর নাটকগুলির নানা নামকরণ করা হয়েছে। এই জাতীয় নাটককে কেউ বলেছেন 'অবতার-মহাপুরুষ নাটক', কেউ বলেছেন 'পৌরাণিক সংস্কারযুক্ত চরিত নাটক,' কেউ এগুলির নামকরণ করেছেন 'ভক্তিমূলক নাটক'. আবার কারও কারও মতে এগুলিকে 'মহাপুরুষ জীবনী বিষয়ক পৌরাণিক নাটক' বলাই সঙ্গত। এই সকল অভিমতের মধ্য থেকে যে সত্যটি বার হয়ে আসে তা হল, ইতিহাসস্বীকৃত কোন কোন চরিত্রের অলৌকিক কর্মকাণ্ডের প্রকাশই এই নাটকগুলির ধর্ম। ধর্ম এই নাটকগুলির মুখ্য আশ্রয়, ভক্তির নৈবেদ্যই নাটকগুলিতে পরিবেশিত। সুতরাং এই শ্রেণীর নাটকের নাম 'ধর্মাশ্রয়ী নাটক' দিলেও সম্ভবতঃ ভুল করা হবে না।

ধর্মাশ্রয়ী নাটকের মধ্যে একটি সুন্দর সৃষ্টি গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল' (১৮৮৮) নাটক। এই নাটকে ইতিহাসের এবং পুরাণের যৌথ মিলন ঘটেছে এবং নতুন ধর্মাশ্রয়ী নাটকের সম্ভাবনা সূচিত করেছে। বিল্বমঙ্গল সম্ভবতঃ নবম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে দেখা দিয়েছিলেন। তিনি দক্ষিণ ভারতের অন্যতম সাধককবি ছিলেন। লীলাশুক আত্মপরিচয়ে রচিত তাঁর 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' গ্রন্থ ভারতীয় ভক্তিবাদের আকাশে একটি উজ্জ্বল ধ্রুবতারা। 'ভক্তমাল' গ্রন্থে বিল্বমঙ্গল ব্যক্তি হিসাবেই পরিচিত। এ সত্ত্বেও 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' ঐতিহাসিক নাটক হতে পারেনি। এর দুটি কারণ থাকতে পারে। প্রথমতঃ বিল্বমঙ্গল সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র হয়ত যথেষ্ট ঐতিহাসিক তথ্য পাননি, দ্বিতীয়তঃ হয়ত গিরিশচন্দ্রের হৃদয়গত ধর্মাদর্শই বিল্বমঙ্গল চরিত্রে অবতার মহাপুরুষের আদর্শ আরোপে উৎসাহ যুগিয়েছে।

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর যেমন ঐতিহাসিক নাটক নয়, তেমনই পৌরাণিক নাটকও নয়। কিন্তু এ নাটকে যে পৌরাণিক নাটকের রস কিছুটা উৎসারিত হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এর কারণ প্রচলিত কথ্য সংলাপ এই নাটকে কখনও কখনও কাব্যে পরিণত হওয়ায় কোথাও কোথাও চরিত্রগুলি চেনাজানা জগৎ থেকে যেন দূরে সরে গিয়েছে। তা ছাড়া পাগলিনী চরিত্রের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার ধর্মসমন্বয় এবং শক্তি সাধনার ইঙ্গিত

দিয়েছেন। লোক-জীবনে প্রচলিত নানা ধর্মসংস্কার এই নাটকে বণিকের অতিথি সংকার, বণিক পত্নীর পাতিব্রত্য ইত্যাদি দৃশ্যের মধ্য দিয়ে আঁকা হয়েছে। এইভাবে ইতিহাস-বর্ণিত চরিত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর পৌরাণিক নাট্যকারের মানসিকতায় শোধিত ধর্মাশ্রয়ী নাটকের নায়ক নায়িকা হয়েছেন।

পুরাণ এবং ইতিহাসের মধ্যে যে পার্থক্য, পৌরাণিক নাটক এবং ঐতিহাসিক নাটক রচনায়ও সেই পার্থক্য বজায় থাকে। 'ইতি হ আস' অর্থাৎ যা ঘটেছিল তার কথাই ইতিহাসে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক নানা সূত্রের উপর নির্ভর করেন। অন্যদিকে পুরাণে অনুষ্ঠিত ঘটনার চেয়েও যে ঘটনা ঘটা উচিৎ ছিল তার কথাই বলা হয়। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক নাটক অনেক বেশী প্রামাণিক। তার ফলে ঐতিহাসিক যেখানে পাঠকের রসকেন্দ্রে তরঙ্গ তুলতে ব্যর্থ হন সেখানে পুরাণকার কাহিনীর শিকড়ে রস সিঞ্চিত করে সহজেই পাঠকের মনোহরণ করতে পারেন। ঐতিহাসিক নাট্যকার কেবলমাত্র ঐতিহাসিক চরিত্রে দোষ-ত্রুটির উপর আলোকপাত করেই নীরব থাকেন কিন্তু পৌরাণিক নাট্যকার সেখানে নাট্যচরিত্রের দোষ-ত্রুটি নির্দেশ করে দর্শককে সতর্ক করে দেন।

ঐতিহাসিক নাটকে যে কোন ঘটনাই তার কাছের কালের উপেক্ষার বাইরে দূরকালের পটভূমিকায় সত্য ও মহৎ রূপে উদ্‌ঘাটিত। পৌরাণিক নাটকেও এই কালগত ব্যবধান থাকে। এই ঘটনার দূরত্বের সঙ্গে ঘটনার সম্ভাব্যতাও রক্ষা পায়। অর্থাৎ ঐতিহাসিক নাটকে কল্পনার সঙ্গে বস্তু-জগতের একটি মিল থাকতেই হয়। পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে এমন কোন সর্ত রক্ষা করার বাধ্যবাধকতা কখনই থাকে না।

পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক—এই দুই শ্রেণীর নাটকেই গানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তবে সংখ্যার দিক থেকে ঐতিহাসিক নাটকের চেয়ে পৌরাণিক নাটকের গান অনেক বেশী। গিরিশচন্দ্র এবং দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকে ব্যবহৃত সঙ্গীতগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চরিত্রগুলির আচার-আচরণের সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন। কিন্তু পৌরাণিক নাটকে যাত্রা এবং গীতাভিনয়ের অধিক অনুসরণে বেশ কিছু গান কেবল অসার্থকই হয়নি নাটকের রসকেন্দ্রেও অস্বস্তির কারণ হয়েছে। গিরিশচন্দ্রের

'পাণ্ডব গৌরব' (১৯০০) নাটকে ঘেসেরা-ঘেসেরাণীর মুখের গান এবং মনোমোহন বসুর 'পার্থ পরাজয়' (১৮৮১) নাটকে তুনো চরিত্রের মুখে ব্যবহৃত গানের অসার্থকতার কথা প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করা যায়।

ঐতিহাসিক নাট্যকার এবং পৌরাণিক নাট্যকারের জীবনদর্শন স্বতন্ত্র। ঐতিহাসিক নাটক রাষ্ট্র এবং অর্থনীতির বৃহত্তর সমস্যার উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্রাট এবং নৃপতিদের জীবনের রহস্য উন্মোচন করে। বিপরীতে পৌরাণিক নাটকের মুখ্য লক্ষ্য হল হিন্দুসমাজকে ধর্মপ্রবণতায় মুখরিত করে তোলা।

পুরাণ ও সমাজ : পৌরাণিক নাটক ও সামাজিক নাটক ॥

পুরাণসমূহ সমকালীন সমাজ-দর্পণ। চিরকালের সামাজিক সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে গ্রহণ এবং বিতরণের সাহায্যে এগিয়ে চলাই ভারতীয় জীবনের আদর্শ। মিশর, ব্যবিলন এবং গ্রীসের যে সভ্যতা একদিন সারা বিশ্বের কাছে অপার বিস্ময়ের স্বর্গরচনা করেছিল তার পরিণতি ঘটেছে বিস্মৃতির গর্ভে। ঐ সকল দেশে জনগণের স্মৃতিতে সমাজজীবনের সেই অগ্রগতির পরিচয় আজ আর প্রায় নেই। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার উষা-লগ্নের পরিচয় আধুনিক ভারতীয় সমাজের ধর্ম, সংস্কৃতি এবং সভ্যতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ধর্মপ্রধান দেশ ভারতবর্ষের সভ্যতা, সংস্কৃতি, সমাজ ইত্যাদি সকল কিছুরই ভিত্তি হল ধর্ম। পুরাণগুলিতে ধর্মচর্চার পাশাপাশি সমাজের ইতিহাসের এই চিত্রটি নিপুণভাবে উপস্থাপিত। "সাধারণ পাঠক গল্পের মত পর পর এই পৌরাণিক কাহিনীগুলি পড়ে গেলে কেবল গল্প পড়ার আনন্দ ও পরিতৃপ্তিই যে লাভ করবেন তা নয়, আমাদের প্রাচীন সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি, ভূগোল, পরলোক, প্রাণীতত্ত্ব কৃষিকার্য, পশুপালন, যজ্ঞের ক্রিয়াকর্ম, পূজা-প্রকরণ, বিবাহপ্রথা ইত্যাদি সম্বন্ধেও অনায়াসে জ্ঞানলাভে সমর্থ হবেন।"[১২]

পুরাণ-সাহিত্যে ভারতবর্ষের বিচিত্র জীবনচর্চার বহুমুখী স্রোত নানা আখ্যান এবং উপাখ্যানের আলোকে উদ্ভাসিত। ধর্মে, সমাজে, আচারে, ব্যবহারে বীর ও মহৎ পুরুষদের চরিত্র-রূপায়ণে গ্রন্থগুলি অনবদ্য। সেই

১২. সুধীরচন্দ্র সরকার : পৌরাণিক অভিধান, কলিকাতা, ১৯৫৮, প্রস্তাবনা, পৃঃ ।০।

পুরাণ কাহিনীর মধ্যে কেবল রসপ্রবাহ সৃষ্টিই রচয়িতাদের আদর্শ ছিল না, সমাজজীবনে লোকশিক্ষার ভারও তাঁরা নিয়েছিলেন। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক কাহিনীগুলিও সমকালীন সমাজের স্বার্থে রূপান্তরিত হয়েছে।

ভারতের প্রধান প্রধান পুরাণগুলি প্রাচীন সমাজ-বিপ্লবকে অবলম্বন করেই রচিত। পরে এর পরিবর্তন ঘটে। যেমন রামায়ণের কালে বশিষ্ঠের ধর্মই ছিল রামের মূলধর্ম, রাম যে পথ ধরেছিলেন তাতে দশরথের বিন্দুমাত্র সমর্থন ছিল না। বিশ্বামিত্রের প্রবল আকর্ষণেই রাম অযোধ্যার শান্তপুরী ছেড়েছিলেন। উত্তরকালে সমাজের প্রয়োজনেই এই পৌরাণিক কাহিনীর রূপান্তর ঘটে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' শীর্ষক প্রবন্ধে সুন্দরভাবে লিখেছেন :

"যে সীতাকে রামচন্দ্র সুখে-দুঃখে রক্ষা করিয়াছেন ও প্রাণপণে শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, সমাজের প্রতি কর্তব্যের অনুরোধে তাহাকেও তিনি বিনা অপরাধে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।......রামচরিত্রের মধ্যে যে একটি সমাজবিপ্লবের ইতিহাস ছিল পরবর্তীকালে যথাসম্ভব তাহার চিহ্ন মুছিয়া ফেলিয়া তাহাকে মধ্যকালে সামাজিক আদর্শের অনুগত করা হইয়াছিল।"[১৩]

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের পিছনে পুরাণের উপর সমকালীন সমাজের কিরণসম্পাতের কথাটি সুন্দরভাবে বলা হয়েছে। বাল্মীকি-অনুসারী ভবভূতি, কৃত্তিবাস, চন্দ্রাবতী, মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র প্রমুখ পরবর্তী কালের বিভিন্ন সাহিত্য শাখার লেখকেরাই যে রামায়ণ কাহিনীর মধ্যে নূতন নূতন বিষয় সংযোজন করেছেন তার পিছনে রয়েছে সমকালীন সমাজজীবনের প্রত্যক্ষ প্রভাব। মহাভারত সম্পর্কেও এই মন্তব্য সমভাবে প্রযোজ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক পটভূমিকায় রচিত না হলে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণ চরিত্রে মানব প্রভাব ততখানি পড়ত না। বিংশ শতাব্দীর সমাজপটে রচিত বলেই দ্বিজেন্দ্রলালের 'ভীষ্ম' চরিত্র প্রথাবদ্ধতার পথ থেকে সরে আসতে পেরেছে।

১৩. রবীন্দ্র রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ), ত্রয়োদশ খণ্ড, কলিকাতা. ১৩৬৮, পৃঃ ১৫১

প্রথম যুগে পুরাণের সঙ্গে সমাজজীবনের এই মিতালীর একটি প্রকৃষ্ট কারণ ছিল। বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান এবং পূজা-পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ছিল। তারই প্রতিক্রিয়ারূপে পুরাণ সমাজজীবনে প্রিয়তর হয়েছিল। ধীরে ধীরে নদীমালা এবং তীর্থস্থানগুলি প্রাধান্য পেল। মৎস্যপুরাণে (১১২.১২.১৫) দেখা যায় বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে বৈদিক যাগযজ্ঞ ত্যাগ করে তীর্থ পর্যটনের উপদেশ দিয়েছেন। তাছাড়া আরও দেখা যায় শ্রুতি এবং স্মৃতির পরস্পরবিরোধী বাক্যে তৎকালীন সমাজের মানুষের মনে প্রবল সংশয় জাগে, ধর্মদর্শনের পার্থক্য হেতু বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় গড়ে ওঠে, বৈদিক যজ্ঞধর্মের স্থানে এ কারণেই পুরাণে দেখা দিয়েছে স্বতন্ত্র এক জনসত্ত্ব। পুরাণসমূহ বৈদিক যুগের নিয়ম শিথিল করে সর্বসাধারণের জন্য জ্ঞানের প্রচার শুরু করেছিল। [মৎস্য পুরাণ : (৬৯, ১৭-১৮)]।

পুরাণ প্রথম সমাজজীবনের রূপকার। একটি জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার দুর্মর বাসনা, পরিবেশের সঙ্গে তার অতন্ত্র সংগ্রাম, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বহুতর ক্ষেত্রে তার অনুভূতি, বিরুদ্ধ ধর্মের সঙ্গে সংঘর্ষে তার ন্যায়-জয় ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয় সম্ভব হয় পুরাণের পৃষ্ঠা থেকেই। রবীন্দ্রনাথ 'ভারতবর্ষীয় সমাজ' রচনায় আলোচনা প্রসঙ্গে ঠিকই বলেছেন—"এ কথা আমাদের বুঝিতেই হইবে আমাদের দেশে সমাজ সকলের বড়। অন্য দেশে যেমন নানা বিপ্লবের মধ্যে আত্মরক্ষা করিয়া জয়ী হইয়াছে আমাদের দেশে তদপেক্ষা দীর্ঘকাল সমাজ সকলপ্রকার সঙ্কটের মধ্যে রক্ষা করিয়াছে।" হয়ত এজন্যই পুরাণের পক্ষে সমাজ-প্রভাবকে অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি।

রামায়ণ একং মহাভারত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে মহাকাব্য রূপেই চিহ্নিত। কিন্তু এ দুটি মহাকাব্যকে বাঙালী পুরাণ রূপেই গ্রহণ করেছে। পুরাণসমূহের কথক যেমন লোমহর্ষণ, সূত—মহাভারতের কথকও তেমনই সূত সঞ্জয়। রামায়ণ ও মহাভারতের মূল কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অতীতের আরও অনেকে হারিয়ে যাওয়া নাম না জানা অজস্র নৃপতির কাহিনী। রামায়ণে হিন্দু আদর্শের যথার্থ পরিচয়টি উদ্ভাসিত। সেই জন্যই পদ্মপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, বায়ুপুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ ইত্যাদি কোষ গ্রন্থগুলি রামোপাখ্যানকে গ্রহণ করেছিল। আসলে মহাভারত এবং রামায়ণে আদিম যুগজীবনের প্রচ্ছদপট অঙ্কিত বলেই মহাকাব্য হয়েও গ্রন্থ দুটি পুরাণেরও মর্যাদা লাভ করেছে।

বাঙলাদেশে রামায়ণ এবং মহাভারত পুরাণের মায়াজগৎ সৃষ্টির দায়িত্ব চিরকালই পালন করেছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর তুর্কী বিজয় এবং পরবর্তীকালে পাঠান শাসনের হাত থেকে হিন্দুধর্মের ঐতিহ্য রক্ষা করবার জন্য বাঙালীসমাজ পুরাণ এবং স্মৃতিসংহিতার অনুশীলন শুরু করে। এই পুরাণচর্চা মধ্যযুগের বাঙালী মানুষকে তার গ্রামীণ সমাজের রীতি-নীতির প্রতি অধিকতর আকর্ষণের পথ খুলে দিয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় বাঙালী সমাজের প্রাণশক্তি স্তিমিত হয়ে আসে এবং নানা কুসংস্কার তার দেহকে আশ্রয় করে। সমাজের এই ধর্মীয় স্থবিরতার সুযোগ নিল সাগরপারের পাশ্চাত্ত্য ধর্ম এবং সংস্কৃতি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পুরুষসিংহ রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হিন্দুধর্মের কুসংস্কারের মূলে সঙ্গত কারণে কুঠারাঘাত করেছিলেন। উমেশচন্দ্রের প্রসঙ্গকে (১৮৪৫) কেন্দ্র করে হিন্দুধর্মের মধ্যে যে বিপর্যয় কালমেঘের অন্ধকার নিয়ে নেমে এল সেই ঘটনা সম্পর্কে তত্ত্ববোধিনী লিখেছিল :

> "অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী পর্যন্ত স্বধর্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াও পরধর্মকে অবলম্বন করিতে লাগিল। এই সকল সাংঘাতিক ঘটনাকে প্রত্যহ দেখিয়াও কি আমাদের চৈতন্য হয় না? আর কতকাল আমরা অনুৎসাহ নিদ্রাতে অভিভূত থাকিব। ধর্ম যে এককালীন নষ্ট হইল; এ দেশ যে উচ্ছন্ন হইবার উপক্রম হইল এবং আমাদিগের হিন্দুনাম যে চিরদিনের মত লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা হইল।"[১৪]

এর পর একে একে হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মধর্মের ব্যাপক প্রসারে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র সেনের যৌথ প্রচেষ্টা ইত্যাদি বহু ঘটনার ফলে তৎকালীন সমাজ মুখর। অথচ ব্রাহ্মসমাজ স্থায়ী হল না। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেনের উৎসাহে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে'র প্রতিষ্ঠা হল। ব্রাহ্মসমাজের এই দ্বিধাবিভক্ত রূপ ত্রিধাবিভক্ত হল ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে শিবনাথ ও আনন্দমোহনের উদ্যোগে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠায়।

সারা বাংলাদেশ জুড়ে ধর্ম নিয়ে যখন এই দলাদলি অব্যাহত গতিতে বেগবান তখনই দেখা দিলেন এক গ্রাম্য ব্রাহ্মণ—রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

১৪. তত্ত্ববোধিনী, জ্যৈষ্ঠ, ১৭৬৭ শকাব্দ।

হিন্দুধর্মের বিস্মৃত-গৌরবের পুনরাগমন ঘটল—শুরু হল পুরাণ এবং গীতার পূর্ণোত্তম চর্চা। উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-চৈতন্যের সঙ্গে পুরাণের এই সব আত্মীকরণ এক অভিনব ঘটনা সন্দেহ নেই।

উনবিংশ শতাব্দীর ভিন্নতর সামাজিক পটভূমিকায় পুরাণের নবজন্ম ঘটল। পুরাণগুলি কোনদিনই পরধর্ম-বিদ্বেষী ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীতে এসে পুরাণের এই দৃষ্টিভঙ্গীর আরও উদার ব্যাখ্যা পাওয়া গেল; পৌরাণিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ রামকৃষ্ণদেব তৎকালীন সমাজকে শুনালেন তাঁর উদার বাণী:

> "আন্তরিক হইলে সর্বধর্মের ভিতর দিয়াই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবরাও ঈশ্বরকে পাবে, ব্রহ্মজ্ঞানীরাও পাবে, আবার মুসলমান খ্রীষ্টান এঁরাও পাবে। কেউ কেউ ঝগড়া করে বসে।...এসব বুদ্ধির নাম মতুয়া বুদ্ধি। অর্থাৎ আমার ধর্ম ঠিক আর সকল ধর্ম মিথ্যা। এ বুদ্ধি খারাপ। ঈশ্বরের কাছে নানা পথ ধরে পৌঁছান যায়।"[১৫]

এ থেকেই বোঝা যায় পুরাণের সঙ্গে সর্বকালের সমাজের একটি ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। পুরাণকথার মধ্যে যুগের প্রয়োজনে সমকালীন সমাজ-প্রসঙ্গ আশ্রিত হয়েছে বলেই পুরাণের প্রবহমানতা কখনও রুদ্ধ হয়ে যায় নি।

পুরাণ পরোক্ষে আধিদৈবিক চিন্তনের সাহিত্যিক প্রকাশ। বাস্তবের মানদণ্ডে যা কিছু অলৌকিক, অবিশ্বাস্য এবং স্বাভাবিকভাবেই অচিন্তনীয়, তাকেই পুরাণ আন্তরিকতার সঙ্গে প্রকাশেচ্ছু। একথা ঠিক, ঐশ্বরিক শক্তির অসীম প্রকাশ চলমান বস্তুজগতে কিছুতেই বিশ্বাস্য হতে পারে না। তাই বোধ হয় স্বর্গ এবং মর্ত্যের মধ্যে স্থানিক গুরুত্ব এত বেশী। পুরাণ-রচয়িতারা এই দুই মেরুর মধ্যে মিলন ঘটাতে চাননি সত্য কিন্তু একথাও সত্য তাঁদের কল্পনায় মর্ত্য মানুষের কাছে স্বর্গের ঈশ্বরকে, নানা দেবদেবী এবং ঊর্ধ্ব-জগতের অপরিচিত সৌন্দর্যকে প্রতিফলিত করার ব্যাকুল ইচ্ছা ছিল। পৌরাণিক চরিত্রগুলির সমকক্ষ না হলেও এবং পৌরাণিক রীতি-নীতিকে সর্বাংশে গ্রহণে অপারগ হলেও পরবর্তী কালের মানুষ হয়ত এ জন্যই পৌরাণিক কাহিনী আত্মস্থ পড়েছে, সুযোগ মত ব্যবহারিক জীবনে যেমন পুরাণ-উচ্চারিত আদর্শ কথাকে গ্রহণ করেছে তেমনই সাহিত্যের নানা শাখাতেও পৌরাণিক কাহিনী নিপুণভাবে পুনরুত্থাপিত করেছে।

১৫. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ২য় ভাগ।

পুরাণে পাপের পরাজয় এবং পুণ্যের জয়ের কথা সর্বত্র উচ্চারিত। এর কারণ প্রথমতঃ দেব-নির্ভর কাহিনীতে ঈশ্বরের বিধানই চূড়ান্ত; দ্বিতীয়তঃ পাপের জয় হলে বক্তব্য ট্রাজেডির পথ ধরে চলে—ভারতীয় ক্লাসিকাল সাহিত্যের যা আপাতঃ বিরুদ্ধ লক্ষণ। পাপ এবং পুণ্যের এই ভারসাম্যহীন চেহারাটির পরিচয় রেনেসাঁস-পূর্বকাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। অতঃপর মানবতার উজ্জীবনে যুক্তিতর্কের বিকাশে পাপের নতুন সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হয়। পুরাণের নীতিমূলক চিন্তা আধুনিক মানবতাবাদী ভাবধারার কাছে তার পুরাতন শক্তি ও স্বরূপ নিয়ে বেঁচে থাকতে পারেনি।

বাংলার অধিকাংশ নাট্যকার একই সঙ্গে পৌরাণিক নাটক এবং সামাজিক নাটক লিখেছিলেন, যদিও এই দুই ধারার নাটকের বিষয়বস্তু এবং বক্তব্যে দূরত্ব অপরিসীম। সেজন্যই দেখা যায় যিনি পৌরাণিক নাটক রচনায় সফল তিনি সামা জক নাটক রচনার ক্ষেত্রে সমতুল কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেননি। রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-৮৬) যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন কুলীন কুলসর্বস্ব (১৮৫৪), নবনাটক (১৮৬৬) এবং চক্ষুদান (১৮৬৯) নাটক রচনায়, সেই কৃতিত্ব তিনি রুক্মিণীহরণ (১৮৭১) নাটকে দেখাতে পারেননি। দীনবন্ধু মিত্র নীলদর্পণ (১৮৬০), সধবার একাদশী (১৮৬৬) অথবা জামাইবারিক (১৮৭২) নাটকে সমাজের কথা চিন্তায় মগ্ন ছিলেন বলেই কি একটিও পৌরাণিক নাটক লেখেন নি? গিরিশচন্দ্রের সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি পৌরাণিক নাট্যকার। তাঁর রচিত প্রফুল্ল, (১৮৮৯), বলিদান (১৯০৫), শাস্তি কি শান্তি (১৯০৮) প্রভৃত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল সত্য কিন্তু এই নাটকগুলিতে যে সকল ত্রুটি ঘটেছে তার জন্য যে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক সংস্কার আংশিক দায়ী এমন উক্তি করা চলে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) পাষাণী, ভীষ্ম এবং সীতা রচনা করে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন কিন্তু তাঁর দুটি সামাজিক নাটক 'বঙ্গনারী' এবং 'পরপারে' এককথায় অসফল সৃষ্টি। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭) একাধিক মঞ্চ সফল পৌরাণিক নাটক লিখেছিলেন কিন্তু একটিও সামাজিক নাটক লেখেননি।

প্রায় সর্বদেশে সর্বকালে জনসমাজ পরিচালিত হয় সামাজিক নীতিনিয়ম, এবং সঙ্গতি অসঙ্গতিকে ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত অনুসরণের ব্যাকুল কামনায়। নিজ নিজ সামাজিক প্রথা ও বিশ্বাস জাতির অস্থিমজ্জায়

এমনভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যায় যে; কোন ব্যক্তির পক্ষেই সেই প্রথার পরিধি থেকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত এবং নিরাসক্ত হয়ে বার হয়ে আসা সম্ভব নয়। মধ্য যুগের ধর্মবিশ্বাস যেমন বাঙালী সমাজকে মনেপ্রাণে দৈবনির্ভর হয়ে থাকতে বাধ্য করেছিল অপরদিকে তেমনই উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজেও একটি ব্যাপক ভাঙাগড়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। একদিকে প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি নাড়ীর টান আর একদিকে নবীন জীবনসৃষ্টির বন্ধনহীন উল্লাস—এই দুটি প্রেরণাই পাশাপাশি চলছিল। ইংরাজ জাতির ইতিহাসেও দেখি মধ্যযুগের 'শিভালরি' অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনায় আর পূর্বের মত উদ্দীপ্ত নেশায় গতিবান নয়। সমাজের নতুন ধারাপাত এইরূপে কেবলমাত্র সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রেই নিজেকে নিয়োজিত রাখে না, সাহিত্য ক্ষেত্রেও নতুন সৃষ্টির অঙ্কুর-বিকাশ ঘটায়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পুরাণ চর্চার নবোদ্যমের সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় চলছিল অন্ধ সমাজ-নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে একদিকে সামাজিক ব্যধিগুলির জরাতুর রূপ দেখা দিয়েছিল অন্যদিকে সেই ব্যাধিগুলি থেকে মুক্তি-উন্মাদনাও প্রবল হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর আগে থেকেই কলকাতা বন্দরের আশেপাশে ভাগীরথীর তীরে এক অভিজাত সমাজ শ্রেণী হিসাবে জন্ম নেয়। ব্যবসার প্রয়োজনে মানুষ হয় গ্রাম থেকে শহরাভিমুখী। অর্থনৈতিক জীবনের মধ্যে বিপর্যয় দেখা দেওয়ায় যৌথ পরিবারগুলি ক্রমশঃ ভেঙে পড়তে শুরু করে, পারিবারিক জীবনে অশান্তি ও বিক্ষোভ নিত্যকার ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্কীর্ণতার সুযোগে সমাজে দুর্নীতি এবং অন্যায়ের স্বাভাবিক প্রসার দেখা দেয়। মদ্যপান, নারীহরণ, হত্যা, জুয়াচুরি, জালিয়াতি ইত্যাদি সামাজিক বিকৃতি সমাজে ব্যাপক হয়ে উঠেছিল।

অন্যদিকে এই অন্ধকারের বুকেই অনেকে সূর্যোদয়ের প্রয়াস চালিয়েছিলেন। সমাজের সাধারণ মানুষের অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনার মূক অশ্রুপাতকে তাঁরা উদাসীনভাবে গ্রহণ করে নিতে পারেন নি। এরই ফল সতীদাহ প্রথা রদ, স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন, বিধবাবিবাহ আইন বলবৎ, বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড জনমত গঠন। উনবিংশ

শতাব্দীতে এই নবসমাজ-সংস্কারকে অবলম্বন করে অনেক নাটক লেখা হয়েছিল ঠিক কিন্তু সেগুলির মধ্যে সমাজ-সমস্যার প্রতিফলন এবং তার সমাধানের কথা তেমন সফলভাবে উপস্থিত নয়। তার কারণ সম্ভবতঃ নবজাগরণের প্রভাব সমাজের শিক্ষিত মানুষদের বিপুলভাবে নাড়া দিলেও বৃহত্তর জনসমাজকে তেমনভাবে আকৃষ্ট করতে পারে নি। বাংলা সামাজিক নাট্যকারগণ এক্ষেত্রে যে দায়িত্ব পালন করতে পারতেন তার দিকে যান নি।[১৬] সামাজিক নাটক প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে সমকালীন সমাজের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি বহন করে থাকে। সামাজিক উপন্যাসে হয়ত বা রোমান্সের স্পর্শ কিছু পরিমাণে থাকে (যেমন আছে বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ, রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি এবং শরৎচন্দ্রের বড়দিদি উপন্যাসে) কিন্তু সামাজিক নাটকে রোমান্সের স্থান এত বেশী নয়। ইবসেন (১৮২৮-১৯০৬) বার্ণার্ড শ (১৮ ৬-১৯৫০), প্রমুখ নাট্যকারগণ এই বিষয়টি সম্পর্কে যতখানি সচেতন ছিলেন, বাংলা সামাজিক নাট্যকারগণ সেই পরিমাণে সচেতন ছিলেন না। এর কারণ উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী নাট্যকারের সত্তা থেকে বাংলার বিশিষ্ট জাতীয় ধর্মপ্রবণতা হারিয়ে যায় নি। সেকালের সকল সামাজিক নাট্যকারই সমাজের সমস্যাসমূহ অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছিলেন কিন্তু আধ্যাত্মিক সংস্কার থেকে তাঁরা অনেকেই নিজেদের দূরে রাখতে পারেননি।

এই সূত্রে নাটকে ট্রাজেডির প্রসঙ্গ এসে পড়ে। নাট্যতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে অনেকেই মনে করেন পৌরাণিক নাটকে ট্র্যাজেডি সৃষ্টির সুযোগ যত সীমিত, সামাজিক নাটকে ট্র্যাজেডি সৃষ্টির সুযোগ ততই বিস্তৃত। সেণ্ট এভারমণ্ড কর্ণেই রচিত Polyeucte নাটকের সমালোচনায়, আই. এ. রিচার্ড তাঁর

১৬. "একথা সত্য, বাংলা নাটক রচনার মধ্যযুগে সামাজিক নাটকও রচিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকটিই আদর্শমূলক ছিল, বাস্তব সত্যমূলক ছিল না।

... তাহার ফলে তাঁহাদের (সামাজিক নাট্যকারদের) সামাজিক নাটক বাংলার সমাজ-জীবনের বাস্তব পরিচয় প্রকাশ করিতে পারিত না।"

—আশুতোষ ভট্টাচার্য্য : বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড কলিকাতা, ১৯৬০, পৃঃ ৩১

Principles of Literary criticism (1925) গ্রন্থে, অধ্যাপক কার্ল জেসপারস তাঁর Tragedy is not enough (1953) পুস্তকে এই মন্তব্যই করেছেন। সমাজজীবনে মানুষ সর্বাংশে ধর্মবিশ্বাসী নয় বলেই সামাজিক এবং ঐতিহাসিক নাটকে ট্র্যাজেডি-সাফল্যের পথ প্রশস্ত এবং ভিন্ন কারণেই পৌরাণিক নাটকে সে সুযোগ প্রায়শঃ নেই। আবার এঁদের মন্তব্য (যা প্রায়শঃই অ্যারিস্টটল-অনুসারী) মেনে নিলে যেন কটি গ্রীক ট্র্যাজেডি, সেনেকান ট্র্যাজেডি, সেক্সপীয়রের রোমিও জুলিয়েট, জুলিয়াস সীজার ইত্যাদি নাটক, রাসিন কর্ণেই রচিত নিওক্লাসিক ট্র্যাজেডিগুলি এবং উত্তরকালের নাট্যকার ইবসেন, পিরাণদেল্লো, গলসওয়ার্দি প্রমুখের নাটকগুলিও সর্বাঙ্গ-সুন্দর ট্র্যাজেডি নয়। সুতরাং পৌরাণিক নাটকে ট্র্যাজেডি সৃষ্টির অসুবিধা এবং সামাজিক নাটকে ট্র্যাজেডি সৃষ্টির সুবিধার কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করতে হয়।

প্রথম কথা, পৌরাণিক কাহিনীতে স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে ব্যবধান অত্যন্ত স্বল্প—পরলোক এবং দেবলোকে যাতায়াত অনায়াসসাধ্য। যখন অভিশপ্ত দেবতা বিপর্যয়ে পড়েন তখন আমরা বুঝি এ বিপর্যয় সাময়িক, যখন মানুষের উপর নিয়তির অমোঘ আক্রোশ নেমে আসে তখনও আমরা নিশ্চিত থাকি এই ভেবে যে সেই মানুষটির শোক সাময়িক, কেননা দৈবনির্ভর মানুষ দৈবের করুণা শেষ পর্যন্ত পাবেই এবং দুঃখের হাত থেকেও তার পরিত্রাণ ঘটবে। সাময়িক দুঃখই পরিণতিতে সুখে পৌঁছায় এবং পৌরাণিক নাটককে ট্র্যাজেডির পথ থেকে সরিয়ে আনে। দ্বিতীয় কথা, পৌরাণিক নাটকে পৌরাণিক কাহিনীর মতই দার্শনিক সত্যকে বড় করে দেখান হয়। সেখানে ব্যক্তির মানসিক দ্বন্দ্ব, দুঃখ-দুর্দশা মায়াবাদী কুসংস্কারের চাপে হারিয়ে যায়। স্বভাবতঃই পৌরাণিক নাটকের সূচনায় বিবাদের বীজ রোপিত হলেও নাটকের অন্তিমে তা একটি হর্ষাপ্লুত মহীরুহে পরিণত হয়।

বাংলা সামাজিক নাটকের নায়ক উনবিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ, সামাজিক নাটকের কাহিনী শতাব্দীর জ্বলন্ত সমাজের বুক থেকে চয়িত। পাশ্চাত্ত্যে এই পথ ধরেই নাট্যকারগণ সার্থক ট্র্যাজেডি উপহার দিয়েছেন। কিন্তু বাংলা নাট্যসাহিত্যে প্রভূত ট্র্যাজেডি সৃষ্টি দূরের কথা, সার্থক ট্র্যাজেডিও সংখ্যায় নগণ্য। গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্ল (১৮৮৯), মায়াবসান (১৮৯৮), বলিদান

(১৯০৫), শাস্তি কি শান্তি (১৯০৮); দ্বিজেন্দ্রলালের পরপারে (১৯১২) ও বঙ্গনারী (১৯১৬) এবং রবীন্দ্রনাথের গৃহপ্রবেশকে (১৯২৫) ট্রাজেডির রসাশ্রয়ী বলা হলেও সেগুলির ভিতর যে মাঝে মাঝে রসের বিচ্যুতি ঘটেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

প্রফুল্ল নাটকে যোগেশ চরিত্রে ট্রাজেডির প্রকাশ-সম্ভাবনা যথেষ্টই ছিল, ব্যাঙ্ক ফেলের মর্মান্তিক ঘটনা এবং মদ্যাসক্তির বিষয়টিও সঙ্গত। কিন্তু নাটক যত দৃশ্যের পর দৃশ্যে এগিয়েছে ততই কৃত্রিম ও অবিশ্বাস্য জটিলতাজাল ট্রাজেডির মহিমাকে মেলোড্রামার দিকে এগিয়ে নিয়েছে। রমেশ, কাঙ্গালী এবং জগমণির অস্বাভাবিক কূটকৌশল এবং চক্রান্তের প্রেতভূমিতে যোগেশ নিষ্ক্রিয়, নির্বাক দর্শক মাত্র। উপবাসী পুত্রের হাত মুচড়ে পয়সা নিয়ে যোগেশের মদ খাওয়া, স্ত্রীকে প্রহার, রমেশ কর্তৃক নারী ও শিশুহত্যার চক্রান্ত, রমেশের কুকর্মে কাঙ্গালী ডাক্তার এবং জগমণির অহেতুক সহযোগিতা নাটকটির ট্রাজেডি-রসকে অবশ্যই ক্ষুণ্ণ করেছে। মায়াবসান নাটকের মূলেও পারিবারিক স্বার্থজনিত মামলা মোকদ্দমা, ঋণ-ডিক্রিজারী, উইল ইত্যাদির পরিকল্পনা সবই আছে কিন্তু নাটকটির গভীরে রয়েছে নিষ্কাম ধর্মের প্রচার। বলিদান এবং শাস্তি কি শান্তি নাটকের প্রধান চরিত্র যথাক্রমে করুণাময় ও প্রসন্নকুমারের জীবনে সমস্ত রকমের দুঃখ ও বিপর্যয় নেমে এসে ট্রাজেডির মহিমা সৃষ্টি করেছিল। একজনের মেয়ে আত্মহত্যা করে, কেউ বা হয় চরিত্রহীনা, কেউ লম্পট স্বামীর হাতে হয় নির্যাতিতা। আর এরই মাঝে হঠাৎ খুন, ছুরিকাঘাত, পুলিশ, আইন ইত্যাদির অকস্মাৎ প্লাবন নাটক দুটিকে ট্রাজিক গৌরব থেকে বিচ্যুত করেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের পরপারে নাটকটিতে রোমাঞ্চকর মৃত্যুর শোভাযাত্রা। করুণাময়ীর মৃত্যু, সরযূর শিশুপুত্রের মৃত্যু, সরযূর মৃত্যু নাটকটিকে বাস্তবের জগৎ থেকে এক কল্পলোকে নিয়ে যায়। তাঁর বঙ্গনারী নাটকটি গিরিশচন্দ্রের অন্ধ অনুসরণের ফলে ট্রাজেডি হতে পারেনি।

সুতরাং দেখা গেল ট্রাজেডির রসশক্তি পৌরাণিক নাটকে সঙ্গত কারণেই অপ্রবাহিত। কিন্তু সুযোগ সত্ত্বেও যে বাঙালী নাট্যকাররা সামাজিক নাটকে এই রসের সদ্ব্যবহার করতে পারেননি সেকথা বলতে দ্বিধা নেই। তবে এইটুকু বলা যায় জীবনীশক্তিতে বিশ্বাসের অভাবে বাংলা সাহিত্যে সামাজিক

নাটকগুলি নিখুঁত ট্রাজেডির ছাপ না পেলেও তৎকালীন সমাজজীবনের করুণ দিকগুলি অনেক নাটকেই ভালভাবে ধরা পড়েছে।

দীনবন্ধু মিত্রের নাট্যগুণ আলোচনা প্রসঙ্গে 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন: "বিস্ময়ের বিষয়—বাঙ্গালা সমাজ সম্বন্ধে দীনবন্ধুর বহুদর্শিতা কিন্তু কেবল অভিজ্ঞতায় কিছু হয় না। সহানুভূতি ভিন্ন সৃষ্টি নাই। দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতাই বিস্ময়কর নহে—তাঁহার সহাভূতিও অতিশয় তীব্র।"[১৭]

বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত কৌশলে এই অংশে সামাজিক নাট্যকারের দুটি গুণের দিক তুলে ধরেছেন। পৌরাণিক নাট্যকারের সমাজ অভিজ্ঞতা প্রকাশের কোন সুযোগ নেই তবে কোন চরিত্রের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন কিছু অসম্ভব নয়। যেমন গিরিশচন্দ্রের জনা, রাজকৃষ্ণ রায়ের প্রহ্লাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অহল্যা, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের ধ্রুব, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের কর্ণ চরিত্র নাট্যকারদের সহানুভূতিতে উদ্বেল।

কোন নাট্যশাখাই ভাল নাটকের জন্ম দিতে পারে না যদি না নাটকে দ্বন্দ্ব তীব্র হয়। হেগেলের (১৭৭০-১৮৩২) মতে নাটক হল দ্বন্দ্বময় পরিস্থিতির সমষ্টি।[১৮] দৈব, অতিপ্রাকৃত রহস্যময় শক্তি, প্রাকৃতিক শক্তি, কুসংস্কার ইত্যাদির বিরুদ্ধে নাট্যচরিত্রের সংগ্রামের কথা ব্রুনেতিয়ে (১৮৪৯-১৯০৬) সুন্দরভাবে বলেছেন:

"Drama is the representation of the will of man in conflict with the mysterious powers or natural forces which limit and belittle us, it is one of us thrown upon the stage there to struggle against fatality, against social law, against one of his fellow mortals, against himself if need be, against the interest, the prejudices, the folly, malevolence of those who surround him."[১৯]

১৭. বঙ্গদর্শন, ১২৮৩ সাল

১৮. Hegel, Aesthetics, vol I, page 272

১৯. Brunetiere, Ferdinand, The Law of the Drama, 1894

পূর্বে বলা হয়েছে সপ্তদশ শতাব্দীর নাট্য সমালোচক সেন্ট এভারমণ্ড বলেছিলেন, ট্র্যাজেডি এবং ধর্মদর্শন একই পথে চলতে পারে না। পরবর্তী কালে আই. এ. রিচার্ড এই মতকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু ডি. ডি. র‍্যাফেল মনে করেন যে, ধর্মীয় আবহাওয়ায় কোন কোন ক্ষেত্রে ট্র্যাজেডি রস পরিবেশন করা সম্ভব। আরও একটু অগ্রসর হয়ে নাট্যকার রাসিন বলেছেন যে, নাট্যকার দৈবশক্তির অন্যায় সম্পর্কে সতর্ক হয়ে যদি নিয়তিবাদকে প্রাধান্য দেন তা হলে ধর্মাশ্রয়ী পৌরাণিক কাহিনীকে নিয়েও ভাল ট্র্যাজেডি লেখা যায়। র‍্যাফেল মনে করেন, পৌরাণিক নাটকে দ্বন্দ্ব তখনই ট্র্যাজেডির চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁছুতে পারে যখন—"The side of justice is allowed to win our sympathy with the implication of antipathy to the power opposing us."[২০]

দেখা গেল পৌরাণিক নাটকে দৈবশক্তির চেয়ে যদি মানবশক্তির স্বরূপকে বড় করে দেখান যায় তাহলে পৌরাণিক নাটকে দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্বজনিত ট্র্যাজেডি-সাফল্য সম্ভব। বাংলা পৌরাণিক নাটকে চরিত্রগুলি দ্বন্দ্বের আবর্তে মথিত এবং রক্তাক্ত হলেও শেষ পর্যন্ত সেই দ্বন্দ্ব-সংঘাত স্থায়ী হয় না এবং তার ফলে চরিত্রগুলিও নাটকের প্রথমাংশে যে গৌরব নিয়ে উপস্থিত হয় পরিণতিতে তাকে রক্ষা করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের 'পাষাণী' নাটকটির কথা উল্লেখ করা যায়। এই নাটকের নায়িকা অহল্যা সন্তানের জননী। কিন্তু তার দৃষ্টির সামনেই ইন্দ্র কর্তৃক তার বালকপুত্রের হত্যার বিরুদ্ধে সে রুখে দাঁড়ায় নি। এ এক সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ব্যাপার। সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্বজনিত সংঘাত অবশ্য কাম্য। তার কারণ সামাজিক নাটকের চরিত্র অনেক বেশী জীবন্ত (convincing) এবং রক্তমাংস-জড়িত। কিন্তু রামনারায়ণের কুলীন কুলসর্বস্ব, দীনবন্ধুর নীলদর্পণ, অমৃতলালের তরুবালা, গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্ল, অপরেশচন্দ্রের ছিন্নহার, যোগেশচন্দ্রের নন্দরাণীর সংসার এবং মহামায়ার চর ইত্যাদি নাটকে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং বহির্দ্বন্দ্বের সহজ সুযোগকে নাট্যকাররা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারেননি।

অবশ্য বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকের পর থেকে কি সামাজিক নাটকে,

২০. Raffel, D.D. The paradox of tragedy, 1960, P. 67

কি পৌরাণিক নাটক—উভয় ক্ষেত্রেই দ্বন্দ্বের জটিলতা সৃষ্টির দিকে নাট্যকারগণ দৃষ্টি দিয়েছেন। পৌরাণিক নাটকে এই যুগ অপরাহ্ণের ছায়ায় ম্লান হলেও যে কটি পৌরাণিক নাটক রচিত হয়েছে তাদের ভিতর অন্তর্দ্বন্দ্বের সুরটি তীব্র হয়েছে। মন্মথ রায়ের 'সতী' নাটকের নাট্যসংঘর্ষ এবং 'সাবিত্রী' নাটকে মৃত্যুর সঙ্গে সাবিত্রীর সংগ্রামের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তেমন দ্বন্দ্বমুখর দৃশ্য বাংলা পৌরাণিক নাটকে তেমনভাবে আর ফোটেনি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন (১৯৩৯-৪৫) এবং যুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ সামাজিক নাটক দ্বন্দ্বমুখর সজীবতা লাভ করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর নাট্যকারগণ তৎকালীন সামাজিক অস্থিরতা এবং যন্ত্রণার প্রকৃত চেহারাটি নাটকে তেমনভাবে অঙ্কন করতে পারেননি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ নাট্যকার সমাজের অপমৃত্যুকে সহ্য করেননি বলেই তাঁদের নাটকের চরিত্রগুলি পরিবেশ এবং চরিত্রের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করে গিয়েছে। জীবনের নীচের মহলের ধূমায়িত বিক্ষোভকে তাঁরা বিপুল দ্বন্দ্ব-সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নাটকে সংহত করেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে নীল-বিদ্রোহ, স্বদেশী আন্দোলন, ধর্ম আন্দোলন ইত্যাদি সবকিছুই হয়েছে সত্য কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দেশবিভাগ-জনিত সামাজিক অবক্ষয়ের মত ঘটনা সেদিন ঘটেনি। ফলে বিগত শতাব্দীর নাটকে ধর্মভীরু মানুষ মৃত্যুকে সেদিন স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক এবং পৌরাণিক নাটকের নায়করা প্রায় নিঃসঙ্গ-ভাবে সংগ্রাম করেছে। বিংশ শতাব্দীতে এই চেহারা সম্পূর্ণভাবে পাল্টে গেল। এই শতাব্দীর চল্লিশ এবং পঞ্চাশের দশকে ভূমিহীন মানুষ রেশনিং কালোবাজার ব্ল্যাক আউটের মধ্য দিয়ে গ্রাম থেকে শহরে আসে শুধু দু'মুঠো অন্নের জন্য, ছিন্নমূল উদ্বাস্তু রেলষ্টেশনে লজ্জা বিসর্জন দিয়ে ঘর বাঁধে, মন্বন্তর এবং দুর্ভিক্ষের মধ্য দিয়ে শুরু হয় শবের মিছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর নাট্য-কারগণ পূর্বসূরী ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক নাট্যকারদের মত তাঁদের নাট্য চরিত্রকে আর জীবনবিমুখ ও দৈবনির্ভর করে রাখলেন না, কোন একক নায়ককে দ্বন্দ্ব সংঘাতের মুখে ঠেলে দিলেন না। সামাজিক নাটকে দুটি বিরুদ্ধ শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম শুরু হল। এই যুগ পুরাণের স্মৃতিমন্থনের যুগ নয়, সমাজের প্রতি তীব্র অভিমান এবং সামাজিক অন্যায়ের প্রতি প্রচণ্ড

বিদ্রোহের যুগ। সেকারণে উনবিংশ শতাব্দীতে যেমন পৌরাণিক নাটকের জয়জয়কার সম্ভব হয়েছিল তেমনই বিংশ শতাব্দীর দশ'কটিতে সামাজিক নাটকগুলি তুমুল আলোড়ন তুলেছিল।[২১]

প্রহসন ও পৌরাণিক নাটক ॥

বাংলা ঐতিহাসিক এবং সামাজিক নাটকের সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেও নাট্যসাহিত্যের ধারায় প্রহসনের সঙ্গে পৌরাণিক নাটকের প্রায় কোথাও মিল নেই।

পুরাণের ভাবময় পরিবেশে ধর্মরস সিঞ্চনের জন্য পৌরাণিক নাট্যকার যখন আত্মস্থ হন তখন প্রহসনকার দৃষ্টি মেলেন সমাজের গভীরে, সামাজিক সমস্যার অন্তঃস্থলে। সামাজিক নাটকের সঙ্গে প্রহসনের পার্থ'ক্য সমাজ-দর্শনের প্রশ্নে নয়, সামাজিক সমস্যাকে নাটকের পৃষ্ঠায় উপস্থাপনার ক্ষেত্রে।

সার্থক প্রহসন রচয়িতাকে সব্যসাচীর ভূমিকা পালন করতে হয়। কৌতুক-প্রবণতার সঙ্গে হৃদয়ানুভূতির যথাযথ মিলন যদি ঘটে যায় তাহলে সার্থ'ক প্রহসন সৃষ্টি হবার পথে আর কোন বাধা থাকে না। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে যাত্রায় হাস্যরসের প্রচুর ব্যবহার ছিল ; কিন্তু নারদ, হনুমান, এবং বড়াই চরিত্রের বহু ব্যবহারের সুযোগ না থাকায় সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র সংলাপের উপরই নির্ভ'র করতে হত। কবিগান এবং তর্জা গানে অকারণ গালাগালিতে সাময়িক হাসির ঝলকানিটুকু মাত্র দেখা দিত, রসসৃষ্টি হত না। উনবিংশ শতাব্দীতে এসে হাস্যরস একটি পরিশীলিত রূপের দ্বার খুঁজে পেল। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮), ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯), প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩), কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৭৮৩-১৮৭০) প্রমুখ

২১. গিরিশচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল—'কিরূপে ধর্মশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা রঙ্গভূমি হইতে সাধারণের প্রীতিকর করিয়া নাটকের উন্নতি করিব।' এ শুধু গিরিশচন্দ্রেরই নয়, উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক নাটক রচনার সময় প্রত্যেক নাট্যকারেরই এই উদ্দেশ্য ছিল। গিরিশচন্দ্র 'ধর্ম'াশ্রয়' করে নাটক লিখতে চেয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে ধর্মে'র প্রতি বিশ্বাস কমে আসার ফলে নাট্যকারগণ পৌরাণিক নাট্যরচনার পথ থেকে সরে এসেছিলেন এবং সামাজিক নাটকে 'মর্ম'াশ্রয়'-ই করেছিলেন।

লেখকরা হাস্যরস পরিবেশনে নতুন নতুন রীতি নিয়ে পরীক্ষা চালালেন। মধুসূদনের পথ ধরে এলেন দীনবন্ধু মিত্র (১২৩৬-৮০ বঙ্গাব্দ)। প্রহসন রচনায় ব্রতী হয়েও অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯) সাফল্য লাভ করতে পারেননি। এমন কি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) প্রহসনও চরম সফল হয়নি। এর কারণ যে ভারসাম্য থাকলে সার্থক প্রহসন লেখা যায় সেই হাসি ও অশ্রুর মধ্যে সেতু সৃষ্টির মানসিক ধৈর্য তাঁদের ছিল না। বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০), দীনবন্ধুর সধবার একাদশী (১৮৬৬), দ্বিজেন্দ্রলালের বিরহ (১৮৯৭), এবং রবীন্দ্রনাথের গোড়ায় গলদ (১৮৯২)-এ প্রহসনের বিদ্যুৎচমক লক্ষ্য করা যায়।

প্রহসনের প্রকৃতি বিচার করে বলা হয়েছে 'সমাজপ্রচলিত কোন দোষের সবিস্তার বর্ণন, সেই দোষের জন্য অনিষ্ট; ও তৎপরে তদ্দোষাক্রান্ত ব্যক্তির অনুতাপ ও চরিত্র শোধন প্রভৃতি পরিহাসচ্ছলে বর্ণন করিয়া সেই দোষের প্রতি সমাজের ঘৃণা উৎপাদন করাই বোধ হয়, প্রহসনের মুখ্য উদ্দেশ্য।'[২২] এই অভিমত গ্রহণযোগ্য। এই প্রসঙ্গে বলা যায় প্রহসন যেমন ব্যক্তিচরিত্রের দোষত্রুটি নির্দেশ করে তেমনি পৌরাণিক নাটকেও অ-মর্ত্য চরিত্রে দোষত্রুটির পরিচয় দেওয়া হয়। অবশ্য প্রহসন এবং পৌরাণিক নাটকে পরিণতি একরকম হয় না। তার কারণ পৌরাণিক নাটক ও প্রহসনের রসজগৎ সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইংরেজী এবং ফরাসী সাহিত্যে প্রহসনের প্রধান উপাদান হল চরিত্র। বাংলা সাহিত্যে প্রহসন মূলত: ঘটনামুখ্য, দু'একজন প্রধান রচয়িতা ব্যতীত কেউই ঘটনার সঙ্গে চরিত্রের একত্রীকরণ করতে পারেন না বলে সার্থক প্রহসন বাংলা সাহিত্যে খুবই কম।

পূর্বেই বলা হয়েছে পৌরাণিক নাটক এবং প্রহসনের রস সম্পূর্ণ পৃথক। পৌরাণিক নাটকে নাট্যকার কখনও কখনও নাটকীয় উৎকর্ষ সৃষ্টির জন্য দু'একটি হাস্যরসাত্মক চরিত্র আনয়ন করেন ঠিকই কিন্তু নাটকের পক্ষে সেই চরিত্র কখনই অপরিহার্য নয়। গভীর জীবনকথা অথবা ঘটনা বর্ণনার সময় এই চরিত্রগুলি হয়ত সাময়িক হাসির পাত্র পরিবেশন করে কিন্তু পৌরাণিক নাটকের ভাবরস তার দ্বারা বর্দ্ধিত হয় না।

২২. রামগতি ন্যায়রত্ন : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, কলিকাতা, ১৩৪২, পৃঃ ২৭২

সংস্কৃত সাহিত্যে পুরাণ-কথাশ্রয়ী নাটকগুলিতে কিছু কিছু কৌতুকময় চরিত্র আছে। বাংলা পৌরাণিক নাটকেও এমন চরিত্র বিরল নয়। মনোমোহন বসুর 'পার্থ পরাজয়' নাটকের ঘনো, রনো হয়গ্রীব, লম্বোদর, প্রভৃতি চরিত্রে হাস্যরসের খোরাক আছে। কিন্তু এগুলি নাটকের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়। এর পর আসে গিরিশচন্দ্রের বিদূষক চরিত্রের কথা। সংস্কৃত নাটকের বিদূষক লোভী, ভীরু, কৌতুকময় চরিত্র—অন্যদিকে গিরিশচন্দ্রের নলদময়ন্তী এবং অন্য নাটকের বিদূষক চরিত্রে হাস্যরসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জীবনরস। আবার 'পাণ্ডব গৌরবে' নারদ চরিত্রটি যাত্রার লৌকিক রসিক নারদে পরিণত। অমৃতলালের 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকের রোহিতাশ্ব চরিত্রটি 'ডেঁপোমি'তে পূর্ণ। এই চরিত্র পৌরাণিক নাটকের ভাবরস ক্ষুণ্ণ করেছে। ক্ষীরোদপ্রসাদের ভীষ্ম নাটকের চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে দশরাজ এবং দ্রুপদের আলাপে লঘু হাস্যরসের অবতারণার ফলে চরিত্র দুটির রাজোচিত গাম্ভীর্য নষ্ট হয়েছে।

পৌরাণিক নাটকের এবং প্রহসনের তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় পৌরাণিক নাটকে প্রহসনের হাস্যরস প্রবিষ্ট করালে তার রসহানি ঘটে। এই দুটি নাট্যধারার মধ্যে আদর্শগত মিল না থাকায় রসগত মিলও থাকতে পারে না।

অন্যান্য নাট্যধারার সঙ্গে পৌরাণিক নাটকের যেখানে সবচেয়ে বেশী প্রভেদ তা হলো পৌরাণিক নাটক তত্ত্বমূলক রচনা, লোকশিক্ষামূলক নাট্যকর্ম। এই শ্রেণীর সকল চরিত্রই এক একটি তত্ত্বের প্রকাশক—জীবনরসের চেয়ে ধর্মদর্শনের সঙ্গেই তাদের বেশী সখ্যতা। সামাজিক এবং ঐতিহাসিক নাটকে যদিও তত্ত্বের কথা কখনও কখনও থাকে কিন্তু নাটকগুলির চরিত্রসমূহ তত্ত্বের অঙ্গুলিহেলনে চলাফেরা করে না। সামাজিক এবং ঐতিহাসিক নাটকে ঘটনা এবং চরিত্রের মধ্য থেকে শেষ পর্যন্ত একটি জীবন-তত্ত্ব জেগে ওঠে কিন্তু পৌরাণিক নাটকে ঘটনা ও চরিত্র প্রথম থেকেই তত্ত্বের কাছে নতশির হয়ে যাওয়ায় সেগুলির বিকাশ নিটোল হতে পারে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাংলা নাট্যসাহিত্যের গতিপ্রকৃতি আলোচনা থেকে দেখা যায় পৌরাণিক নাট্যশাখাটি এই ধারাকে যেমন পুষ্ট করেছে তেমনি শাখান্বিত হয়ে অগণিত দর্শককে যুগ যুগ ধরে তৃপ্ত করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আধুনিক আদর্শে মঞ্চোপযোগী নাট্যরচনার জন্য যে সব নাট্যকার অগ্রণী হন তাঁরা বাঙালীর ধর্মবিশ্বাসী হৃদয়টিকে অপূর্ণ রাখতে চাননি বলেই বাংলা নাটকের জন্মক্ষণে পৌরাণিক নাটকের সাক্ষাৎ ঘটেছে। কোন বিশেষ জাতীয় এবং ধর্মীয় পরিস্থিতি এবং প্রেরণায় নাট্যকারদের এ ধরণের নাটক লেখার জন্য কলম ধরতে হয়েছিল সে আলোচনা আগে কিছুটা করা হয়েছে। এখানে বলে নেওয়া ভাল যে, যে দেশীয় ঐতিহ্য বুকে নিয়ে তাঁরা পৌরাণিক নাটক রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন সেই ঐতিহ্যের জোরেই এ ধরণের নাটক সারা ঊনবিংশ শতাব্দী ধরে রচিত হতে থাকে। গত শতাব্দীর শিক্ষিত সমাজ, রঙ্গমঞ্চের পৃষ্ঠপোষকগণ এবং সর্বশ্রেণীর জনতা পৌরাণিক নাট্যকারদের প্রতি সহযোগিতার যে বাহুবিস্তার করেছিলেন তার ভিতর কৃত্রিমতার কোন ছাপ ছিলনা বলেই ঐ শতাব্দীতে পৌরাণিক নাট্যকারের অভাব হয়নি।

গিরিশচন্দ্রকে যদি মধ্যমণি হিসেবে ধরা যায় তাহলে তাঁর আগে এবং পরে কত যে পৌরাণিক নাটক লেখা হয়েছে তা গণনার বাইরে রাখাই ভাল, কেবল তার অজস্রতার কথা ভাবলেই অবাক হতে হয়! কিন্তু সাহিত্যে সচরাচর যেভাবে শ্রেণীবিভাগ করা হয় তেমনভাবে নাট্যকারদের গিরিশ-পূর্ব, গিরিশ-সমকালীন কিংবা গিরিশ-উত্তর যুগে স্থাপন করা ঠিক হবে না। কেননা রামনারায়ণের নাট্যকার রূপে আবির্ভাব গিরিশচন্দ্রের পূর্বে হলেও তাঁর একাধিক পৌরাণিক নাটক গিরিশ-যুগে বসে লেখা। আবার ক্ষীরোদ-প্রসাদ গিরিশচন্দ্রের জীবিতাবস্থায় যেমন পৌরাণিক নাটক লিখেছেন তেমনি তাঁর মৃত্যুর প্রায় এক যুগ পরেও এ শ্রেণীর নাটক লিখেছেন। এই যুগগত পরিবর্তন নাট্যকারের মানসিকতাকে নাড়া দিতে পারেনি। সুতরাং আমাদের মনে হয় বিগত প্রায় পঁচাত্তর বছর ধরে যে সব বাঙালী নাট্যকার

পুরাণ-কথাকে নাট্যান্বিত করে এসেছেন তাঁদের জন্মসাল ধরে ধারাবাহিক আলোচনা করাই অপেক্ষাকৃত গ্রাহ্য পদ্ধতি।

তারাচরণ শীকদার ॥

বাংলা সাহিত্যে প্রথম মৌলিক নাটক তথা পৌরাণিক নাটকের সূত্রপাত করেন তারাচরণ শীকদার। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত তাঁর 'ভদ্রার্জ্জুন' নাটকের কাহিনীটি পুরোপুরি মহাভারতের আদিপর্বে বিন্যস্ত সুভদ্রা-হরণ বৃত্তান্তকে অনুসরণ করে পরিচালিত। কাহিনীর ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য নাটকের আদর্শ স্বীকার প্রসঙ্গে 'বিজ্ঞাপন' অংশে তিনি স্পষ্ট করেই জানিয়েছিলেন—"এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনা-স্থানের নির্ণয় বিষয়ে ইউরোপীয় নাটক প্রায় হইয়াছে, কিন্তু গদ্যপদ্য রচনায় নিয়মের অন্যথা হয় নাই। সংস্কৃত নাটক সম্মত কয়েকজন নাট্যকারকের ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই; ......এই গ্রন্থ ইউরোপীয় নাটকের শৃঙ্খলানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলাম।' এই স্বীকারোক্তি থেকেই বোঝা যায় দেশীয় যাত্রা অথবা সংস্কৃত নাটককে এড়িয়ে গিয়ে পাশ্চাত্ত্য নাট্যরীতিতে আকৃষ্ট তারাচরণ প্রথম বাংলা পৌরাণিক নাটকের এভাবেই সৃষ্টি ঘটালেন।

মহাভারতের অপরাপর আখ্যানের মত অর্জুন-কর্তৃক সুভদ্রা-হরণের আখ্যানটিও চিত্তাকর্ষক। ঘটনার পর ঘটনা যতই এগিয়ে চলে তারাচরণের নাটকের ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টির গতিও ততই দ্রুত হয়। ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের সভায় নারদের উপস্থিতি এবং দ্রৌপদীর সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবের সম্পর্ক নির্ণয়, যুধিষ্ঠির-দ্রৌপদীর বিশ্রাম্ভালাপের সময় অর্জুনের প্রবেশ এবং শাস্তিস্বরূপ বারো বছরের জন্য তীর্থ ভ্রমণের সূচনা, দ্বারকায় বলরাম-কর্তৃক দুর্যোধন ও সুভদ্রার বিবাহের উদ্যোগ এবং সেখানে অর্জুনের উপস্থিতি, রথারূঢ় অর্জুনের রূপের প্রতি সুভদ্রার চিত্তচাঞ্চল্য এবং সত্যভামার নিকট মনো-বাসনার প্রকাশ, সত্যভামার চেষ্টায় অর্জুনের শয়ন-গৃহে সুভদ্রা-অর্জুনের সাক্ষাৎ এবং অর্জুনের সম্মতিতে এবং কৃষ্ণের উপস্থিতিতে উভয়ের সে রাত্রেই গান্ধর্ব-বিবাহ: ইতিমধ্যে নারদের নিকট সংবাদ শুনে বলরামের দুর্যোধনকে দ্রুত বিবাহের জন্য উপস্থিত হতে অনুরোধ, পরদিন প্রভাতে গাত্র-হরিদ্রার পর স্নানের অছিলায় সুভদ্রার নদীতীরে উপস্থিতি এবং অর্জুন-কর্তৃক সুভদ্রাকে হরণ ও পলায়ন—অতঃপর দুর্যোধন, দুঃশাসন এবং বরযাত্রীদের

প্রত্যাগমনে কাহিনীর শেষ। কোথাও কোথাও কাহিনী-বয়নে হয়ত একটু ফাঁক থেকে গিয়েছে, যুদ্ধগুলি হয়ত দৃশ্যায়িত হলে ভাল হত, দূতমুখে ঘটনাপ্রবাহ বর্ণিত না হয়ে সংলাপে প্রকাশিত হলেই ভাল হত; কিন্তু তা সত্ত্বেও এ নাটকের কাহিনী মোটামুটি একটি সুনির্দিষ্ট পথ ধরেই পরিণতির দিকে এগিয়েছে। যে সময়ে বাংলা নাটকের বিন্দুমাত্র আদর্শ ছিল না সেই সময়ে নাট্যকারের এই কৃতিত্ব কম কথা নয়।

নাটকে দ্বন্দ্বই প্রাণ। পাশ্চাত্ত্য নাটকের মূল গৌরব এই দ্বন্দ্ব সৃষ্টির যথাযথ প্রয়োগে। নায়ক অর্জুন চরিত্রে তারাচরণ এই দ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে আরও সফল হতে পারতেন। কাশীদাসের মহাভারতে অর্জুন যদুসৈন্যকে ক্ষত্রোচিত বীর্যে পরাজিত করেছিলেন, কিন্তু নাটকে সেই যুদ্ধ হয়েছে নেপথ্যে। এই একই মন্তব্য সুভদ্রা চরিত্রের আলোচনাতেও প্রযোজ্য। অর্জুনের প্রতি সুভদ্রার প্রেমচেতনার বিকাশটি অন্তর্দ্বন্দ্বে মথিত হলে সুন্দর হত। তার কারণ সত্যভামার সঙ্গে কথোপকথনেই জানা গিয়েছে দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর বিষয়টি সুভদ্রা সমর্থন করেননি। অন্যদিকে অর্জুনের রূপ এবং বীরত্বও তাঁর কাছে উপেক্ষণীয় নয়। কৃষ্ণ চরিত্রটি সরলরেখায় অগ্রসর হলেও বলরাম চরিত্রটি নাট্যকারের সচেতনতা থাকলে আরও উজ্জ্বল হতে পারত। সত্যভামা, ভীম, দুঃশাসন, দেবকী, রোহিনী, দুর্যোধন প্রভৃতি চরিত্রও অবিকশিত। অথচ নিঃসংশয়ে বলা যায় তারাচরণের নাট্যিক প্রতিভা আর একটু সতর্ক থাকলে চরিত্রসৃষ্টিতে এই ত্রুটি ঘটত না।

পরবর্তীকালে বাংলা পৌরাণিক নাটকে যে সঙ্গীত-প্রাধান্য দেখা যায় 'ভদ্রার্জুনে' তা নেই। এর কারণ প্রথমতঃ নাট্যকার পাশ্চাত্ত্য নাটকের আঙ্গিক গ্রহণ করেছিলেন, দ্বিতীয়তঃ তখনও কোন গীতাভিনয় রচিত হয়নি। সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনা অংশ এবং নান্দী, সূত্রধার, নটী ইত্যাদি বাদ যাওয়ায় এ নাটকে গান কম। মাত্র তিনটি গানের প্রথমটি নারদের মুখে এবং আর দুটি একজন মণ্ডপার্শ্বীর মুখে বসান হয়েছে। প্রথম সঙ্গীতটি হরিকীর্তন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় গানও নাটকের কাহিনীর প্রয়োজনে ব্যবহৃত নয়।

পৌরাণিক নাটকের ভাবপরিমণ্ডল নাটকের একাধিক স্থানে লক্ষিত

হয়েছে। ভারতচন্দ্রের প্রভাব নাট্যকার অতিক্রম করে যেতে পারেননি। অর্জুনের রূপদর্শনে উন্মত্তা সুভদ্রাকে সত্যভামা তিরস্কার করেছেন, কিন্তু সুভদ্রার মন মানে না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সত্যভামা বলেন—

আজি রজনীতে ভদ্রে করিব বিহিত।
অবশ্য অর্জুন সহ হবে তোর প্রীত॥

কিন্তু সুভদ্রা অপেক্ষায় অরাজী—

এখনো রজনী সখী বহুক্ষণ আছে।
ইহার মধ্যেতে মম প্রাণ যায় পাছে॥
তখন মিলনে বল কি বা হবে ফল।
কি হবে আহুতি দিলে নিভিলে অনল॥

অতঃপর 'সত্যভামার চরণে ধরিয়া কহিতেছেন'—

বড়ই কাতরে ধরি চরণ তোমার।
কৃপা করি কর যাহে হয় প্রতিকার॥

[তৃতীয় অঙ্ক, ষষ্ঠ সংযোগস্থল]

'ভদ্রার্জুন' নাটকের প্রথম অঙ্কের তিনটি সংযোগস্থলই নাটকের ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন। ইন্দ্রপ্রস্থের অংশটি বাদ দিয়ে দ্বিতীয় অঙ্কে দ্বারকায় যে কাহিনীর সূত্রপাত হয়েছে সেই অংশ থেকেই নাটকের শুরু হওয়া উচিত ছিল। তৃতীয় অঙ্কের পঞ্চম সংযোগস্থলে বাতুল ও মদ্যপায়ীর কথোপকথনেরও বিন্দুমাত্র প্রয়োজন ছিল না।

এই নাটকে পয়ার ত্রিপদীই ব্যবহৃত—একবার মাত্র একাবলী ছন্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সংলাপে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। যেমন,

মদ্যপায়ী। কয় পাত্র,—ওরে শালা অশুদ্ধি—অশুদ্ধি। সেই সকালে আরম্ভ করিয়াছি, আবার অর্জুনকে দেখে আবার খাব। …তুই কি জানবি, তোর বুদ্ধি, আছে, না জ্ঞান আছে।

[তৃতীয় অঙ্ক, পঞ্চম সংযোগস্থল]

অবশ্য মদ্যপায়ীর মুখে ভাষার এই ত্রুটি তেমন শ্রুতিকটু নয়, কিন্তু পৌরাণিক নাটকে এই জাতীয় চরিত্র এবং সংলাপ রসহানিকর। তারাচরণ

যে নূতন যাত্রার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ দূরে যেতে পারেননি এই জাতীয় চরিত্রসৃষ্টি তার প্রমাণ।

সংবাদপত্রের খবর ছিল—"Harkaru states that the original Seminary students intend this year to act a vernacular drama Bhadra Urjoon."[১] কিন্তু নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়ার কোন সংবাদ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

হরচন্দ্র ঘোষ (১৮১৭-৮৪)

তারাচরণ শীকদারের ন্যায় হরচন্দ্র ঘোষেরও ইংরাজী নাটকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ডিরোজিও-র আদর্শে অনুপ্রাণিত হরচন্দ্র কিন্তু তারাচরণের মত তিনি সংস্কৃত নাট্যরীতিকে অস্বীকার না করে নান্দী, সূত্রধার নর্তকী ইত্যাদি এনেছেন। তারাচরণের মত হরচন্দ্রও একটি মাত্র পৌরাণিক নাটক লিখেছেন, 'কৌরব বিয়োগ' (১৮৫৭)। কিন্তু নাট্য বিষয়বস্তু নির্বাচনে তারাচরণ যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন হরচন্দ্র তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পবিশিষ্ট অংশ নিয়ে রচিত এই নাটকে সংঘর্ষের তীব্রতা নেই, চরিত্রসমূহের জটিলতা সেই। 'কৌরব বিয়োগ' নাটকটি 'ভদ্রার্জুনে'র মত উচ্চাঙ্গের নাটক নয়। নাট্যকার মহাভারতীয় কাহিনীর পরিবর্তন সম্পর্কে জানিয়েছেন—'Change which has been carefully introduced in it, brings altogether new, and agreeable to the approved taste of the modern literati of the Country' (Preface)। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি সফল হননি।

নাটকের মূল কাহিনীর শুরু দুর্যোধনের উরুভঙ্গের সংবাদে ধৃতরাষ্ট্রের দুঃখ প্রকাশ ও অশ্রুপাতের মধ্য দিয়ে। পাণ্ডবদের আনন্দোল্লাসের খবর সঞ্জয়ের মুখে শুনে ধৃতরাষ্ট্রের অন্তঃপুরে অশ্বত্থামার হাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং শিখণ্ডীর মৃত্যু—পঞ্চপাণ্ডব-ভ্রমে পাণ্ডবপুত্রদের হত্যা, ভীমের প্রতিজ্ঞা, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর যুদ্ধক্ষেত্রে ভগ্নউরু দুর্যোধনের অন্বেষণ, ধৃতরাষ্ট্রের লৌহ-ভীম চূর্ণকরণ, কুন্তীর সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবের সাক্ষাৎ এবং কর্ণের মৃত্যু সংবাদে তাঁর ক্রন্দন, কুরুনারীদের সহমৃতা হওয়া; পাণ্ডবগণ, শ্রীকৃষ্ণ, কুন্তী এবং দ্রৌপদীর হস্তিনাপুরে আগমন--বিষণ্ণ যুধিষ্ঠিরকে ব্যাসের সান্ত্বনা দান, ভীমের ইচ্ছামৃত্যু

১. Hindu Intelligencer, 5th June, 1853.

গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের সংসার ত্যাগ এবং কুন্তীর অনুগমন, দ্বৈপায়ণে ধৃতরাষ্ট্র কুন্তী, বিদুর ও গান্ধারীকে দেখার জন্য পঞ্চপাণ্ডব ও পুরবধূগণের উপস্থিতি—বিদুরের দেহত্যাগ, কিছুদিন পর কুটীরে অগ্নিসঞ্চার এবং ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে গান্ধারী ও কুন্তীর দগ্ধাবস্থায় মৃত্যু—যুধিষ্ঠিরকে ব্যাসদেব-কর্তৃক সান্ত্বনাদানের মধ্য দিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি।

হরচন্দ্র এই দীর্ঘ কাহিনীকে নাট্যাবদ্ধ করতে গিয়ে বিবৃতির উপর জোর দিতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর পূর্বে তারাচরণ পরে গিরিশচন্দ্র মহাভারত কাহিনীর যে দৃঢ়সংবদ্ধ নাট্যরূপ দিয়েছেন হরচন্দ্র তা পারেননি। মহাভারতের দীর্ঘ কাহিনীর 'Historical tragedy' রূপ দিতে গিয়ে নাট্যকার তত্ত্বপ্রচারের দিকেই ঝুঁকেছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সঞ্জয়, দুর্যোধনের প্রতি কৃষ্ণ, ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্ম এবং যুধিষ্ঠিরের প্রতি ব্যাসদেব যে সকল উক্তি করেছেন তা নাটকের ক্ষেত্রে শোভন নয়। নাটক কখনই নীতিগ্রন্থ হতে পারেনা।

'কৌরব বিয়োগ' নায়ক-নায়িকাহীন নাটক। কুশীলবদের বিকাশ ঘটেনি। ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠির, গান্ধারী, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি চরিত্র নাটকে আগাগোড়া থেকেও প্রায় প্রাণহীন, অবিবর্তিত। পাশ্চাত্ত্য নাটকের চরিত্রসৃষ্টির অপূর্ব সাফল্য নাট্যকারকে প্রভাবিত করতে পারেনি।

তারাচরণের নাটকে পদ্য বেশী, হরচন্দ্রের নাটকে গদ্য বেশী। নাটকের শেষাংশে তারাচরণের মত কিছু পয়ার ছন্দের ব্যবহার দেখা যায়। তাঁর পূর্ববর্তী নাটক 'ভানুমতী চিত্তবিলাস'-এর (Shakespeare-এর Merchant of Venice নাটকের ভাবানুবাদ, ১৮৫২) প্রায় সমগ্র অংশই পদ্য সংলাপে রচিত বলে জনপ্রীতি অর্জন করতে পারেনি, হয়ত এই ধারণা নিয়েই 'কৌরব বিয়োগ' নাটকে তিনি গদ্য সংলাপের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তখন যেমন বাংলা গদ্যরীতি একটি স্থায়ীরূপ লাভ করেনি তেমনি হরচন্দ্রের নিজস্ব কোন ভাষা-প্রতিভা ছিলনা। তাঁর গদ্যে সেজন্যই সরলগতি অথবা রসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়না। পদ্যসংলাপ রচনায় তাঁর দক্ষতা তুলনামূলক বিচারে অনেক ভাল—

গান্ধারী।...... ..শতেক পুত্রের শোকে বিকল শরীর।
তিলেক বিরাম নহে নয়নের নীর॥

বারেক দেখিব চক্ষে বিগত তনয়।
এই বরদাতা হও মুনি মহাশয়॥ (৫/৭)

কিন্তু যেখানে পাঁচালীর রীতিতে তিনি সংলাপকে অগ্রসর করে নিয়েছেন সেখানে নাটকীয় গতি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। যেমন—

সুভদ্রা। নিবেদনে অবধান কর মুনিবর।
[সজল লোচনে ভদ্রা যুড়ি দুই কর।]
দুঃশীলা। প্রফুল্ল কমলমুখী কহে ধীরে ২।
চিকণ হেমাঙ্গ অঙ্গ ভাসে নেত্রনীরে॥
ব্যাসদেব। তথাস্তু বলিয়া আশ্বাসিল সবে ব্যাস।
অদ্য নিশি সকলের পূর্ণ হবে আশ॥

[৫ম অঙ্ক, ৭ম অঙ্ক]

'কৌরব বিয়োগ' নাটকে একটিও গান নেই। সঙ্গীত-প্রীতি যে তাঁর ছিল না তার প্রমাণ একমাত্র 'রজতগিরি নন্দিনী' (১৮৭৪) নাটকের দুটি গান ছাড়া তাঁর আর তিনটি নাটকেই সঙ্গীতের অনুপস্থিতি।

রামনারায়ণ তর্করত্ন॥

রামনারায়ণ তর্করত্নের নাট্যকার হিসাবে অভূতপূর্ব সাফল্য 'কুলীনকুল-সর্বস্ব' নাটক রচনায়। তাঁর সামাজিক নাটক 'নবনাটক' (১৮৬৬) এবং প্রহসন 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' (দ্বিঃ সঃ ১২৭৯), 'উভয় সঙ্কট' (১৮৬৯) এবং 'চক্ষুদান' (১৮৬৯) তৎকালীন দর্শক-সমাজকে খুশী করেছিল। কিন্তু পৌরাণিক নাট্যরচনায় সেই সাফল্য রামনারায়ণের ভাগ্যে ঘটেনি। এর কারণ পৌরাণিক নাট্যকারের যে ভক্তিভাব, পুরাণ-বিশ্বাস ইত্যাদি থাকা দরকার বাস্তব-জীবনের রূপকার রামনারায়ণের মধ্যে সেই গুণ 'রুক্মিণীহরণ' নাটক ব্যতীত অন্যত্র তেমন প্রকাশ পায়নি। দীনবন্ধু এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন বলেই পৌরাণিক নাটক লেখায় হাত দেননি। প্রহসনকার অমৃতলাল যেমন পৌরাণিক নাটক রচনায় ব্যর্থ তেমনই পৌরাণিক নাট্যকার গিরিশচন্দ্রও সামাজিক নাটক রচনায় পূর্ণসাফল্য অর্জন করতে পারেননি। প্রকৃত কথা হল পৌরাণিক নাটকের ভাব অন্যান্য নাট্যশাখার ভাব অপেক্ষা পৃথক। তাই দেখি 'বেণীসংহার'-এর মত পুরাণ-নির্ভর সংস্কৃত নাটকের সফল অনুবাদ

(১৮৫৬) নাটকে রামনারায়ণের পক্ষে সম্ভব হলেও মৌলিক পৌরাণিক নাটক রচনায় তিনি সফল হতে পারেননি।

'রুক্মিণী হরণ' (১৮৭১) রামনারায়ণের প্রথম পৌরাণিক নাটক। এই পঞ্চাঙ্ক নাটকের দৃশ্যসংখ্যা সীমিত, কোন কোন অঙ্কে কেবলমাত্র একটি দৃশ্য আছে। 'হরিবংশে' শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণীর হরণের কাহিনীই এই নাটকের অবলম্বন। বাস্তব জীবনের নাট্যকার রামনারায়ণের কলমে পৌরাণিক চরিত্রগুলি অনেকটা লৌকিক রসে জারিত হয়েছে।

এই নাটকে কৃষ্ণ এবং রুক্মিণী উভয় চরিত্রই প্রেম-সুরভিত। তবে জরাসন্ধের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সংগ্রাম নাট্যকার সুন্দররূপে আঁকতে পারতেন। কোন ভদ্রেতর চরিত্রের উপস্থিতি নাটকটিতে নেই।

'রুক্মিণী হরণে' মোট সাতটি গান আছে। নারদ, রুক্মিণী-সখী লবঙ্গলতা, ধনদাস এবং সখীদলের কণ্ঠে গান দেওয়া হয়েছে। একটি নেপথ্য সঙ্গীতও আছে।

'রুক্মিণী হরণ' অভিনয় অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। পাথুরিয়াঘাটা নাট্য-শালায় এটির প্রথম অভিনয় হয়।

রামনারায়ণের দ্বিতীয় পৌরাণিক নাটক 'কংসবধ' (১৮৭০)-এর কাহিনী শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ এবং মৎস্যপুরাণের অতিপরিচিত কাহিনী নিয়ে রচিত। ভোজবংশীয় রাজা কংস পিতা উগ্রসেনকে জরাসন্ধের সহায়তায় সিংহাসনচ্যুত করেন। এই নাটকের সূত্রপাত কংস কর্তৃক অক্রূরকে বৃন্দাবনে প্রেরণে এবং সমাপ্তি কৃষ্ণ কর্তৃক কংসবধ এবং উগ্রসেনের পুনরায় রাজ্যপ্রাপ্তিতে।

'রুক্মিণী হরণে'র মত 'কংসবধ'-ও নান্দী, সূত্রধার-বর্জিত নাটক। কিন্তু 'কংসবধে'র ভাষা পূর্ববর্তী নাটকের মত সরল নয়। সংলাপ মাঝে মাঝে দীর্ঘ হওয়ায় নাটকের গতি বাধা পেয়েছে। এ জন্যই মঞ্চাভিনয়ে 'কংসবধ' জনসাধারণকে আকৃষ্ট করতে পারেনি।

রামনারায়ণের শেষ পৌরাণিক নাটক 'ধর্মবিজয়' (১৮৭৫) হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। হরিশ্চন্দ্রের অসামান্য ত্যাগের কাহিনী নিয়ে মনোমোহন বসু পূর্বেই নাটক লিখেছিলেন। ১৮৭৪-এর শেষাশেষি সেটি

প্রথম বহুবাজার নাট্যসমাজ দ্বারা অভিনীত হয়। পরের বছরই 'ধর্মবিজয়' রচনার পিছনে এর কোন প্রভাব থাকতে পারে।

গঠনশৈলী, ভাষা, চরিত্রসৃষ্টি ইত্যাদি কোন দিক দিয়েই ধর্মবিজয় পূর্ববর্তী পৌরাণিক নাটকগুলিকে অতিক্রম করতে পারেনি। কংসবধের ন্যায় ধর্মবিজয়ও কখনও অভিনীত হয়নি।

পৌরাণিক নাটকের সংলাপের মধ্য দিয়ে রামনারায়ণ যেন উনবিংশ শতাব্দীর সমাজের ছবিই উপহার দিয়েছেন:

সোনা। তাহলেই কি বাপের কথা শুনতে হয় না? সে কি কথা?
শ্যামা। দিদি, তুইও যেমন, এখনকার কালে ছেলেরা কি বাপের বাধ্য থাকে? এখনকার উপযুক্ত ছেলের কাছে বাপ ছোলার খোসা।
(রুক্মিণীহরণ, ৪/১)

সৌখীন নাট্যমঞ্চের প্রিয় নাট্যকার রামনারায়ণের পৌরাণিক নাটকগুলি বনফুলের ন্যায় অনাদৃত।

মধুসূদন দত্ত ॥

বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন দত্তের সর্বাপেক্ষা বড় পরিচয় তিনি মহাকবি, 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র (১৮৬১) অমর প্রণেতা। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রবেশ এবং প্রস্থান প্রকৃতপক্ষে নাটক রচনার মধ্য দিয়েই। 'শর্মিষ্ঠা'র মধ্য দিয়েই গৌড়জনবাসীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল—বাংলা সাহিত্যের নাট্যকারগণ তাঁর সৃষ্ট প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নাট্যসঙ্গমে দাঁড়িয়ে প্রকৃত নাট্য রচনার পথ খুঁজে পেলেন।

মধুসূদনের ১৮৪৬ সাল থেকে ১৮৫৬ সালের মাদ্রাজ প্রবাস-জীবনে জর্জ নর্টন, ই. বি. পাওয়েল, হেনরী মিরাণ্ড প্রমুখের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এবং Madras circulator and general chronicle, Spectator, Hindu Chronicle পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা নিঃসন্দেহে তাঁর পাশ্চাত্ত্য ভাষাপ্রীতির লক্ষণ। কিন্তু দেশীয় সাহিত্যচর্চাও যে তিনি সেই সময় করছিলেন একটি পত্রে দু'টো থেকে পাঁচটা পর্যন্ত তাঁর নিয়মিত সংস্কৃত চর্চার স্বীকারোক্তি থেকেই বোঝা যায়। 'ক্যাপটিভ লেডি' পড়ে তাঁর প্রতি

বেথুনের উপদেশ দানের পূর্বেই তিনি অকৃত্রিম বন্ধু গৌরদাস বসাককে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : Can't you send me a copy of the Bengali translation of the Mahabharat by Casidoss as well as a ditto of the Ramayana,·· ···Serampore edition. I am losing my Bengali faster than I can mention."

মধুসূদন ভারতীয় পুরাণগুলি পড়েছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, তিলোত্তমাসম্ভব, মেঘনাদবধ, বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা এবং চতুর্দশপদী কবিতাবলীর ছয়, সাত, একত্রিশ, উনপঞ্চাশ, চুয়ান্ন ইত্যাদি আরও অনেক রচনা সম্ভব হয়েছিল। আসলে কাব্য, নাটক এবং সনেটে মধুসূদন পুরাণকেই উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সমুদ্র আকণ্ঠ পান করে তিনি আমাদের যে পুরাণ উপহার দিলেন তার মধ্যে দেশীয় ভাব এবং পাশ্চাত্ত্যের ভাষা একত্র হল।

মাদ্রাজ-প্রত্যাগত মধুসূদন রামনারায়ণের 'রত্নাবলী' নাটক ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করে বিশেষ প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় এই নাটকের সাতবার অভিনয় হয় এবং তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে হেলিডে সাহেব, হিউম সাহেব, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, প্যারীচাঁদ মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামগতি ন্যায়রত্ন প্রমুখের প্রশংসা অর্জন করেন।[২] এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে মধুসূদন মৌলিক নাট্যরচনায় দৃষ্টি ফেরালেন। বন্ধু গৌরদাস বসাকের মাধ্যমে সেকালের নাট্যপ্রিয় ধনী ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের পর শর্মিষ্ঠা রচিত হল এবং ১৮৫৯-এর ৩রা সেপ্টেম্বর বেলগাছিয়া নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হল। ২৭শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে নাটকটির ছ'বার অভিনয় এর জনপ্রিয়তার স্বাক্ষর। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছিলেন :

> মধুসূদন প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের নিয়মবদ্ধ রীতি পরিত্যাগপূর্বক নূতন প্রণালীতে শর্মিষ্ঠা নাটক রচনা করিলেন। তাহা সকলের হৃদয়গ্রাহী হইল। মধুসূদনের প্রতিভার বিমলরশ্মি বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশকে অপূর্বরাগে অনুরঞ্জিত করিল।[৩]

২. সংবাদ প্রভাকর, ৪ঠা আগষ্ট, ১৮৫৮

৩. শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কলিকাতা, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ২২৬—২৭

শিবনাথ শাস্ত্রীর এই অভিমত কিছুটা সত্য হলেও সম্পূর্ণতঃ নয়। কেননা সংস্কৃত নাটকের নিয়মবদ্ধ রীতি হল নাটকের কাহিনী মিলন-মধুর হবে এবং শৃঙ্গাররসের ব্যবহার থাকবে। শর্মিষ্ঠার পরিণতিতে মিলন ঘটেছে এবং যযাতির চরিত্রে শৃঙ্গার-রসাত্মক নাটকের নায়কের আদর্শ প্রকাশিত। মধুসূদন ভরতের নাট্যশাস্ত্রে অভিনয়ের সময় দুরাহ্বান, বধ, যুদ্ধ ইত্যাদি যে সকল বিষয়কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা অত্যন্ত বিশ্বস্তভঙ্গীতে অনুসরণ করেছেন। সংস্কৃত নাটকের অন্যান্য চরিত্রও নানাভাবে শর্মিষ্ঠায় এসে পৌঁছেছে।

সংস্কৃত নাটকে নান্দী, সূত্রধার এবং নটীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মধুসূদন তাঁর নাটকে এই ভূমিকা অস্বীকার করলেও প্রেমের দৃশ্য অঙ্কনে এবং চরিত্র সৃষ্টিতে শর্মিষ্ঠা সংস্কৃত নাট্যানুগ। জয়দেবের গীতগোবিন্দের একটি গান মধুসূদনের নাটকে প্রতিফলিত। জয়দেব লিখেছেন :

বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে।
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে ।।২৮।।

আর শর্মিষ্ঠায় আছে :

উদয় হইল সখী, সরস বসন্ত।
মোদিত দশদিশ পুষ্পগণে
আর বহিছে সমীর সুশান্ত ।।

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন :

> উপসংহারে শুক্রাচার্যের এই আশীর্বাণী 'হে রাজন্, এখন আশীর্বাদ করি যে তোমরা সকলে দীর্ঘজীবী হয়ে এইরূপ পরম সুখে কালযাপন কর'—সংস্কৃত নাটকের ভরতবাক্যের অনুরূপ। শর্মিষ্ঠায় সংস্কৃতের বন্ধন অল্প নয়।[৪]

শর্মিষ্ঠায় এই সংস্কৃত নাটকের অনুসরণই নাটকটির যাবতীয় ত্রুটির জন্য বহুলাংশে দায়ী। মহাভারতীয় কাহিনীর মধ্যে নাট্য-উপাদান যথেষ্টই ছিল। দৈত্যরাজ-কন্যা শর্মিষ্ঠা এবং দৈত্যকুলগুরু-কন্যা দেবযানীর ভিতর

৪. প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৭১, পৃঃ ২১৫

কলহ, শর্মিষ্ঠার দেবযানীর পরিচারিকা হয়ে থাকা, শর্মিষ্ঠার রাজপ্রাসাদ ত্যাগ এবং শুক্রাচার্যের আশ্রমে পরিচারিকা রূপে অবস্থান, যযাতি-দেবযানী-বিবাহ, দুই পুত্র লাভের পর যযাতির শর্মিষ্ঠার প্রতি প্রণয়সঞ্চার এবং উভয়ের গোপন গান্ধর্ব-বিবাহ, দেবযানীর পতিগৃহ ত্যাগ এবং পিতার নিকট আশ্রয় গ্রহণ, শুক্রাচার্যের অভিযোগে জরা ইত্যাদি মহাভারতীয় ঘটনাপর্যায়ের ভিতর যথেষ্ট নাট্যরস লুকিয়েছিল। মধুসূদন সংস্কৃত নাটকের বিবৃতিধর্মী প্রক্রিয়া আশ্রয় করায় অধিকাংশ ঘটনাই অনুষ্ঠিত হয়েছে নেপথ্যে, রঙ্গমঞ্চে দর্শকরা সেই ঘটনাধারা অনুভব করতে চাইলেও তা পাননা। মধুসূদন যদি অসুররাজ বৃষপর্বাকে নাটকে নিয়ে আসতেন এবং যযাতি-শর্মিষ্ঠার প্রণয়-প্রসঙ্গটি মঞ্চে উপস্থিত করতেন তাহলে মহাভারতের কাহিনীর সফল নাট্য-রূপায়ণ হত।

শর্মিষ্ঠা নাটকের উপর পাশ্চাত্ত্য প্রভাব হয়ত সরাসরি পড়েনি কিন্তু পাশ্চাত্ত্য জীবনাদর্শের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তা জগতে যে দুরন্ত তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছিল তার পরিচয় শর্মিষ্ঠায় আছে। মহাভারতে সেই দেবযানীকে আমরা পাই যে শর্মিষ্ঠার গর্ভে যযাতির ঔরসে তিনটি পুত্র হওয়ায় দুঃখ পেতনা যদি তার গর্ভে যযাতির ঔরসে তিনটির বেশী সন্তান জন্ম নিত। তার দুঃখ শর্মিষ্ঠাকে সপত্নীরূপে স্বীকার করার মধ্যে লুকিয়ে নেই। দেবযানীর দুঃখ হল, পাটরাণী হয়ে যে স্বীকৃতি যযাতির কাছ থেকে সে পায়নি, দাসী হয়ে সেই স্বীকৃতি শর্মিষ্ঠা পেয়ে গেল। অপরদিকে মধুসূদন মহাভারতের দেবযানীর মুখ দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর জাগ্রত নারীর মত প্রশ্ন তুলেছেন—

দেবযানী। (গাত্রোত্থান করিয়া) পিতঃ! আমার দুঃখের কথা আর কি বলবো? আপনি যাকে পুরুষোত্তম বিবেচনা করে আমাকে প্রদান করেছিলেন, সে ব্যক্তি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম।

শুক্রাচার্য। কি সর্বনাশ! এ কি কথা?

দেবযানী। তাত! সে দুশ্চারিণী দৈত্যকন্যা শর্মিষ্ঠাকে গান্ধর্ব-বিধানে পরিণয় করে আমার যথেষ্ট অবমাননা করেছে।

শুক্রাচার্য। আঃ! এই নিমিত্ত এত? তাই কেন এতক্ষণ বল নাই?

বৎসে, গান্ধর্ব বিবাহ করা যে ক্ষত্রিয়কুলের কুলরীতি, তা কি তুমি জান না?

দেবযানী। তবে কি আপনার দুহিতা চিরকাল সপত্নী-যন্ত্রণা ভোগ করবে?

(৪র্থ অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক)

পৌরাণিক যুগের নারীর কাছে যে বিষয় ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক, নব-জাগরণের যুগের নারীর কাছে, ইউরোপীয় শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত নাট্যকারের কাছে সেই বিষয়ই বিরাট প্রশ্নের আকার নিয়েছে। মধুসূদন যুগন্ধর কবি, যুগন্ধর নাট্যকারও বটেন। সে জন্যই তাঁর নাটকে আধুনিকতার স্পর্শ রয়েছে।

'পদ্মাবতী' মধুসূদনের দ্বিতীয় নাটক কিন্তু পৌরাণিক নাটক কিনা এ নিয়ে সংশয়ের সুযোগ আছে। পদ্মাবতীর কাহিনী নিয়ে ভারতীয় পুরাণ কোন কাহিনী-সজ্জা করেনি। মধুসূদন যে পদ্মাবতীকে নায়িকা করে নাটক লিখেছেন, সেই পদ্মাবতীর শরীরে পাশ্চাত্ত্য পুরাণের আভরণ আছে এবং মনে আছে প্রাচ্যাদর্শের লাবণ্য। এই দ্বিমুখী আদর্শের সম্পৃক্তিকরণ মধুসূদনের নাটকে ছাড়া আর কোন পৌরাণিক নাট্যকারের রচনায় নেই কেননা একমাত্র তিনিই পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের জলধিমন্থন করে অমৃত আহরণে সমর্থ ছিলেন। আমাদের মনে হয় শর্মিষ্ঠার ন্যায় পৌরাণিক নাট্যরচনাই মধুসূদনের ইচ্ছায় ছিল। অথচ নাটকে অ-ভারতীয় পুরাণের ছায়া অনুসৃত হওয়ায় পদ্মাবতীর পক্ষে পৌরাণিক নাটকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হল না।

পদ্মাবতী নাটকের সমালোচনায় সকল নাট্য সমালোচকই গ্রীক পৌরাণিক আখ্যান 'অ্যাপেল অব্ ডিস্‌কর্ড'-এর নিকট নাটকটির ঋণের প্রসঙ্গ তুলেছেন। গ্রীক পুরাণে আছে যে, গ্রীক দেবতা জিউসের মেয়ে থেটিসের সঙ্গে পেলেউসের বিবাহের প্রাক-মুহূর্তে ঈর্ষাদেবী এরিস বিপদ সৃষ্টির জন্য একটি আপেল পাঠিয়ে দিলেন এবং জানালেন সুন্দরীশ্রেষ্ঠা নারীই সেই আপেলের অধিকারিণী হবেন। সৌন্দর্য বিচারের ভার পড়ল সুন্দরতম পুরুষ প্যারিসের উপর। সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে হেরা, এ্যাথেন, আফ্রোদিতে, প্রত্যেকেই বিচারককে লোভ দেখালেন। হেরা তাঁকে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ করতে চাইলেন, এ্যাথেন করতে চাইলেন যুদ্ধজয়ী আর আফ্রোদিতে প্যারিসের কাম্যনারীকে পত্নীরূপে হাজির করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। প্যারিস

হেলেনকে পত্নীরূপে প্রার্থনা করলেন এবং আপেল তুলে দিলেন আফ্রো-দিতের হাতে। মধুসূদনের নাটকে গ্রীক পুরাণের কাহিনীর এই অংশটুকুর ছায়াপাত ঘটেছে। গ্রীক পুরাণের অন্য অংশে তিনি দৃষ্টি ফেরাননি।

পদ্মাবতী নাটকে প্রথম অঙ্কে স্বল্প পরিসরে মধুসূদন এই কাহিনী অংশটি ধরেছেন। প্যারিস পরিণত হয়েছেন ইন্দ্রনীল চরিত্রে—গ্রীক পুরাণের ত্রয়ী সুন্দরী পদ্মাবতী নাটকে শচী, মুরজা এবং রতি-তে। যে কারণে আফ্রো-দিতের হাতে প্যারিস আপেল তুলে দিয়েছিলেন প্রায় একই কারণে ইন্দ্রনীল রতিদেবীর হাতে অর্পণ করেছেন স্বর্ণপদ্ম।

কিন্তু পদ্মাবতী নাটকের কাহিনী আরও অনেক দূর এগিয়েছে, দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম অঙ্ক পর্যন্ত। এই চারটি অঙ্কে কাহিনীর মূলে উপাদান যুগিয়েছে ভারতীয় পুরাণ এবং লৌকিক কাহিনী। অর্থাৎ পদ্মাবতী নাটকে কাহিনী ও চরিত্রের ক্ষেত্রে গ্রীক পুরাণ, ভারতীয় পুরাণ এবং লৌকিক কাহিনীর ত্রিবেণী সঙ্গম রচিত হয়েছে।

ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধে শচী ও মুরজার চক্রান্তের সূচনা থেকেই নাটকের দ্বিতীয় অংশের শুরু। শচীর প্ররোচনা এবং কলির চক্রান্তে ইন্দ্রনীলের জীবনে নেমে এল সীমাহীন ভাগ্যবিপর্যয়। পদ্মাবতীর জীবনেও ট্রাজেডি কম আসেনি। সে যাই হোক নাটকের পরিণতি অবশ্য মিলনের কুঙ্কুম-রাগেই।

এ কথা সত্য কোন ভারতীয় পুরাণ থেকে মধুসূদন পদ্মাবতীর কাহিনী পাননি, তবে পৌরাণিক নাটকের সর্তগুলিও পদ্মাবতীতে উপেক্ষিত নয়। প্রথমতঃ পৌরাণিক নাটকের মত পদ্মাবতীর পরিণতিও মিলনাত্মক। দ্বিতীয়তঃ পুরাণে নারদের যে ভূমিকা তা মধুসূদনের নাটকে স্বরূপান্বিত। তৃতীয়তঃ পৌরাণিক দেবদেবী, শচী, মুরজা, রতি ইত্যাদি চরিত্র এ নাটকে উপস্থিত। চতুর্থতঃ এই নাটকের অন্যতম চরিত্র কলি মহাভারতে বর্ণিত নলদময়ন্তী এবং শ্রীবৎস-চিন্তা উপাখ্যানের কলি চরিত্রের প্রতিরূপ মাত্র।

বাংলা পৌরাণিক নাটকে একটি অতি ব্যবহৃত চরিত্র হল বিদূষক। মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটকের মত এই নাটকেও বিদূষক আছে। তবে বিদূষক চরিত্রের সাহায্যে হাস্যরস সৃষ্টির আপাতঃ উদ্দেশ্য থাকলেও নাট্যকার তার মধ্য দিয়ে গভীর কথা উচ্চারণ করেছেন। যেমন—

শর্মিষ্ঠা ॥

বিদূষক। বয়স্য। সে যথার্থ বটে; কিন্তু আপনি এ বিষয়ে অধিক চিন্তাকুল হবেন না। রাজমহিষীর কোপাগ্নি শীঘ্রই নির্বাণ হবে। দেখুন, আকাশমণ্ডল কিছু চিরকাল মেঘাচ্ছন্ন থাকে না। প্রবল ঝটিকা কিছু চিরকাল বয় না।

রাজা। সখে, তুমি মহিষীর প্রকৃতি প্রকৃতরূপে অবগত নও। তিনি অত্যন্ত অভিমানিনী।

বিদূষক। বয়স্য। যে স্ত্রী পতিপ্রাণা, সে কি কখনও আপনার প্রিয়তমকে কাতর দেখতে পারে?

(৪র্থ অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক)

পদ্মাবতী ॥

বিদূষক। (স্বগত) আহা! প্রিয় বয়স্যের খেদোক্তি শুনলে বুক ফেটে যায়। হায়রে নিষ্ঠুর বিধি। তোর মনে কি এই ছিল?

(৪র্থ অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক)

পদ্মাবতীতে ভারতীয় পুরাণের নানা কথা ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। এই প্রসঙ্গে ৪র্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে পদ্মাবতীর উক্তি, ৪র্থ অঙ্কের ৩য় গর্ভাঙ্কে ইন্দ্রনীলের উক্তি এবং ৫ম অঙ্কের ২য় গর্ভাঙ্কে নারদের উক্তি মনে আসে। এই উক্তিগুলিতে রামায়ণের চিরদুঃখিনী সীতার প্রসঙ্গ বর্ণিত। পদ্মাবতী প্রকাশের পূর্বেই মধুসূদন 'মেঘনাদবধ' কাব্যরচনা শুরু করেছিলেন। সেই সময়কার কবি-কল্পনার রঞ্জন-রশ্মি স্বাভাবিকভাবে পদ্মাবতী নাটকে প্রতিফলিত।

মধুসূদনই প্রথম বাংলা পৌরাণিক নাটকের যথার্থ ভাবগঠনে সফলকাম হয়েছিলেন। পুরাণের কাহিনীর প্রতি তাঁর ছেলেবেলা থেকেই ঝোঁক ছিল। তিনি লিখেছিলেন—"I love the grand Mythology of ancestors. It is full of poetry."[৫] পুরাণ-প্রিয়তাই মধুসূদনকে তাঁর অধিকাংশ রচনাকে পুরাণাশ্রয়ী করতে উদ্‌বেজিত করে।

নাট্যতত্ত্বের দর্পণে শর্মিষ্ঠা ত্রুটিহীন নাটক নয়—পদ্মাবতী ত' নয়-ই। কিন্তু

৫. রাজনারায়ণ বসুকে লেখা পত্র, ১৫ই জুন, ১৮৬০

দেশ-বিদেশের নাট্যকলার মধ্যে একীকরণের যে দায়িত্ব মধুসূদন নিয়েছিলেন তাতে প্রস্তুতিক্ষণের এই ত্রুটি অবশ্যম্ভাবী। তবে সবচেয়ে বড় কথা হল তাঁর নাটকে দেশীয় প্রভাবকে অতিক্রম করে বিজাতীয় সাহিত্যাদর্শ কখনই প্রধান হয়ে ওঠেনি।

দুর্গাদাস কর ঃ

গিরিশচন্দ্র-পূর্ব বাংলা পৌরাণিক নাটকে পুরাণের মোটামুটি কাহিনী অনুসরণ দেখা গেলেও ভক্তিরসের তেমন প্রকাশ দেখা যায় না। গীতাভিনয় রচয়িতারা এই ভক্তিবাদকে যদিও মুখ্যতঃ অবলম্বন করেছিলেন কিন্তু পৌরাণিক নাট্যকারগণ এই বিষয়ে প্রায় উদাসীন ছিলেন। দুর্গাদাস কর এঁদের মধ্যে ব্যতিক্রম। গিরিশচন্দ্রের পূর্বে একমাত্র তাঁর নাটকেই ভক্তিরসের প্রথম স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায়। আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন: "...পরবর্তী যুগের পৌরাণিক নাটকের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ ভক্তিরসের যে প্লাবন আনিয়াছিলেন ইহার মধ্যে (দুর্গাদাস রচিত 'স্বর্ণশৃঙ্খল নাটক') তাহার প্রথম সূচনা অনুভব করা যায়।"[৬] সুকুমার সেনও এই অভিমত পোষণ করেন।[৭]

দুর্গাদাস রচিত 'স্বর্ণশৃঙ্খল নাটক' মহাভারতের দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের ঘটনাশ্রয়ী। এখানে মোট পাঁচটি অঙ্ক।

'স্বর্ণশৃঙ্খল' নাটকখানিতে প্রথমে নাট্যকারের নাম ছিল না। এ প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন:

> 'নাটকখানিতে গ্রন্থকারের নাম না থাকিলেও, সরকারী ডাক্তাররূপে বরিশালে অবস্থিতিকালে ডাঃ দুর্গাদাস করই ইহা রচনা করেন। বরিশাল হইতে দুর্গাদাসবাবু ঢাকায় বদলি হন। তাঁহার সহকারী বৃন্দাবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬৩ সনের জুলাই মাসে ঢাকায় নাটকখানি মুদ্রিত করেন।'[৮]

৬, আশুতোষ ভট্টাচার্য: বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৯৬০, পৃঃ ২৯২

৭, সুকুমার সেন: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ৬১

৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩৫৩, পৃঃ ৬৯

দ্বিজ তনয়া ॥

'দ্বিজ তনয়া' সম্ভবতঃ প্রকৃত নাম নয়, প্রথম বাঙালী মহিলা নাট্যকার এই ছদ্মনামে তিনটি পৌরাণিক নাটক লেখেন। সেকালে বহু পুরুষ মহিলার ছদ্মনামে গ্রন্থ লিখলেও 'দ্বিজতনয়া' নিঃসন্দেহে মহিলা নাট্যকার। তিনি জৈমিনীয় সংহিতার দণ্ডীপর্ব অনুসরণে লেখেন 'উর্বশী নাটক' (১৮৬৬) এবং বাল্মীকি রামায়ণ অনুসরণে লেখেন 'রামের বনবাস নাটক' (দ্বি-স ১৮৭৭)।

'উর্বশী' চার অঙ্কের নাটক। কৃষ্ণ চরিত্র এ নাটকে তেমন বিকশিত হতে পারেনি। উর্বশী এবং অবন্তীর রাজা দণ্ডীরাজার চরিত্র নাটকে সুবিকশিত।

'রামের বনবাস' নাটকে করুণরস নিবিড় হয়েছে। পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্র প্রমুখ একাধিক নাট্যকার একই বিষয় নিয়ে নাটক লিখেছিলেন। দ্বিজ তনয়ার 'উর্বশী নাটকে'র প্রতিধ্বনি শোনা যায় গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডব গৌরব' নাটকে।

'উর্বশী নাটকে' গান আছে মোট ন'টি। পৌরাণিক নাটকে নারদ প্রায়ই গান গেয়ে থাকেন, এ নাটকেও গেয়েছেন। তারাচরণের 'ভদ্রার্জুন' নাটকের মত এ নাটকেও নারদের গান হরি-কীর্তন। ইন্দ্রের মুখে গান বসিয়ে নাট্যকার ঘটনাপ্রবাহকে এগিয়ে নিয়েছেন। উর্বশীর গান দুটিও সংলাপের পরিবর্তে ব্যবহৃত। দণ্ডী এবং উর্বশীর গানের কাব্যমূল্য কম নয়। উর্বশীর একটী গানের অংশ বিশেষ—

নিতান্ত তব আশ্রিতা, যেন মীন জলাশ্রিতা
চকোরিনী হরষিতা সুধাকর দরশনে।
চাতকিনী ঘন ঘন চাহে যেন নবঘন, তেমতি হে প্রাণধন
সদা ভাবি মনে ।।

দ্বিজ তনয়ার তৃতীয় সৃষ্টির নাম 'উষা নাটক' (১৮৭২)।

মনোমোহন বসু ॥

বাংলা নাট্য সাহিত্যের প্রস্তুতি-পর্বে মনোমোহন বসু একটি চিহ্নিত ব্যক্তিত্ব। মনোমোহনের প্রথম নাটকটি (রামাভিষেক, ১৮৬৭) রচিত হওয়ার পূর্বেই মধুসূদনের অসমাপ্ত নাটক 'মায়াকানন' ব্যতীত আর সমস্ত নাটক বার হয়ে গিয়েছিল। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধুর পঞ্চম নাটক 'লীলাবতী' এবং

মনোমোহনের প্রথম নাটক 'রামাভিষেকে'র প্রকাশ। কিন্তু মধুসূদন এবং দীনবন্ধুর প্রভাব এড়িয়ে গিয়ে মনোমোহন প্রাচীন যাত্রা রীতির অনুসরণে নাটক লিখতে থাকেন। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের ঘটনা বিন্যাসের নৈপুণ্য এবং 'সধবার একাদশী'র সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বময়তা মনোমোহনের নাটকে দুর্লভ। মনোমোহনের উপর পূর্বসূরী নাট্যকারগণের যেটুকু প্রভাব পড়েছে তা বহির্জাত, প্রকৃতপক্ষে তাঁর নাট্যশৈলী যাত্রানুসারী।

যাত্রানুসারী হলেও মনোমোহনের নাটকগুলি একটি স্বতন্ত্র নামকরণের দাবী রাখে। সমকালীন বাঙালী সমাজের রসতৃপ্তির জন্য তিনি নাটকে গানের বহুল প্রয়োগ করেছিলেন। এর ফলে সমকালীন স্বদেশ এবং স্বজাতির প্রতি তাঁর রচনাগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করলেও সেগুলি নাটকের সামগ্রিক সর্ত পালনের পথ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল। এজন্যই নাটক হিসাবে চিহ্নিত না হয়ে সেগুলি গীতাভিনয় রূপেই খ্যাত হল। বাচিক-কলা-কৌশল, সংলাপের ঋজুতা এবং ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের চেয়ে গীতিসুরই প্রাধান্য লাভ করল। মনোমোহনের এই বিশেষ সঙ্গীত-প্রবণ নাট্যরচনা সেকালের নাট্যামোদী জনসাধারণের কাছে শ্রদ্ধার স্থান গ্রহণ করেছিল। কোন পাশ্চাত্ত্য নাট্যকলায় উদ্‌বেজিত হয়ে নয়, সংস্কৃত নাট্যাদর্শ এবং নূতন যাত্রার আদর্শকে সাঙ্গীকরণ করে নিয়ে তিনি নাট্যরচনা করেছিলেন। পুরাণের কাহিনী অবলম্বন করে রচিত মনোমোহনের নাটকগুলির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল এগুলির মধ্যে করুণরসের নিবিড় প্রবাহ। তাঁর 'সতী' নাটক ব্যতীত আর সকল পৌরাণিক নাটকের পরিণতি মিলনান্তক বলেই পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। প্রতিটি নাটকের দৃশ্যের পর দৃশ্য করুণরসের যে মূর্ছনা সৃষ্টি করেছে তাতে পরিণতির মিলন-ইঙ্গিত দর্শককে সুখতৃপ্তি দিতে পারেনা। অবশ্য মনোমোহনের ট্রাজেডিধর্মী পৌরাণিক নাট্যরচনার অভিলাষ যে সমকালীন দর্শকদের রুচির কাছে গৃহীত হয়নি তার প্রমাণ তাঁর পরবর্তী নাটকগুলি।

মোট ১৪টি গ্রন্থের মধ্যে মনোমোহন পৌরাণিক নাটক হিসাবে রামাভিষেক (১৮৬৭), সতী নাটক (১৮৭৩) এবং হরিশ্চন্দ্র নাটক (১৮৭৫) রচনা করেন। পার্থ পরাজয় (১৮৮১) এবং রাসলীলা নাটক (১৮৮৯) প্রকৃতপক্ষে গীতাভিনয়ের নামে যাত্রা।

রামাভিষেক নাটকের বিষয়বস্তু হল রামের বনবাস গমন। নাটকের

পরিণতি ঘটেছে দশরথের মৃত্যুতে। নাটকটিতে বর্ণিত কৈকেয়ী, দশরথ, রাম, কৌশল্যা ইত্যাদি চরিত্রে বিদেশী নাটকের মত অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং বহির্দ্বন্দ্ব আশা করা অনুচিত, কেননা প্রাচীন ভারতীয় জনজীবনে জীবনবোধ ছিল স্বতন্ত্র। কিন্তু উচ্চাঙ্গের নাট্যনৈপুণ্যের অভাব থাকলেও 'রামাভিষেক' নাটকটি নিঃসন্দেহে করুণ রসাত্মক বলা চলে।

মনোমোহনের পৌরাণিক নাটকগুলিতে দেবচরিত্রসমূহ একটি মানবিক স্বরূপ লাভ করেছে। কৃত্তিবাসের অনূদিত কাব্যের মত মনোমোহনের এই পৌরাণিক নাটকেও অযোধ্যা নগরী বাংলাদেশের উদারপটে স্থাপিত হয়েছে। জনশিক্ষা প্রদান, গ্রাম বাংলার ব্রত উদ্‌যাপনের চিত্রবর্ণন এবং বহুবিবাহের কুফল 'রামাভিষেক' নাটকে বর্ণিত হওয়ায় পৌরাণিক ভাবমণ্ডল ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

'রামাভিষেক' পঞ্চাঙ্ক নাটক। কিন্তু অঙ্কগুলি পরিসরে দীর্ঘ নয়। কিন্তু পতন ও মূর্ছা, করাঘাত, বিধাতার নিন্দা ইত্যাদি অংশগুলি দীর্ঘ বিস্তৃত হওয়ায় দুঃখের নিপুণ প্রয়োগ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সম্ভব হয়নি। তৃতীয় অঙ্কে এসেই নাটকের মূল কাহিনী মোটামুটি শেষ হয়েছে। রামের বনগমন স্থির। এর পর অকারণে কাহিনী বিস্তৃত হয়েছে—যা নাটকের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় এবং ক্লান্তিকর।

'রামাভিষেক' প্রথম অভিনীত হয় বউবাজার নাট্যসমাজে। তখন এ নাটকে গান ছিল মোট ৯টি, পরে আর একটি গান যুক্ত হয়।[৯] সূচনায় প্রথমে নট ও নটীর পৃথক পৃথক গান, পরে দ্বৈত সংগীত। এই তিনটি গানে যেমন তেমনি তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে বন্দীদ্বয়ের গানে রামচন্দ্রের গুণ-কীর্তন করা হয়েছে। চতুর্থ অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কে এবং চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে নেপথ্য সংগীতের ব্যবহার করা হয়েছে। প্রচলিত রীতিতে এই নাটকেও সমাপ্তি-সংগীত আছে।

'পার্থ পরাজয় নাটকে' (গীতাভিনয়) গান আছে মোট ২৯টি। মদন,

৯. "এবারে শব্দগত যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্তন ও কোনও বন্ধু বিরচিত একটি গানের অভিনব সন্নিবেশ ভিন্ন আর সমস্তই পূর্ববৎ রহিল।"
—'রামাভিষেক' (তৃতীয় সং, ১২৯৩ সাল); ভূমিকায় নাট্যকারের স্বীকৃতি।

অর্জুন, উলুপী থেকে সুরু করে কুন্তী দেবী পর্যন্ত সকলেই গান গেয়েছেন।

গিরিশচন্দ্র 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকে মনোমোহনের 'সতী' নাট্যকাহিনীর অনুবর্তন ঘটিয়েছেন। অবশ্য মনোমোহনের নাটকে গার্হস্থ্য জীবনরসচিত্র যেমন নিবিড়, গিরিশচন্দ্রে ততখানি নয়।

'সতী নাটকে'র কাহিনী করুণ (Tragic) রসাপ্লুত। মনোমোহন তাঁর 'রামাভিষেক' নাটকের মত এটির পরিণতিও করুণ-অন্তক করেছিলেন। কিন্তু সমকালীন জনরুচি তাঁর উদ্দেশ্যকে কতখানি আঘাত দিয়েছিল তার প্রমাণ দ্বিতীয় বারের 'বিজ্ঞাপন' অংশ। . বিজ্ঞাপনের একাংশে মনোমোহন লিখেছিলেন : 'এবারে একটি অতিরেক অংশ সংযোজিত হইয়াছে। তাহার নাম 'হরপার্বতী মিলন'। ইহা আধুনিক রুচির অনুমোদিত না হইলেও প্রাচীন রুচির বিশেষ অনুরোধে নাটক প্রচারের কিয়দ্দিন পরে রচিত ও অভিনীত হইয়াছিল। বিয়োগান্ত নাটক-প্রিয় মহাশয়েরা সে অংশটি বর্জন এবং পুনর্মিলনানুরাগী মহাশয়েরা গ্রহণ পূর্বক অভিনয় করিতে পারেন।'

[দ্বিতীয় মুদ্রণ]

পৌরাণিক নাটকের শ্রেষ্ঠ অঙ্গীরস ভক্তিকে আশ্রয় করে প্রবাহিত হয়। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকে ভক্তিরসের সর্বাপেক্ষা স্ফুরণ লক্ষণীয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর নিজস্ব জাতীয় জীবনে ভক্তি এবং বিশ্বাসের ঢল নেমে আসে, ধর্মপ্রাণ বাঙালীর উৎসাহে পৌরাণিক নাটকগুলি বাংলা নাট্যশালার গতিপথ পরিবর্তিত করেছিল। সতী নাটকে নারদের সংলাপে, শিব স্তবে এবং হরপার্বতীর যুগল মিলন দৃশ্যে নাট্যকার মনোমোহন ভক্তিরস সৃষ্টি করতে চেয়েছেন।

মনোমোহনের পৌরাণিক নাটকগুলি বিচার করার সময় মনে রাখতে হয় এগুলি আগে গীতাভিনয়, পরে নাটক। গীতাভিনয়ে নাটকের মত স্থান, দৃশ্য এবং কালের বর্ণনা স্বতন্ত্রভাবে না করে দীর্ঘ সংলাপের মধ্য দিয়েই করা হয়। এজন্যই তাঁর নাটকে দীর্ঘ সংলাপ প্রায়ই চোখে পড়ে। 'রামাভিষেক' নাটকে ৩য়, ৪র্থ এবং ৫ম অঙ্কে সংলাপ দীর্ঘ, অনেকটা বক্তৃতাধর্মী। 'সতী নাটকে' সতী চরিত্রের বিকাশ দীর্ঘ সংলাপের জন্যই পদে পদে বাধা পেয়েছে। 'সতী নাটকে'র ভক্তিরস মতিলাল রায়ের (১৮৪৩-১৯১১) গীতাভিনয় রচনার

উপর স্পষ্ট প্রভাব রেখেছে। মতিলালের রচনার মূল সুর ভক্তি। মনোমোহনের সতী বলেছেন :

স্ত্রী লোকের পক্ষে সম্পত্তি আর সজ্জার ধ্যান বিপত্তি আর লজ্জার কারণ, কেবল পতিধ্যানই মঙ্গলের নিদান। তুমিই ত' বলতে, পতি ভিখারী, রাজা, সুরূপ, কুরূপ, সুস্থ ব্যাধিগ্রস্ত যাই হো'ন—তাতেই তন্মন—তাঁরেই পতিসেবা, ভক্তি,—তাঁতেই ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন নারীজাতি যথার্থ সতী নয়,—পরলোকে তার মুক্তি নাই—ইহলোকে ত' সুখের সংসার হবেই না।

[৫ম অংশ]

মতিলাল তাঁর 'শ্রীক্ষেত্র মাহাত্ম্য' গীতাভিনয়ের চঞ্চলা-নির্মলা কাহিনী অংশে সতী নাটকের এই ভক্তিকে প্রতিফলিত করেছেন।

কালিকাপুরাণে বর্ণিত সতী কাহিনী দীর্ঘ। মহামায়াকে কন্যারূপে পাবার জন্য দক্ষ-প্রজাপতির তপস্যা, তাঁর গৃহে মহামায়ার সতীরূপে জন্ম, শিবের সঙ্গে সতীর বিবাহ এবং দক্ষের মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানে অনাহূত সতীর পিতৃমুখে শিবনিন্দা শুনে দেহত্যাগ—মনোমোহনের নাটকে এই অসমাপ্ত কাহিনীই চিত্রিত। অতঃপর, শিবের অনুচরসহ দক্ষপুরীতে উপস্থিতি, দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদ এবং পুনর্জন্মদান; প্রলয়নৃত্য, একান্ন মহাপীঠের জন্ম, সতীর পার্বতীরূপে মেনকার গর্ভে পুনর্জন্ম, মদনভস্ম, পার্বতীর তপস্যা, শিবের ব্রাহ্মণবেশে পার্বতীর কাছে উপস্থিতি এবং শেষে মিলন[১০]—এই দ্বন্দ্বমুখর কাহিনী অংশ মনোমোহন উপেক্ষা করেছেন। নাটকের নামকরণের দিক থেকে তাঁর কাহিনী চয়ন ঠিক হলেও দ্বন্দ্বমুখর নাট্যকাহিনী রচনার সুযোগ তিনি গ্রহণ করেননি।

মনোমোহনের সতী নাটকে গানের সংখ্যা অন্যান্য পৌরাণিক নাটকসমূহের তুলনায় সবচেয়ে বেশী, ১২টি। পূর্ববর্তী নাটক 'রামাভিষেকে' ৯টি গান ছিল; দুটি নটনটীর মুখে, একটি চাষার মুখে একটি বন্দীর মুখে। অপর পাঁচটি নেপথ্য সঙ্গীত। সতী নাটকেও নেপথ্য সঙ্গীত বেশী, প্রস্তাবনা সহ ৮টি। দুটি গান শান্তি পাগলার মুখে এবং ১টি নটীর মুখে ব্যবহৃত। হরিশ্চন্দ্র

১০. 'যাত্রাগানে মতিলাল রায়' গ্রন্থে (১ম সং, পৃঃ ২০৭) হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য অনুমান করেছেন যে সতী নাটকের শেষে যে হরপার্বতীর যুগল মূর্তি প্রদর্শিত হয়েছে তা মতিরায়ের আদর্শে পরিকল্পিত হতে পারে। এই উক্তিটি মনকে নাড়া দেয়।

নাটকে ৫টি গান আছে যার মধ্যে চারটি নেপথ্য গীত এবং একটি মাত্র চরিত্রের মুখে।

নাটকে সঙ্গীতের স্থান যে একটি মুখ্য অংশ গ্রহণ করে নাট্যকার এই মনোভাবে গভীর বিশ্বাস রাখতেন। তাঁর কথায়—'নাটকের অন্যান্য অঙ্গে কল্পনা ও বিচারশক্তি যেমন আবশ্যক, গীতি অংশেও তদপেক্ষা ন্যূন হওয়া উচিত নহে।' সঙ্গীত এজন্যই মনোমোহনের নাটকে একটি মুখ্য অঙ্গরূপে দেখা দিয়েছে। সঙ্গীতের প্রসঙ্গে তাঁর উপর নূতন যাত্রার প্রভাব অবশ্যই কাজ করেছিল।

মানুষের মনের অনেক অব্যক্ত কথার একমাত্র প্রকাশ মাধ্যম হল গান। মনের রুদ্ধদুয়ার উন্মোচনে সঙ্গীত এত সজীব কেননা সুখ এবং দুঃখের দ্বৈত প্রকাশ একমাত্র গানেই সম্ভব। এজন্যই কেবলমাত্র মনোমোহন নয়, মধুসূদন থেকে শুরু করে দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমুখ প্রায় সকল নাট্যকারের পৌরাণিক নাটকেই সঙ্গীতের ব্যবহার আছে। মনোমোহনের ক্ষেত্রে সঙ্গীতের বাহুল্য অবশ্যম্ভাবী, কেননা তিনি যাত্রা এবং নাটকের মাঝামাঝি দাঁড়িয়েছিলেন। এই দুই ধারার রচনাকর্মের গীতরীতিই তিনি একত্রে প্রকাশ করেছেন। সঙ্গীতের প্রয়োজনে তিনি নানা মাধ্যম গ্রহণ করেছেন। কখনও তিনি কোন চরিত্রের মুখে সঙ্গীত বসিয়েই তার সুখ-দুঃখের কথা বলেছেন, আবার কখনও নেপথ্য সঙ্গীতের দ্বারা তা প্রকাশ করেছেন। কোন কোন পৌরাণিক নাটকে তিনি একটি করে সমাপ্তি-গীত বসিয়েছেন, যেমন সতী নাটকে। আবার কখনও কখনও এক বিশেষ Type চরিত্রের মুখে তিনি গান ব্যবহার করেন। এই চরিত্র সংসার সম্পর্কে উদাসীন এবং আত্মভোলা। এক বিশেষ ধরণের Morbidity এই চরিত্রকে অপরের মনের কুঅভিসন্ধি অনায়াসে প্রকাশের সুযোগ করে দেয়।

মনোমোহনের নাটকের বহু সংগীতের মধ্যে শান্তে পাগলার মুখের মাত্র দুটি গানই সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে। যাত্রার মধ্যে মহান্ত, বিবেক, পৌর্ণমাসী, কন্থ ইত্যাদি চরিত্রের মুখের গান শুনে অবতারতত্ত্ব এবং সংসারের মায়াবন্ধনকে অস্বীকার করার সূত্র পাওয়া যায়। মনোমোহনের শান্তে পাগলা যাত্রার ঐ শ্রেণীর চরিত্রেরই প্রতিবিম্বমাত্র নয়, অর্থাৎ সে কেবল দার্শনিক, ভক্ত বা সাধকমাত্র নয়, সে মানবিক ভাব-ভাবনারও প্রকাশক।

এই চরিত্রে মনোমোহন উন্মত্ততা যোগ করায় তার মাধুর্য আরও বেড়েছে, গান দুটির আবেদন অবিশ্বাস্য রূপে নিবিড় হয়েছে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণে হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী আছে। বাংলা সাহিত্যের পৌরাণিক নাট্যকারদের নিকট ধ্রুব এবং প্রহ্লাদ চরিত্রের মত হরিশ্চন্দ্রও একটি অতিপ্রিয় চরিত্র বলেই হরিশ্চন্দ্রের উপর বেশ ক'জন নাট্যকার পৌরাণিক নাটক লিখেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যেও এই কাহিনী নিয়ে 'চণ্ডকৌশিক' নাটক রচিত হয়েছিল। মনোমোহন সহ সকল নাট্যকারই হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী চয়ন করেছেন মার্কণ্ডেয় পুরাণ থেকে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বর্ণিত অপুত্রক হরিশ্চন্দ্রের নরমেধযজ্ঞ করে পুত্রলাভ, হরিশ্চন্দ্রের জল-উদরী রোগে আক্রান্ত হওয়া ইত্যাদি অনেক ঘটনা বাংলা পৌরাণিক নাটকগুলিতে অনুপস্থিত।

হরিশ্চন্দ্র নাটক মনোমোহনের দুর্বলতম পৌরাণিক নাট্যরচনা। অথচ হরিশ্চন্দ্রের ত্যাগী জীবনের বৈচিত্র্যময়তা একটি সুন্দর নাটক উপহার দিতে পারে। দেবচরিত্রের মত অলৌকিক শক্তিধর হরিশ্চন্দ্র নন, ফলে তাঁর চরিত্রে রক্তমাংসের গন্ধ আছে। মনোমোহন অকারণে উনিশের শতকের হিন্দু জাতীয়তার বাণী, পরাধীনতার যন্ত্রণার কথা বারবার উচ্চারণ করায় পৌরাণিক নাটকের বাতাবরণ ছিন্ন হয়ে নাটকটি কালাতিক্রমণ দোষে দুষ্ট হয়েছে।

হরিশ্চন্দ্রের জীবন নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের আগুনে পোড়া মর্মান্তিক ইতিহাস। এমনকি স্বর্গলাভের পরও তিনি স্বর্গচ্যুত হন এবং অনুচরসহ মহাকাশে একটি বায়বীয় স্থানে বাস করতে থাকেন। নাট্যকার নাটকের প্রায় সর্বাংশে এই ট্র্যাজেডির সুর বজায় রেখেও শেষরক্ষা করতে পারেননি, মিলনের সুরে নাটকের যবনিকাপাত। সমকালীন দর্শকরুচি এর জন্য দায়ী হতে পারে, কিন্তু নাট্যকার তাঁর দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেননা।

'পার্থ পরাজয়' নাট্যলক্ষণাক্রান্ত গীতাভিনয়। এ গ্রন্থে গান আছে মোট ২৯টি। মূল নাটকে গানের সংখ্যা বারো, বাকী ১৭টি গান গীতাভিনয়ের জন্য অতিরিক্ত হিসাবে পরিশিষ্টে সংযোজিত।

'পার্থপরাজয়' গ্রন্থের নায়ক মহাভারতের বভ্রুবাহন বীর চরিত্র। এই চরিত্রকে নিয়ে বিংশ শতাব্দীতে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'বভ্রুবাহন' (১৯০০) এবং

সুধীন্দ্রনাথ রাহার বভ্রুবাহন (১৯৩৬) নাটক লেখা হয়েছিল। মনোমোহন নাটকে অর্জুন-বভ্রুবাহনের সংগ্রাম, অর্জুনের পরাজয় ও মৃত্যু এবং পুনর্জন্ম লাভের সবটুকু কাহিনীই বলেছেন। মনোমোহন যদি গ্রন্থটির গীত সংখ্যা সংক্ষিপ্ত করতেন এবং অপ্রাসঙ্গিক কাহিনী অংশ (যেমন পাণ্ডব-সৈন্যদের সঙ্গে ভীষণের সৈন্যদলের যুদ্ধ, ভীষণের তপস্বীর বেশ গ্রহণ এবং অর্জুন-প্রমীলার বিবাহ) গ্রহণ থেকে বিরত থাকতেন তাহলে 'পার্থ পরাজয়'কে সার্থক পৌরাণিক নাটক বলতে বাধা ছিল না। অকারণ হাস্যরসের ব্যবহারও গ্রন্থটিকে লঘু করেছে।

মনোমোহন বসু সাময়িকপত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং হিন্দুমেলার সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতার কথা সুবিদিত। সমকালীন ভারতবাসীর রাজনৈতিক বেদনার দিকটি যেমন তাঁর পৌরাণিক নাটকের একাধিক সঙ্গীতে উচ্চারিত, তেমনি অর্থনৈতিক বিপর্যয়টি প্রস্ফুটিত হয়েছে সংলাপে। রমাভিষেক নাটকে আছে—

দ্বিতীয় চাষা। আর কি বল্লে! ঐ যে পুণ্যে পুণ্যে বলছে রে! রাজার ব্যাটা রামচন্দ'র কাল,—আবার এট্টা পুণ্যে করবে তাই মোদের জানাচ্চে। তা যদি রাজা একবার আবার রাজার ব্যাটা একবার পুণ্য করে, তবেই তো মোরা গ্যালাম। দু জায়গায় খাজনার দে কোন্ চাষার পো চাষা ফসল করি উটতি পারে? মোদের দু'-লায় পা দেওয়া হলো আর কি—এইবারই ভরাডুবি কবে। (১/১)

হরিশ্চন্দ্র নাটকের সংলাপেও সেই একই ছবি—

মন্ত্রী। আনভিজ্ঞ সাধারণ লোকে অত নিগূঢ় তত্ত্ব বোঝে না, সুতরাং কর মাত্রকেই ভয়ঙ্কর আর পীড়াকর জ্ঞান করে। কিন্তু প্রভু ইটি সত্য, যে যদি অমিতব্যয়িতা আর বিদেশীয় কর্মচারী নিয়োগ জন্য অতিরিক্ত ব্যয় না হতো, তবে প্রজাগণকে এত অসম্ভব করভার বহন করতে হতো না। বিশেষতঃ সংগৃহীত কর যদি প্রদেশেই সব ব্যয়িত হতো, তবু এত অসহনীয় হয়ে উঠতো না— (৫/১)

পৌরাণিক নাটকে নাট্যরচনায় সমকালীন রাজনৈতিক বিষয় উপস্থাপনার সুযোগ থাকার কথা নয়, কিন্তু সামাজিক নাটকে সে সুযোগ যথেষ্ট। বিস্ময়ের

কথা পৌরাণিক নাটকে মনোমোহন দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ আনলেও তাঁর সামাজিক নাটকে ('প্রণয়পরীক্ষা' এবং 'আনন্দময়') এই দুটি সমস্যা উপেক্ষিত।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মনোমোহনের 'সতী' নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে পাথুরিয়াঘাটা নাট্যশালার যাত্রা শুরু হয়। পরে নাট্যশালাটির নাম পরিবর্তিত হয়, নতুন নাম বহুবাজার নাট্যরঙ্গালয়। এই মঞ্চে তাঁর সতী নাটক এবং হরিশ্চন্দ্র নাটক অভিনীত হয়েছিল। নাট্যকাররূপে রামনারায়ণ যে উৎসাহ পেয়েছিলেন বিদ্যোৎসাহিনী, বেলগাছিয়া, জোড়াসাঁকো নাট্যমঞ্চ থেকে, মধুসূদন পেয়েছিলেন বেলগাছিয়া নাট্যমঞ্চ থেকে—মনোমোহন সেই উৎসাহ পেয়েছিলেন পাথুরিয়াঘাটা নাট্যমঞ্চ থেকে। এই রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে রামনারায়ণের ঘনিষ্ঠতাও উল্লেখ করার মত।

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ॥

গিরিশ-যুগের অপরাপর নাট্যকারের মত বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ও (১৮৪৩—১৯০১) দীর্ঘকাল রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। মঞ্চাধ্যক্ষ এবং অভিনেতা বিহারীলাল নাট্যকার বিহারীলালের লেখাকে পরিচালিত করতেন। বিহারীলাল বুঝেছিলেন বাঙালী দর্শকের প্রাণকেন্দ্রে গিরিশচন্দ্র যে ভক্তির সৌধ নির্মাণ করেছেন, একমাত্র পৌরাণিক নাটক রচনাই তার পাদপূরণ করতে পারে। স্বল্পসংখ্যক দর্শকের তৃপ্তিদান করতে সামাজিক নাটক, প্রহসন এবং গীতিনাট্য তিনি লিখেছিলেন সত্য কিন্তু তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল সংখ্যাতীত পৌরাণিক নাট্যামোদী দর্শকদের সুখী করা। সংখ্যায় তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলি সর্বাপেক্ষা বেশী হলেও এগুলির শিল্পমূল্য সীমিত। তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে রাবণবধ (১৮৮২), দ্রৌপদী-স্বয়ম্বর (১৮৮৪), রাজসূয় যজ্ঞ (১৮৮৫), প্রভাস মিলন (১৮৮৭), পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ (১৮৮৯), ধ্রুব (১৮৯৫) উল্লেখযোগ্য। পুরাণ-নির্ভর অন্যান্য নাটকের মধ্যে আছে দুর্যোধনবধ, ভীষ্ম মহিমা, ব্যাশকাশী, বাণযুদ্ধ, সীতা-স্বয়ম্বর, পাণ্ডব-নির্বাসন প্রভৃতি।

বিহারীলাল তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলি রচনায় ঈষৎ পূর্ববর্তী এবং সমকালের যাত্রাপালা ও গীতাভিনয় থেকে একদিকে সাহায্য নিয়েছেন অপর-

দিকে একই কাহিনী-আশ্রয়ী পৌরাণিক নাটকেরও অনুসরণ করেছেন। জহরীলাল শীল এবং গিরিশচন্দ্রের অনুকরণে বিহারীলাল লেখেন রাবণবধ নাটক, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের অনুসরণে লেখেন প্রভাস-মিলন নাটক। অতুলকৃষ্ণের আদর্শে রচিত হয়েছিল নন্দবিদায়। বিহারীলালের বাণযুদ্ধ নাটকের উপর অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উষাহরণ নাটকের ছাপ আছে, দুর্যোধনবধ নাটক রচনার সময় তিনি হরচন্দ্র ঘোষের কৌরব বিয়োগ নাটকের প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারেননি। অহল্যাহরণ নাটকটি কিছু স্বাতন্ত্র্য দাবী করতে পারে। ধ্রুব নাটকটিতে কোন নূতনত্ব নেই।

গিরিশচন্দ্রও রঙ্গমঞ্চের তাগিদে অনেকগুলি নাটক লিখেছিলেন কিন্তু বিহারীলালের মত তাঁর নাটক কেবলই দর্শকমুখী নয় বলে একটি স্থায়ী মর্যাদা পেয়েছিল। পৌরাণিক নাট্যকারের অনুভূতি বিহারীলালের চিন্তাকে কখনই শিহরিত করেনি।

বিহারীলালের নিজস্ব কোন ভাবাদর্শ ছিল না। সেই যুগে গৈরিশ ছন্দের প্রবল প্রতাপ। বিহারীলাল গতানুগতিক পয়ার ছন্দ এবং মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুসরণ করেছেন। গদ্য সংলাপে অহেতুক দৈর্ঘ্য এসে যাওয়াও তাঁর নাটকের অন্যতম ত্রুটি।

বিহারীলালের নাটকের একটি আবেদন হল গান। তাঁর পৌরাণিক নাটকে অজস্র গান প্রযুক্ত হয়েছে। অন্যান্য নাট্যকারের মত তাঁর নাটকেও নারদ এবং অপ্সরাদের গান আছে। সমবেত সঙ্গীত গেয়েছে সখীগণ, যোগিনীগণ। নেপথ্য সঙ্গীতের ব্যবহারও তাঁর নাটকে আছে। সর্বাপেক্ষা বেশী গান আছে পরীক্ষিতের অভিশাপ নাটকে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ॥

বাংলা নাট্যসাহিত্যের এবং নাট্যমঞ্চের ভগীরথ মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪—১৯১২) উনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক প্রাণপুরুষ। সুদীর্ঘ একশ' বছরের বাঙালীর নাট্যমানসে যে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার প্রতিটি স্তরে গিরিশ-প্রতিভার অনন্তপ্রভাব নিত্য সঞ্চারিত। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের যুগে জাতির অতীত পুরাণ এবং ইতিহাসপ্রীতির অববাহিকায় যাঁরা প্রাণমন অর্পণ করেছিলেন গিরিশচন্দ্র তাঁদের পুরোধা।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের এবং বিশেষতঃ বাংলা নাট্যমঞ্চের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে যিনি আলোকবার্তা বহন করে এনেছিলেন সেই গিরিশচন্দ্রের জীবনই একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক।

গিরিশচন্দ্র আশীটির কাছাকাছি নাটক লিখেছিলেন। ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং পঞ্চরঙ্গ জাতীয় নাটক গিরিশচন্দ্র কম লেখেননি। তাঁর 'সিরাজদ্দৌলা' এবং 'প্রফুল্ল' ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও আজও নাট্যরসপিপাসুদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় নাটক। কিন্তু এ সত্ত্বেও গিরিশ-প্রতিভার সৃজনীশক্তির মুর্ত বিকাশ ঘটেছে পৌরাণিক নাট্যরচনাতেই। মাইকেল এবং নবীনচন্দ্রের কাব্যে বাঙালীর পুরাণ উনিশ শতকীয় রূপ পেয়েছিল আর গিরিশচন্দ্রের কলমে বাল্মীকি, ব্যাসদেব পুনরায় দেখা দিয়েছিলেন। কাব্যের ক্ষেত্রে পৌরাণিক চরিত্রের যে বিবর্তন দেখা দিয়েছিল তা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের পরোক্ষ ফল। কিন্তু গিরিশচন্দ্র প্রাচ্যাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। পৌরাণিক নাটক রচনায় তাঁর গভীর আগ্রহ জাতীয় ঐতিহ্যেরই অনুসারী—

"জাতীয় বৃত্তি পরিচালিত ব্যতীত কবিতা বা নাটক জাতীয় হিসাবে হিতকর হয় না। ভারতবর্ষের জাতীয়তার মর্মে ধর্ম। দেশহিতৈষণা প্রভৃতি যতপ্রকার কথা আছে তাহাতে কেহ ভারতের মর্ম স্পর্শ করিতে পারিবে না। ভারত ধর্মপ্রাণ। যাহারা লাঙ্গল ধরিয়া চৈত্রের রৌদ্রে হাল সঞ্চালন করিতেছে তাহারাও কৃষ্ণনামে আকৃষ্ট। যদি নাটকের সার্বজনিক হওয়া প্রয়োজন হয়, তবে কৃষ্ণনামেই হইবে।.. হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম। মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে। এই মর্মাশ্রিত ধর্ম বিদেশীর ভীষণ তরবারি ধারে উচ্ছেদ হয় নাই।"[১১]

পুরাণের প্রতি গিরিশচন্দ্রের এই প্রীতি কোন হঠাৎ মানস-জাগরণের ফলশ্রুতি নয়। শৈশবে রামায়ণ-মহাভারত পাঠ শুনে, কথকতা ও বাংলা যাত্রা দেখে তাঁর মনে পুরাণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জাগতে থাকে। ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য মনোমোহন বসুর তিনটি পৌরাণিক নাটক তাঁর প্রেরণাভূমি ছিল। তাঁর সমসাময়িক নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায়ের (১৮৪৯—৯৪) পৌরাণিক নাটক-গুলিও পাশাপাশি রচিত হচ্ছিল। এক বছরের মধ্যে (শ্রাবণ ১২৮৮ থেকে

১১. গিরিশচন্দ্র রচিত 'পৌরাণিক নাটক' প্রবন্ধ, রঙ্গালয় পত্রিকা, ৩০শে চৈত্র, ১৩০৭ ॥

শ্রাবণ ১২৮৭) গিরিশচন্দ্র রামকথাশ্রয়ী সাতটি পৌরাণিক নাটক রচনা করেন। এরপর রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পৌরাণিক নাট্যরচনার উৎসাহের অঙ্কুরে বারিসিঞ্চন করল।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের (১৮৩৬-৮৬) সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের প্রথম পরিচয়ের (১৮৮৪) কালে গিরিশচন্দ্রের বয়স চল্লিশ। যৌবনের তরুণ কালাপাহাড়ী মনোভাব তখনও তাঁর মনে জাগরুক। কিন্তু ১৮৮৪-র পর লেখা তাঁর নাটকগুলিতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও আদর্শকথা উচ্চারিত। ১৮৭৮ সালে তিনি তারকনাথের ভক্ত হন এবং শিবপূজা শুরু করেন—তারকেশ্বর যাত্রা এবং হবিষ্যান্ন ভোজন এরই অঙ্গ। তখন তিনি প্রায়ই কালীঘাটে যেতেন। পরের বছর কর্ণেল অলকট (**Henry Steel Olcott,** ১৮৩২—১৯০৭) এবং মাদাম ব্লাভাটস্‌কি (**Helem Petrovan Hahn-Hahn Blavatsky** ১৮২১-৯১) ভারতে এসে থিয়সফিসট আন্দোলনের প্রবর্তন করেন। অলকট গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এর কারণ গিরিশচন্দ্রের নাটকে রামকৃষ্ণের হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের প্রভাব কাজ করেছিল। গিরিশচন্দ্র নিজেই লিখেছেন—

> আমার মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে গুরুর কৃপা আমার কোন গুণ নহে। অহেতুকী কৃপাসিন্ধুর অপার কৃপা, পতিতপাবনের অপার দয়া—সেই জন্য আমায় আশ্রয় দিয়াছেন। আমি পতিত, কিন্তু ভগবানের অপার করুণা, আমার কোন চিন্তার কারণ নাই। জয় রামকৃষ্ণ।
>
> [ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব]

১৮৭৭ সাল থেকে ১৯১১ সালের পরিক্রমায় গিরিশচন্দ্র বাংলা নাটকের সঙ্গে লোকজীবনের সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। অসাধারণ সৃজনী প্রতিভার অধিকারী গিরিশচন্দ্র সব্যসাচীর ন্যায় অসংখ্য চরিত্রসৃষ্টি, অবিশ্বাস্য বিষয় বৈচিত্র্য এবং অসামান্য অভিনয় কুশলতায় বাংলা নাটকে বিদ্যুৎগতি সঞ্চারিত করেন। (একদিকে সেক্সপীয়রীয় সাহিত্যের জ্ঞান-অধ্যয়ন অপরদিকে প্রাচ্যসাহিত্য তথা রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি পুরাণের ঐতিহ্যাশ্রয়ী সাহিত্যের জ্ঞান আহরণ করে গিরিশচন্দ্র নাটক রচনা শুরু করেন। জাতীয় জীবন এবং সংস্কৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যের এই সমন্বয়ীকরণের ফলেই তাঁর নাট্যপ্রতিভাকে সেক্সপীয়রের সঙ্গে এবং অভিনয়-প্রতিভাকে

গ্যারিকের সঙ্গে তুলনা করা হয়।) গিরিশচন্দ্রের হাতে বাংলা নাটক হয়ত সেক্সপীয়র রচিত ইংরেজী নাটকের মত দীর্ঘ সাফল্য লাভ করতে পারেনি কিন্তু নাটককে তিনি জাতীয় জীবন এবং সংস্কৃতির সঙ্গে যেরূপে সম্পৃক্ত করে দিয়েছিলেন অন্য কোন নাট্যকারের পক্ষে সেই কৃতিত্ব লাভ সম্ভব হয়নি। এই ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র একক, অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট। এই প্রসঙ্গে নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসকার ঠিকই বলেছেন—

…'গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকে বাঙ্গালার প্রাণরসের সহজ স্পন্দন লাভ করিতে পারা যায়। বাংলার পুরাণ বাঙ্গালীর নিজস্ব সৃষ্টি, ইহার সঙ্গে সংস্কৃত পুরাণের প্রাণের যোগ নাই, বাঙ্গালী তাহার নিজস্ব সুখ-দুঃখানুভূতি দ্বারা তাহার পুরাণ চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে; গিরিশচন্দ্রও এই সংস্কৃতির ধারাই তাঁহার নাটকের মধ্যে অনুসরণ করিয়াছেন, কোন পাণ্ডিত্যের প্রেরণায় ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া গিয়া ইহাদের সুদূর উৎস সন্ধান করিতে যান নাই।'[১২]

পৌরাণিক নাটকের পূর্বেই বাংলা সাহিত্যে ভক্তিবাদের জাগরণ ঘটেছিল। যোড়শ শতাব্দীতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মধ্য দিয়ে এই ভক্তিবাদ যে রূপ পরিগ্রহ করে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কথকতা, যাত্রা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তার বিকাশ সম্ভব হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই প্রচলিত ভক্তিবাদের মূলে নূতন তরঙ্গ সঞ্চারিত হয়। গীতাভিনয় রচয়িতারা পূর্ববর্তী যাত্রা রচয়িতাদের রুচিবিকৃতির পথ পরিত্যাগ করেছিলেন বলেই এই ভক্তি একটি শিষ্ট রূপ পাচ্ছিল। গিরিশচন্দ্র ভক্তিবাদের নবজাগরণের যুগে সুদূর মধ্যযুগের ভক্তিবিহ্বলতাকেই নতুন করে বর্ণনা করলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের ক্ষুরধার বুদ্ধিবাদ এবং বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রচারের যুগে হৃদয়াসক্ত অহৈতুক ভক্তিবাদের প্রচার একটি কঠিন বিষয়। কিন্তু গিরিশচন্দ্র দেখেছিলেন এই জড়বাদী সভ্যতার যুগেও অনেক ব্যক্তির ইচ্ছায় পুনরায় রাম-কথা এবং ভারত-কথার চর্চা। বাঙালীর এই অনির্বাণ ভক্তিপ্রবণতাকেই তিনি স্থাপিত করলেন পৌরাণিক নাটকে।

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলির মূলকথা হল অকৃত্রিম বিশ্বাস। তিনি

---

১২. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৯৬০, পৃ—৩৪৬

বুঝেছিলেন এই হৃদয়োৎসারিত বিশ্বাসই বাঙালীর শাশ্বত সংস্কার, চিরজীব মন্ত্র। মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের সাধু-সন্তদের আবির্ভাব এবং মতাদর্শ প্রচারও এই অপার বিশ্বাসকে জড়িয়েই। যুক্তি, তর্ক, বিচার-বিবেচনার চোরাবালিতে এই দেববিশ্বাস কখনও ক্ষুণ্ণ হয়নি। রামায়ণ-মহাভারত-আশ্রয়ী নাটক ছাড়াও তাঁর চৈতন্যলীলা, নিমাই সন্ন্যাস, রূপ সনাতন, বুদ্ধদেবচরিত, বিল্বমঙ্গল ইত্যাদি ধর্মাশ্রয়ী নাটকেও এই বিশ্বাসই মুল কথা। 'নসীরাম' 'বিষাদ' এবং 'পূর্ণচন্দ্র' গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাট্যকর্ম নয়, কিন্তু এই নাটকগুলিতেও তিনি চিরন্তন ভগবৎপ্রেমের মর্মবাণী প্রচার করেছেন। এই ভক্তিবাদ প্রচারের সুযোগ ছিল না বলেই তাঁর সামাজিক নাটকগুলি জনপ্রিয় হলেও সার্থক নাটকের মর্যাদা পায়নি। নাট্যকার নিজেও বুঝেছিলেন তাঁর সংস্কার ছিল পৌরাণিক নাটক রচনায়। তাই ১৯০৬-এ লেখা 'বলিদান' নাটক মিনার্ভায় প্রভূত প্রশংসালাভ করলেও তিনি অমৃতলাল বসুকে বলেছিলেন—

"এসব নাটক আমার লেখার কথা নয়। মনে করেছিলাম শেষ বয়সে দু' চারখানা ভাল নাটক লিখে রেখে যাব, তা' বুড়ো বয়সেও এই নদ´মা ঘাঁটতে হচ্ছে। এ সব realistic বিষয় নিয়ে নাটক লেখা আর নদ´মা ঘাঁটা এক।"

গিরিশচন্দ্র যখন পৌরাণিক নাটক রচনায় হাত দেন তখন গীতাভিনয় অসংখ্য রচিত হচ্ছিল কিন্তু তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলির উপর যাত্রা অথবা গীতাভিনয়ের প্রভাব পড়ে নি। মধ্যযুগীয় অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য নাটকের বাস্তব জীবনাদর্শ বিমিশ্রিত হয়ে তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলির জন্ম। তৎকালে নাগরিক জীবনে যাত্রার মধ্যে একটি রস রুচি দানা বাঁধতে থাকে। 'এই ধারাটির প্রতি গিরিশচন্দ্র প্রথম হইতেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং বাহির হইতে ইহাই অবলম্বন করিয়া তাঁহার সাধনার সূত্রপাত হয়।'[১৩]

যাত্রার সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের এই বহিরঙ্গ মিল চোখে পড়ে দ্বন্দ্ব-প্রসঙ্গ আলোচনায়। প্রথমতঃ যাত্রার চরিত্রসমূহের মধ্যে যেমন কোন দ্বন্দ্ব অথবা পরস্পরের মধ্যে আদর্শগত সংঘাত থাকে না, গিরিশচন্দ্রের অধিকাংশ পৌরাণিক নাটকই তেমনি দ্বন্দ্বহীন, ঘটনার বিবরণমাত্র। দ্বিতীয়তঃ

১৩. প্রাগুক্ত ॥ পৃ ৩৬৬

যাত্রার প্রধান রস ভক্তিবাদ এবং দার্শনিকতার প্রচার। যাত্রার অধিকাংশ চরিত্রের মধ্য দিয়েই এই দুটি বিষয় এগিয়ে চলে। মনোমোহন বসুর নাটকের সংসার-অনাসক্ত চরিত্রের মত গিরিশচন্দ্রের কঞ্চুকী এবং বিদূষক চরিত্রও ভক্তিপ্রবণ এবং দার্শনিক। তৃতীয়তঃ যাত্রার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য গীতিময়তা। কিন্তু যাত্রায় সঙ্গীত উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দুর্বল হয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা মন্তব্য করেছিল ;

> "প্রচলিত যাত্রাগুলির প্রতি সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তিগণের নিদারুণ বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। রঙ্গভূমি করিয়া নাটকের অভিনয় করা অধিক ব্যয়সাধ্য বিবেচনায় কলিকাতার কয়েকজন শিক্ষিত যুবক সামান্যতঃ তৎ-প্রণালীতে গীতাভিনয় প্রদর্শন আরম্ভ করিয়াছেন।" ১৪

কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হয় গীতাভিনয় রচয়িতারা যাত্রার সঙ্গীতকে নাটকের সঙ্গীতে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন। তেমনি উনিশ শতকের শেষ দিকে থিয়েটার-সঙ্গীতের প্রভাবে যাত্রা-পালাতেও সংগীত রীতির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। 'এতে (যাত্রায়) গানের সংখ্যা কমে গেলেও এক একটি পালায় ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ খানা পর্যন্ত গান থাকল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ও বিশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত গানের দিক থেকে যাত্রা-নাট্য দ্বারা থিয়েটারী নাটক প্রভাবিত হয়।' ১৫

গিরিশচন্দ্রও গীতিনাট্য এবং পৌরাণিক নাটক রচনা করতে গিয়ে যাত্রার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই জাতীয় যাত্রানুসারী গান প্রয়োগের জন্য তিনি কম সমালোচিত হননি। চতুর্থতঃ যাত্রার মত গিরিশচন্দ্রের নাটকেও জনরুচির তাগিদে শ্লথ হাস্যরসিক চরিত্রের আগমন ঘটেছে। ব্রজমোহনের দুঃশাসন, শকুনি অথবা মনোমোহনের, ব্যাধ, অশ্বরক্ষক প্রভৃতির অনুরূপ চরিত্র গিরিশচন্দ্রের নাটকেও কম নেই।

কিন্তু যাত্রা নাটক নয়, গিরিশচন্দ্র যাত্রারচয়িতা নন, পৌরাণিক নাট্যকার।

১৪. সংবাদ প্রভাকর, ১৬ই নভেম্বর, ১৮৬৫

১৫. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য : যাত্রা নাটক ও থিয়েটারী নাটক, রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা, সপ্তমবর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, অক্টোবর—ডিসেম্বর, ১৯৬৯।

এর কারণ তাঁর নাটকে যাত্রার মত দেবতা সর্বত্র উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত নন—মানুষ সর্বত্র দেবতা-নিয়ন্ত্রিত নয়। অন্তরঙ্গের দিক থেকে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবই তাঁর নাটকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কার্যকরী। গ্রীক নাটকের নিয়তিবাদ নয়, ইংরাজী নাটকের মানবতাবাদই তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলির অন্তরঙ্গ-প্রত্যয়। তাঁর প্রত্যেকটি পৌরাণিক নাটকের সর্বত্র হয়ত এই বৈশিষ্ট্যটি উপস্থিত নয়, কিন্তু অধিকাংশ নাটক সম্পর্কেই এই মন্তব্য প্রযোজ্য।) হয়ত এজন্যই বাল্মীকির রাম-লক্ষ্মণ নয়, কৃত্তিবাসের রাম-লক্ষ্মণ ; বেদব্যাসের কুরু-পাণ্ডব নয়, কাশীরাম দাসের কুরু-পাণ্ডব ; ভাগবতের রাধাকৃষ্ণ নয়, বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা-কৃষ্ণ ; কালিদাস-পুরাণের উমা-মেনকা নয় কবিওয়ালাদের উমা-মেনকা তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলির অনুসৃত চরিত্র।

সংখ্যাগত বিচারে গিরিশচন্দ্রের গীতিনাট্যগুলির পরেই পৌরাণিক নাটকগুলির স্থান।

নাটকের চরম সার্থকতা তার অভিনয় সাফল্যে। গিরিশচন্দ্র তৎকালীন বাংলাদেশের অধিকাংশ নাট্যমঞ্চে নির্দেশক এবং অভিনেতা থাকার সময় অভিনয়ের প্রয়োজনেই নাটক লিখতেন। সেজন্যই তাঁর অধিকাংশ নাটক একাধিক রজনী অভিনয়ের পর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

'রাবণবধ' গিরিশচন্দ্রের প্রথম পৌরাণিক নাটক। এই নাটকটি যে সেকালের কলকাতার দর্শকদের কি বিপুল আলোড়িত করেছিল তার পরিচয় আছে সমকালীন পত্রিকাগুলির পাতায়। এর কারণ নাটকটির সর্বত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণের বাঙালীসুলভ ভক্তিপ্রাণতার পরিচয় রক্ষিত। ভক্তিবাদই যে রাবণ-বধ নাটকের বিপুল জনপ্রিয়তার উৎস সে সম্পর্কে নাটকটির প্রথম রজনীর বিভীষণ চরিত্রের অভিনেতা অমৃতলাল বসু বলেছেন :

'রাবণ বধ নাটক যেদিন প্রথম অভিনীত হয়, আমাদের বড়ই ভাবনা হইয়াছিল পৌরাণিক নাটক চলিবে কিনা ? কিন্তু অভিনয়কালীন যে সময়ে জগজ্জননীর অভয় পাইয়া রাবণ অবধ্য হইয়া উঠিয়াছে, রামচন্দ্র হতাশ হইয়া লক্ষ্মণ, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে বলিতেছেন—

দেহ সবে বিদায় আমায়,
সাগর সলিলে—ত্যজিব তাপিত প্রাণ !...

রামচন্দ্র-বেশী গিরিশচন্দ্রের জলদগম্ভীর কণ্ঠ হইতে যখন শেষ দুই ছত্র—

তারার চরণে ভক্তি-অস্ত্র বিনে
কি পারে বিন্ধিতে আর !

উচ্চারিত হইল, তখন দর্শকমণ্ডলী, আমাদের মনে হইল, এ নাটক চলিবে, ভক্তিপ্রধান বাঙালী তাহার জন্মগত সংস্কার ভুলে নাই—ধর্মপ্রাণ জাতির মর্মস্থান এ নাটক ঠিক স্পর্শ করিয়াছে।” ১৬

সংলাপসৃষ্টি, ঘটনাস্থাপন ইত্যাদি ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র কৃত্তিবাসকে অনুসরণ করলেও সীতা চরিত্রের অগ্নিপরীক্ষার দৃশ্যে গিরিশচন্দ্র অপূর্ব সৃষ্টিক্ষমতার সাক্ষর রেখেছেন। ১৮৮১ সালের ৩০শে জানুয়ারী ন্যাশানাল থিয়েটারে ‘রাবণ বধে’র প্রথম অভিনয়ে বিনোদিনীর সীতা চরিত্রে সুন্দর অভিনয়ের পিছনে এই চরিত্রসৃষ্টির গুণই কাজ করেছিল।

লৌকিক উপাদানের প্রাচুর্য ‘রাবণবধ’ নাটকের জনপ্রিয়তার যেমন একটি কারণ তেমনি দ্বিতীয় কারণ হল এই নাটকে প্রথম ব্যবহৃত হয় গৈরিশছন্দ।

গিরিশচন্দ্রের ‘রাবণ বধ’ রচনার পরের বছর বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ও ‘রাবণবধ’ (১৮৮২) নামে একটি পৌরাণিক নাটক লেখেন।

‘রাবণ বধ’ নাটকের অভূতপূর্ব সাফল্যই গিরিশচন্দ্রকে ‘সীতার বনবাস’ রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। রামসীতার অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন এবং সীতার বনবাস নাটকটির মুখ্য কাহিনী। এই নাটকে দুটি স্বপ্নদৃশ্য আছে যা বাল্মীকি, কালিদাস অথবা কৃত্তিবাসে নেই। রাবণের চিত্রের উপর সীতার নিদ্রা যাওয়ার কাহিনী চন্দ্রাবতীর রামায়ণে থাকলেও গিরিশচন্দ্র এই ঘটনাটিকে আশ্রয় করায় নাটকের করুণরস জমতে পারেনি। লব-কুশের যুদ্ধে নিকষার উপস্থিতি পুরাণ-বহির্ভূত বিষয়। সীতার পাতাল প্রবেশ দৃশ্য না দেখিয়ে ‘শূন্যে কমলাসনে লক্ষ্মীরূপে সীতার আবির্ভাব’ দৃশ্য রচনার কারণ সমকালীন দর্শকের রুচি তৃপ্ত করা। দ্বিজেন্দ্রলাল এবং যোগেশ চৌধুরীর ‘সীতা’ নাটকের পরিণতি ভিন্নতর। ‘রাবণ বধে’র মত সীতার বনবাস নাটকেও মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গের প্রভাব স্পষ্ট। তৃতীয় সর্গে প্রমীলার উক্তির প্রতিধ্বনিও শোনা যায়—

১৬. অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র, পৃঃ ২২৬

সীতা। রাজ ঋষি জনক আমার,
সূর্যবংশ কুলবধূ—
দশরথ শ্বশুর ঠাকুর,
রাম স্বামী, দেবর লক্ষ্মণ। [২য় অঙ্ক ২য় গর্ভাঙ্ক]

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ব্রজমোহন রায় মহাভারতীয় উপাখ্যানের উপর ভিত্তি করে লেখেন 'অভিমন্যুবধ'। এর তিন বছর পর গিরিশচন্দ্র 'অভিমন্যুবধ' রচনা করেন এবং ন্যাশানাল থিয়েটারে প্রথম অভিনয়ে যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধন এই দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই নাটক সম্পর্কে লেখা হয়েছিল :

অভিমন্যুবধের অভিমন্যু আমাদের সেই মহাভারতের অভিমন্যু—সেই কল্পনার আদর্শভূত অভিমন্যু। এই বঙ্গীয় নাটকখানিতে যেখানেই আমরা অভিমন্যুকে পাইয়াছি—কি উত্তরার সঙ্গে প্রেমালাপে, কি সুভদ্রার সঙ্গে স্নেহ বিনিময়ে, কি সপ্তরথীর দুর্ভেদ্য ব্যূহমধ্যে বীরকার্য সাধনে—সকল স্থানেই এই নাটকের অভিমন্যু প্রকৃত অভিমন্যুই হইয়াছে।[১৭]

একদিকে সংস্কৃত বেণীসংহার নাটক অন্যদিকে মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের প্রভাব এ নাটকে লক্ষণীয়।

ন'টি দৃশ্যে সম্পূর্ণ 'লক্ষ্মণ বর্জন' নাটকটি পূর্ববর্তী 'সীতার বনবাস' নাটকের পরিশিষ্ট কাহিনীমাত্র। এই নাটকের প্রধান ত্রুটি হল নাটকটি অপূর্ণ এবং চরিত্রগুলি অপরিস্ফুট। অন্যান্য পৌরাণিক নাটকসমূহের মত লক্ষ্মণ বর্জনও করুণ রসাশ্রয়ী নাটকের সাফল্য লাভ করতে পারেনি।

রামায়ণের কাহিনীকে ঘটনা অনুযায়ী গিরিশচন্দ্র পর পর রূপ দেননি বলেই 'রাবণ বধ', 'সীতার বনবাস' এবং 'লক্ষ্মণ বর্জন' রচনার পর তিনি কাহিনীর প্রথম অংশে দৃষ্টি দেন এবং একে একে লেখেন 'সীতার বিবাহ', 'রামের বনবাস' এবং 'সীতা হরণ'। এর মধ্যে প্রথম নাটকটিকে বিশ্বামিত্র কর্তৃক দশরথের কাছে রাম ও লক্ষ্মণকে প্রার্থনা থেকে সুরু করে দশরথের চার পুত্রের বিবাহ বর্ণিত হয়েছে। এটি তিন অঙ্কের নাটক। 'রামের বনবাসে' রামের বনবাস যাত্রা থেকে চিত্রকূট পর্বতে ভরত-মিলন পর্যন্ত কাহিনীর বিস্তার। এটি পাঁচ অঙ্কের নাটক। 'সীতাহরণে' লক্ষ্মণ কর্তৃক শূর্পনখার নাসিকা-

১৭. ভারতী, মাঘ, ১২৮৮

ছেদন থেকে শুরু করে অশোকবন থেকে হনুমান কর্তৃক সীতার সংবাদ আনয়ন কাহিনী পরিবেশিত। এটিও পাঁচ অঙ্কের নাটক। তিনটি নাটক রচনাতেই গিরিশচন্দ্র কৃত্তিবাসকে অনুসরণ করেছেন। যে সব গুণ থাকলে একটি পৌরাণিক নাটকের সার্থকতা ঘটতে পারে, এই তিনটি নাটকে সেগুলি সর্বত্র রক্ষিত হয়নি।

রামায়ণ-কাহিনী আশ্রয়ে রচিত পৌরাণিক নাটকগুলির ব্যাপক জনপ্রিয়তা গিরিশচন্দ্রকে 'সীতার বিবাহ' নাটক রচনায় উৎসাহিত করে। এই নাটকটি কাহিনীর ক্ষেত্রে রামায়ণ-অনুসারী হলেও নাট্যকারের মৌলিকতা উপেক্ষণীয় নয়। বিভিন্ন শ্রেণীর চরিত্রের (সৈন্য, পুরস্ত্রী, ভৃত্য, পণ্ডিত) মধ্য দিয়ে হাস্যরস পরিবেশন করা হয়েছে। নাটকের সূচনায় রামকে গোলকপতি বিষ্ণু এবং সীতাকে রমা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। রামের পূর্বস্মৃতি মন্থনও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। সীতা ও রতির উক্তিও প্রত্যুক্তিও নাট্যকারের মৌলিক কল্পনা। সীতার বিবাহে, মহাদেব ও প্রমথগণ, বিশ্বামিত্র, লক্ষ্মী, এবং হিজড়ার মুখে গান বসানো ছাড়াও নেপথ্য সংগীতেরও ব্যবহার আছে। কিন্তু অন্যান্য অধিকাংশ নাটকের মত এ নাটকে কোন সমাপ্তি সংগীত নেই।

'সীতার বিবাহ' নাটকের প্রথম অভিনয়ের (১১ মার্চ, ১৮৮২) পরের মাসেই 'রামের বনবাস' প্রথম অভিনীত হয় (১৫ই এপ্রিল ১৮৮২)। এই নাটকটির সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি হল ঘটনাটি এলোমেলো, ফলে কোন কেন্দ্রীয় কাহিনীর একমুখী পরিণতি ঘটেনি। দশরথের পুত্রস্নেহ এবং রাম-বনবাসের ফলে তাঁর মৃত্যুই নাটকটিকে আংশিক করুণরসমুখর করেছে। দৃশ্যগুলি আর একটু বিস্তারিত হলে নাটকটি ট্রাজেডির পথে যেতে পারত। দৃশ্যসজ্জার ক্ষেত্রে এই ত্রুটি 'সীতাহরণ' নাটকেও (প্রথম অভিনয় ২২শে জুলাই ১৮৮২) রয়ে গেছে। ঘটনার কেন্দ্রবিচ্যুতি 'সীতাহরণ' নাটককে 'সীতার বনবাস' অপেক্ষা দুর্বল করেছে। চরিত্রের দিক থেকে শূর্পনখা বেশী লৌকিক রঙে (Local Colour) চিত্রিত হওয়ায় পৌরাণিক চরিত্রের গাম্ভীর্য হারিয়ে কমিক চরিত্রে পর্যবসিত হয়েছে। রাম এবং রাবণ চরিত্রের গতানুগতিকতা সীতা এবং মন্দোদরী চরিত্রের পাশাপাশি যেন বেশী চোখে পড়ে। এই নাটকে ব্যবহৃত রত্নবালাগণ এবং নর্তকীদের গান 'পাণ্ডবগৌরবে'র অপ্সরা-

---

১৮. দ্রঃ ৩/১ , ৩/৪ , ৩/৫.

গণের গান এবং 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে'র কিঙ্করীগণের গান অপেক্ষা ভাল।

রামায়ণ কাহিনী নিয়ে একের পর এক নাটক লিখে গিরিশচন্দ্র ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তা ছাড়া রামায়ণের মূল কাহিনী মোটামুটি ছ'টি নাটকের মধ্য দিয়ে পরিবেশিত হয়ে গিয়েছিল। এদিকে জনগণের বুকে তখনও পৌরাণিক নাটকের জন্য গরুড়ের ক্ষুধা। গিরিশচন্দ্র রঙ্গমঞ্চের দাবী মেটাতে কাহিনী খুঁজলেন মহাভারতের পাতায়।

'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' (প্রথম অভিনয় ১২ই জানুয়ারী ১৮৮৩) নাটকের দুটি মূল ঘটনা—কীচক বধ এবং কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধ। প্রথম ঘটনার নায়ক ভীম, দ্বিতীয় ঘটনার নায়ক অর্জুন। গিরিশচন্দ্র এই প্রথম তাঁর নাটকে চরিত্রের প্রবৃত্তির উপর জোর দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এবং দ্রৌপদী চরিত্রও মূল মহাভারতের অনুকরণে তাঁদের স্বাভাবিক রূপটি নিয়ে চিত্রিত হলেন। পুরাণের বৃত্তান্ত এবং গুণ নিয়ে উপস্থিত হলেও 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকটি অলৌকিকতায় প্লাবিত হয়নি। ১৮৭৫-এ ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'।

'দেবীভাগবত' এবং 'শিবপুরাণে' দক্ষযজ্ঞের কাহিনী আছে। বাংলা সাহিত্যে দক্ষযজ্ঞের ঘটনাকে আশ্রয় করে একাধিক গীতাভিনয় এবং পৌরাণিক নাটক রচিত হয়। মনোমোহন বসুর 'সতী নাটক' (১৮৭৩) রচনার ঠিক দশ বছর পরে গিরিশচন্দ্র লেখেন 'দক্ষযজ্ঞ' নাটক। উভয়ের রচনায় পার্থক্য হল এই, মনোমোহনের নাটকে যেখানে গার্হস্থ্য জীবন-রসের প্রকাশ, গিরিশচন্দ্রের নাটকে সেখানে চণ্ডী ও মহামায়া-তত্ত্ব প্রচার। সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বও নাটকটিতে উচ্চারিত। 'ইহার অন্তর্গত দশ-মহাবিদ্যা ও সতীর দেহত্যাগের পর মহাদেবের শোকাকুল অবস্থা বর্ণনায় ভারতচন্দ্র ও হেমচন্দ্রের প্রভাব অনুভব করা যায়। তবে ইহাতে সতীদেহ স্কন্ধে করিয়া শিবের ত্রিভুবন ভ্রমণ বৃত্তান্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাহা না হইলে শিবের চরিত্রটি আরও সুপরিস্ফুট হইতে পারিত। প্রসূতির চরিত্রটিতে মেনকার ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে।'[১৯] তপস্বিনী চরিত্রটি গিরিশচন্দ্রের মৌলিক সৃষ্টি।

'বিষ্ণুপুরাণে' সুনীতি-পুত্র ধ্রুবর বিষ্ণু-ভক্তি কাহিনী অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত। বিমাতা সুরুচি কর্তৃক ধ্রুবর আগমন, তার হরিদর্শন লাভের ব্যাকুল

আকাঙ্ক্ষা, বনচারী ধ্রুবর সপ্তর্ষির সঙ্গে সাক্ষাৎ, ধ্রুবর তপস্যা এবং বিষ্ণুর বরদান—ধ্রুবতারা ও দেবলোকের সৃষ্টির কাহিনী বাংলা সাহিত্যের গীতাভিনয় এবং পৌরাণিক নাট্যকারদের ক্ষেত্রে আদর্শ হিসাবে উপস্থিত হয়েছিল। এই কাহিনী নিয়ে রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে-নিমাইচাঁদ শীলের 'ধ্রুব চরিত্র (১৮৭২), গিরিশচন্দ্র ঘোষের (হ্যাদাড়া গিরিশ) 'ধ্রুব তপস্যা', 'ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ধ্রুব যোগাখ্যান' (১৮৭৫), নন্দলাল রায়ের 'ধ্রুব চরিত্র' (১৮৮৭), বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের 'ধ্রুব' (১৮৯৮), মতিলাল ঘোষের 'ধ্রুব' (১৯১৬) উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য নাট্যকার অপেক্ষা গিরিশচন্দ্রের 'ধ্রুব চরিত্র' গ্রন্থে পৌরাণিক কাহিনীকে যথাযথরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। অবশ্য বিষ্ণুপুরাণে মহাদেবের সঙ্গে ধ্রুবর সাক্ষাতের কোন পরিচয় নেই, বৈষ্ণব ভক্তি প্রচারের জন্যই গিরিশচন্দ্র শিবকে আনয়ন করেছেন।

ধ্রুব চরিত্র পূর্ণাঙ্গ নাটক। গদ্য সংলাপে চলিতের সচ্ছন্দ গতি বজায় আছে। সখীগণের গানগুলি সুপ্রযুক্ত। মহাদেবের উক্তিতে সর্বধর্মসমন্বয়ের সুরটি প্রকাশিত হয়েছে। তবে নাটকের সমস্ত চরিত্রই উর্ধ্বলোকের ভাব নিয়ে উপস্থিত, মানবিক রসের উৎসার কোথাও নেই।

মহাভারতের বনপর্বের অতি সুপরিচিত কাহিনী নল-দময়ন্তী। 'ধ্রুব চরিত্রে'র মত নল দময়ন্তীর কাহিনী নিয়ে বহু যাত্রা পালা গিরিশচন্দ্রের পূর্বে রচিত হলেও সেগুলির ব্যর্থতা সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উক্তি প্রণিধাণযোগ্য :

> 'কালিয়দমন, বিদ্যাসুন্দর, নলোপাখ্যান প্রভৃতি যাত্রায় আমোদ আছে কিন্তু তত্রাবৎ অত্যন্ত ঘৃণিত উপায়ে সম্পন্ন হইয়া থাকে তাহাতে আমোদ-প্রমত্ত ইতর লোক ব্যতীত ভদ্রসমাজের কদাপি সন্তোষ বিধান হয় না।'[২০]

গিরিশচন্দ্র ব্যাস মহাভারতের কাহিনীকে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করায় তাঁর 'নলদময়ন্তী' (প্রথম অভিনয় ১৪ই ডিসেম্বর, (১৮৮৩) যথার্থ পৌরাণিক নাটক হয়েছে। কণকবর্ণ হংসের দৌত্যে রাজা নল ও দময়ন্তীর মধ্যে প্রেম

১৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড দ্বিতীয় সং, ১৯৬০, পৃ—৩৮৫-৮৬

২০. সংবাদ প্রভাকর, ২৮শে জুন, ১৮৪৮

সঙ্কার থেকে বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে নল-দময়ন্তীর বিচ্ছেদ এবং নাটকের শেষে অশ্রুবিসর্জনের মধ্য দিয়ে উভয়ের পুনরায় মিলন—মহাভারতোক্ত এই দীর্ঘ কাহিনী নাট্যকার সম্পূর্ণ গ্রহণ করেছেন। গিরিশচন্দ্র বুঝেছিলেন এই উপাখ্যানের মধ্যে জীবনরস অতি প্রগাঢ়, কাহিনীটি আগাগোড়া ঘটনা-সংঘাতে মুখর। মূল চরিত্রের মত পার্শ্বচরিত্রগুলিও 'নলদময়ন্তী'র অন্যতম আকর্ষণ। মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' নাটকের কলি চরিত্র, কৃষ্ণমিশ্রের সংস্কৃত নাটক 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ে'র অহঙ্কার চরিত্র এবং সংস্কৃত নাটকের অতি পরিচিত বিদূষক চরিত্র গিরিশচন্দ্রের নাটকে যথাক্রমে কলি, শকুনি এবং বিদূষক চরিত্রের উপর ছায়া ফেলেছে। এই সূত্রে বলা যায়, গিরিশচন্দ্রের বিদূষক ঔদরিক হলেও সে রাজার সুখ-দুঃখও সমভাবে অনুভব করে, তাই নলের সন্ধানে বার হতে গিয়ে সে বলে—

ব্রাহ্মণী। কত দিনে দেখা পাব?
বিদূষক। নল যবে রাজা পুনঃ।
বনে বড় ছিল ভয়—
সেথা ফল খেতে হয়;
কিন্তু
পুষ্করের অনুগ্রহে সে ভয় ঘুচেছে,
এক বস্ত্রে রাজা গেছে বনে।
কাঁদি আয়, ব্রাহ্মণি, খানিক;
না—না—
রাজ্যে মানা—কেহ নাহি দিবে অন্নজল;
সঙ্গি, খুঁজি কোথা রাজা,
যাও ফিরে,—নহে, মম পদ নাহি চলে।

[২য় অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক]

কালিদাস সান্যাল, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, উমাচরণ দে, অভয়ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রাণচন্দ্র দাস গিরিশচন্দ্রের পূর্বে 'নলদময়ন্তী' যাত্রা-নাটক লিখেছিলেন।

'কমলেকামিনী' এবং 'বৃষকেতু' নাটক দুটির প্রথম অভিনয় এক মাসের ব্যবধানে স্টার থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হয়। কমলেকামিনীর বিষয়বস্তু

চণ্ডীমঙ্গলের অন্তর্গত শ্রীমন্ত কাহিনীকে অবলম্বন করে রচিত হলেও, 'বৃষকেতু' নাটকটি ধর্মমঙ্গলের হরিশ্চন্দ্র পালার অনুসরণে রচিত এমন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। বৃষকেতু সরাসরি কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' অনুসরণে রচিত।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু 'কমলে কামিনী' নামে যে রোমান্টিক নাটক লেখেন তার সঙ্গে কবিকঙ্কনের ধনপতি-পালার কোন যোগ নেই। গিরিশ-চন্দ্রের পুর্বে একই নামে জীবনকৃষ্ণ সেন (১৮৮৬) এবং রাধানাথ মিত্র (১৮৮২) নাটক লিখেছিলেন। 'কমলে কামিনী'কে গিরিশচন্দ্র 'ভক্তিরসাত্মক নাটক' রূপে বর্ণনা করলেও এ নাটকে পৌরাণিক আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা লক্ষণীয়। কিন্তু অন্যান্য পৌরাণিক নাটকের চরিত্রের মত এখানে শ্রীমন্ত চরিত্রে অহৈতুকী ভক্তির প্রকাশ ঘটেছে, ঘটেছে সকামা ভক্তির আত্মপ্রকাশ।

'বৃষকেতু' একাঙ্ক নাটক। 'কমলেকামিনী' যেমন চণ্ডীমঙ্গলের খণ্ডিত কাহিনীর নাট্যরূপ, বৃষকেতুর কাহিনীও তেমনি অল্পপরিসরে রচিত, খণ্ডিত। এর ফলে আদর্শকথা এবং কাহিনী পাশাপাশি না এগিয়ে চলায় চরিত্রকে অবিকশিত দেখা যায়।

'বৃষকেতু' নাটকের ত্রুটি 'প্রহ্লাদ চরিত্র' নাটকেও উপস্থিত। বাংলা নাট্যসাহিত্যে প্রহ্লাদ কাহিনী নিয়ে বেশ ক'খানা নাটক লেখা হয়েছে। গিরিশচন্দ্র মাত্র দুটি অঙ্কে নাটক সমাপ্ত করলেও কাহিনীর মূলভাব খণ্ডিত হয়নি। কিন্তু 'বৃষকেতু'র মত আলোচ্য নাটকটিও আদর্শবাদের কথা বেশী উচ্চারণ করায় নাটকীয় রস ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কেবলমাত্র প্রহ্লাদ-মাতা কয়াধুর চরিত্রটি ঈষৎ মানবিক মূল্য লাভ করেছে।

'শ্রীবৎস চিন্তা' গিরিশচন্দ্রের অন্যান্য পৌরাণিক নাটকের সমধর্মী। এই অতিপরিচিত পৌরাণিক কাহিনীটি শ্রীবৎস রাজার দুঃখবরণের একটি ধারাবাহিক চিত্র। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চিন্তা, শনি, লক্ষ্মী ইত্যাদি চরিত্রের নানা গুণ। নাটকের পরিণতিও অন্যান্য নাটকের মত মিলনাত্মক। শ্রীবৎস-চিন্তা রচনার সঙ্গে সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের প্রথম পর্বের পৌরাণিক নাট্যরচনার পরিণতি ঘটে। এর পর 'প্রভাস-যজ্ঞ' 'জনা' 'পাণ্ডবগৌরব' 'তপোবন' ইত্যাদি ক'টি পৌরাণিক নাটকে নাট্যকারের ভক্তিবিহ্বল চিত্তের প্রকাশ

যেমনটি ফুটেছে পূর্ববর্তী নাটকগুলিতে তা অনুপস্থিত। রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে ইতিমধ্যে গিরিশচন্দ্রের সাক্ষাৎ ঘটে যাওয়ায় পৌরাণিক নাটকে ভক্তিরসের এই প্লাবন সঙ্গত কারণেই দুর্বার হয়েছে।

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের আর একটি ধারা হল চরিতনাটক। ভারতবর্ষের কয়েকজন ধর্মসাধকের সম্পর্কে জনশ্রুতি এবং ইতিহাস অবলম্বন করে তিনি কয়েকটি নাটক রচনা করেন। এগুলির কোনটিকেই গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটক বলে দাবী করেননি। কিন্তু পৌরাণিক সংস্কার নাট্যিক চরিত্রগুলিকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছে এবং কীর্তিত চরিত্রটি সূচনা থেকেই এমনভাবে ভগবানের অবতার রূপে অলৌকিক ঘটনার কারণ হয়েছে যে নাটকগুলিও সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক লক্ষণাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। চৈতন্য, নিত্যানন্দ, বুদ্ধ এবং শঙ্করাচার্য—এঁরা ভগবানের অবতাররূপে গিরিশচন্দ্রের নাটকে চিত্রিত। দ্বিতীয় শ্রেণীর চরিত্রগুলির মধ্যে গিরিশচন্দ্র গ্রহণ করেছেন বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, রূপ সনাতন, পূর্ণচন্দ্র ও করমেতি বাঈকে—যাঁরা সকলেই ভক্তির মূর্ছনায় অবশ-শিথিল। গিরিশচন্দ্র যেকালে এই নাটকগুলির অধিকাংশই রচনা করেছিলেন সেই যুগে যুক্তির স্থান গ্রহণ করেছিল ভক্তি। গিরিশচন্দ্র জনসাধারণের সেই দাবী মিটিয়েছিলেন ১৮৮৪ থেকে ১৮৮৯ সালের মধ্যে রচিত অবতার-ভক্ত পর্যায়ের নাটকগুলি রচনা করে। তবে কালগত দিক থেকে একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারা না থাকায় পরবর্তীকালে রচিত গিরিশচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ পৌরাণিক নাটকগুলির আলোচনা আগেই করে নেওয়া যুক্তিযুক্ত।

শ্রীকৃষ্ণের উত্তর-জীবনের কাহিনী-আশ্রয়ী পূর্ণাঙ্গ পৌরাণিক নাটক 'প্রভাস যজ্ঞ'*(প্রথম অভিনয় ৩রা মে ১৮৮৫) অন্যান্য নাট্যরচয়িতাদের কৃষ্ণ-রাধা বিষয়ক রচনা অপেক্ষা উন্নততর। রাধা-কৃষ্ণ চরিত্রের মধুরলীলা-বিষয়ক যাত্রাগুলি হয়ত গিরিশচন্দ্রকে প্রেরণা দিয়েছিল। গিরিশচন্দ্রের কলমে নন্দালয় এবং দ্বারকার- পটভূমি সুন্দর নাটকীয় আভাস লাভ করেছে। শেষ জীবনে রচিত তাঁর ত্র্যঙ্ক গীতিনাট্য 'নন্দদুলাল' (১৯০০)-এর সঙ্গে 'প্রভাস-যজ্ঞ' নাটকের রসগত মিল আছে।

'জনা' নাটকের পৌরাণিকত্ব নিয়ে বহু তর্ক-বিতর্ক হলেও বলা চলে এটিই গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক। কাশীরাম দাসের মহাভারতের

'অশ্বমেধ পর্ব' এবং মধুসূদনের 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' পত্রটি গিরিশচন্দ্রের নাটকের প্রেরণাভূমি। এর সঙ্গে মিলেছিল তাঁর সেক্সপীয়র-পড়া মন। এর ফলে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার একটি নিটোল উপহার হিসেবে 'জনা' সেদিন দর্শকদের কাছে এত প্রশংসা অর্জন করেছিল।

ফরাসী বীরাঙ্গনা 'জোয়ান অব আর্ক', সেক্সপীয়রের নারীচরিত্র ভোলুম্নিয়া (কোরিওলেনাস) এবং 'মার্গারেট' চরিত্র গিরিশচন্দ্রের মনে ছিল। এই নাটকের মূলসুর এবং মুখ্যগতি জনাই নিয়ন্ত্রণ করেছেন। নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কেই জানা গিয়েছে—তিনি শৈশবে মাতৃহীন। চতুর্থ অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে কৃষ্ণ বলেছেন—

জনা নহে সামান্য রমণী
জাহ্নবীর সহচরী মহা তেজস্বিনী;
ভোগ লালসায় এসেছে ধরায়,...

জনা এইটুকু জানেন যে তিনি ক্ষত্রিয়ের পত্নী, ক্ষত্রিয়জননী—তাই নীলধ্বজের কৃষ্ণার্জুন-প্রীতি তিনি সহ্য করতে পারেন না। পুত্রকে যুদ্ধে পাঠাতে গিয়ে জনার অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্রতম হয়েছে যার সুন্দর প্রকাশ দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কে। তিনি নিজের দুর্বলতা গোপন করতে পুত্রবধূ মদনমঞ্জরীকে ভৎর্সনা করেছেন। দুর্বল সেনাপতি এবং মন্ত্রীদের যুদ্ধে উত্তেজিত করেছেন। অতঃপর সমগ্র নাটকব্যাপী জনা যেন স্বয়ং অগ্নি-গোলক। প্রবীরের মৃত্যুর পর জনার একদিকে 'হা পুত্র হা প্রবীর আমার' আর্তনাদ, অন্যদিকে প্রতি-হিংসার দুর্মর সংকল্প ('শোক নাই জনার হৃদয়ে') নাটকের শেষ সংলাপ পর্যন্ত বিস্তৃত। নীলধ্বজের পিতৃসত্তা পুত্র প্রবীরের মৃত্যু ভুলে নগরের আনন্দোৎ-সবে অংশ নিয়েছে, কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু জনা যে জননী—তাই তিনি শেষ পর্যন্ত উন্মাদ হয়ে যান,—'তবে প্রাণ কি কারণে রাখি'। জনা মৃত্যুবরণ করে জ্বালা জুড়ান।

বাংলা পৌরাণিক নাটকে জনার সহোদরা চরিত্র আর দ্বিতীয়টি নেই। এই চরিত্রের প্রচণ্ড প্রতিহিংসাপরায়ণতাই সমগ্র নাটকটিকে পাঠক এবং দর্শকের চিত্তে চাঞ্চল্য সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে। জনার এই ক্ষত্রিয়সুলভ শৌর্য এবং রণোন্মাদনা হয়ত পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে কিছুটা বিস্ময়ের বিষয়, কিন্তু

একথাও সত্য তাঁর সেই চরিত্র-দার্ঢ্যই নাটকটির মঞ্চসাফল্যের যথার্থ কারণ। পুত্রশোকে অধীরা জনার মাতৃহৃদয় যে শপথ উচ্চারণ করেছে তার ভিতর কোন অসঙ্গতি নেই—

জনা। শুন শুন ভীষণ শ্মশানভূমি।
শুন সমীরণ।
শুন প্রেতদানা ডাকিনী হাঁকিনী—
ফের যারা এ নির্মম স্থলে
শুন রবি গগনমণ্ডলে।
জলে স্থলে অনিলে অনলে
অলক্ষিতে ভ্রম যে শরীরী,
শুন শুন প্রতিজ্ঞা আমার,
যজ্ঞেশ্বর, চক্রধর, দণ্ডধর কিবা,
বজ্র হাতে ঐরাবতে দেব পুরন্দর
সবে মিলি হয় যদি অর্জুন সহায়—
পুত্রহন্তা অরাতিতে রক্ষিতে নারিবে।

[তৃতীয় অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক]

এই প্রতিহিংসা-অভীপ্সা আর একবার শোনা গিয়েছিল সেক্সপীয়রের 'রিচার্ড দি থার্ড' নাটকে মার্গারেটের কণ্ঠে :

Bear with me ; I am hungry for revenge,
And now I cloy me with beholding it....
Earth gapes, hell burns, fiends roar, saints pray,
To have him suddenly conveye'd from hence.
Cancel his bond of life, dear God, I pray,
That I may live and say, "The dog is dead."

(Act 4, Scene 4)

জনা নাটকের একাধিক প্রধান চরিত্র, যেমন শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাদেব নিতান্ত মানবিক-আচরণে ভাস্বর। দেবচরিত্র হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা অলৌকিকতায় স্বর্গবাসী নন। এই চরিত্রগুলির উপস্থিতিতে তাই 'জনা' নাটকের মধ্যে, কিছুটা লৌকিকতার স্পর্শ লেগেছে। আরও জোর দিয়ে বলা যায় এই চরিত্রগুলিই 'জনা'কে পৌরাণিক নাটকের মর্যাদা দিয়েছে।

জনার পরই এই নাটকের যে চরিত্রটি পাঠক-দর্শককে আকর্ষণ করে সে বিদূষক। সেক্সপীয়রের Fool বা Falstaff চরিত্র গিরিশচন্দ্রের আদর্শ নয়। বিদূষকের পরিচয় অন্যরূপে পূর্বে যাত্রা-পালায় ছিল। তবে 'নল-দময়ন্তী' এবং 'ধ্রুব চরিত্রে'র বিদূষক চরিত্রের হুবহু প্রতিফলন 'জনা' নাটকের বিদূষকে নেই, পরবর্তীকালে রচিত 'পাণ্ডবগৌরব' নাটকের 'কঞ্চুকী' চরিত্রের সঙ্গে তার গভীর মিল। সরস-রসিকতার আড়ালে বিদূষক চরিত্রে রয়েছে গভীর ভক্তিবাদ।

জনা নাটকের বিদূষক জনা এবং প্রবীরের কথোপকথন শুনে আসন্ন ঘটনার পূর্বাভাস দেখতে পায় এবং রাজাকে সতর্ক করে বলে—

নীলধ্বজ। যা হবার হবে, যুদ্ধ করি।
বিদূষক। তাই করুন, রথে চেপে ধনুক ধরুন।
নীলধ্বজ। কিন্তু জয়-আশা ত কোনমতেই নাই।
বিদূষক। আশায় লোক বেঁচে থাকে, নিরাশা ধরে যদি কাজ করেন, কাজটা নূতন হয় বটে, কিন্তু শেষটা কি ঘটে সেই একটা কথা।

[১ম অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক]

বিদূষক প্রাণমন দিয়ে চেয়েছে যেন রাজপুরীর কোন সর্বনাশ না হয়। গঙ্গারক্ষকদের ঘোড়া চুরির ঘটনায় আমোদপ্রিয় দর্শকরা কেবলমাত্র বিদূষক চরিত্রের রসিকতার দিকটিই উপভোগ করে কিন্তু গভীরভাবে দেখলে প্রতি-পালকের প্রতি তার কৃতজ্ঞতার পরিচয়টি অনায়াসে বোঝা যায়। পঞ্চম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের বিদূষক চরিত্র ভক্তিভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

শিশিরকুমার 'জনা'-র প্রথম ন'টি অভিনয়ে 'বিদূষক' চরিত্র বর্জন করে-ছিলেন, দশম অভিনয়ের সময় থেকে ঐ চরিত্রটি অভিনীত হতে থাকে। নিত্যমুক্ত বিদূষক চরিত্রের বর্জন সম্ভবতঃ রঙ্গালয়ের দর্শকরা ভালমনে সেদিন গ্রহণ করেননি।

পৌরাণিক নাটকের কাহিনীতে ট্রাজিক রস থাকলেও নাট্যপরিণতি যে শেষ পর্যন্ত মিলনান্তক হতে বাধ্য হত তা মনোমোহন বসুর 'সতী নাটকে'র আলোচনাতেই দেখা গেছে। গিরিশচন্দ্রও 'জনা'কে আত্যন্ত ট্রাজিক রসে আপ্লুত করে শেষ পর্যন্ত একটি 'ক্রোড়-অঙ্ক' যুক্ত করতে বাধ্য হয়েছেন।

এমনও হতে পারে পৌরাণিক নাটকের এই পরিণতি গিরিশচন্দ্রের ইচ্ছা-জাত। অন্যথায় তিনি জনা চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব, দুঃখ-কষ্ট স্বীকার, শোচনীয় পরিণাম ইত্যাদি দৃশ্য দেখাবার পর—জনাকে ট্র্যাজিক চরিত্র হিসাবে সৃষ্টি করার পর তিনি ঐ ক্রোড়-অঙ্কটি যোগ করতেননা। ঐ অঙ্কে দর্শক দেখে—'প্রবীর মদনমঞ্জরী জনা—কারো মনেই কোন ক্ষোভ নেই। দুঃখ বেদনা নেই, সকলেই সব দ্বন্দ্বের অতীত—শান্ত ও সমাহিত চিত্ত।—যে জনার জন্য এত শোচনা, যে প্রবীরের অকালমৃত্যুর জন্য এত বেদনা, যে মদনমঞ্জরীর বাল্য-বৈধব্যের বেদনা, দুঃখের জন্য এত সমবেদনা, তারা সকলেই ছায়াবাজীর ছায়ায় পরিণত হয়ে, শোচনাকে অহেতুক করে তুলেছে।'[২১] 'জনা' একটি সার্থক ট্র্যাজেডির উপাদানে পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও পুরোপুরি বিষাদান্তক হয়ে ওঠেনি। ভক্তিরসই এই ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জনা নাটকের প্রথম অভিনয় হয় মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে। অভিনয়ের আগের দিন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল :

> Merry X'Mas Entertainments / Minerva Theatre / 6 Beadon Street, Calcutta / Saturday, the 23rd December 1893 at 9 P. M. / the first performance of New Mythological Drama / by G. C. Ghosh (My humble self) / New Drama / JANA / New Drama / Please join jubilation / Artistic Arrangements / Novel Niceties / attractive Articulations / Jana / the story taken from the Ashamedha Purva of the immortal epic Mohabharat.[২২]

বিজ্ঞাপনে "entertainment", "Jubilation" ইত্যাদি মনোরম শব্দের উল্লেখ থাকার কারণ বোধ হয় এই যে, সেদিনের অভিনয়ে ক্রোড়-অঙ্কটি দৃশ্যায়িত হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র মঞ্চে জনাকে সার্থক ট্র্যাজিক নাটক করতে পারেননি যেহেতু তাঁর চেতনাটি পৌরাণিক সংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। জনার এই ট্র্যাজিক-মূল্যের দিকটি পরবর্তীকালে বিখ্যাত অভিনেতা শিশিরকুমার

২১. সাধনকুমার ভট্টাচার্য : নাট্য-সাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার, ১ম খণ্ড (১৩৭৩) ; পৃঃ ২২৭-২৮

২২. Amrita Bazar Patrika, 22nd November, 1893.

ভাদুড়ী অনুভব করেছিলেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে জনা নাটকে প্রথম প্রবীর চরিত্রে অভিনয় করার কালেই হয়ত তিনি তা উপলব্ধি করেছিলেন। অতঃপর তিনি পেশাদার পরিচালকরূপে পাদপ্রদীপের আলোয় আসেন এবং ১৯২৫ সালের ৩রা জুন নাট্যমন্দিরে জনা মঞ্চস্থ করেন। সেই অভিনয়ে ক্রোড়-অঙ্ক বর্জিত হয় এবং করুণ রসাত্মক 'জনা' দর্শকদের ব্যাপক প্রশংসা লাভ করে। উনবিংশ শতাব্দীতে গিরিশচন্দ্রের পক্ষে যে ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব হয়নি, বিংশ শতাব্দীর পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীতে শিশিরকুমার ঝুঁকি না নিয়েই সেই কাজ করেছেন। 'জনা'-তে গান আছে মোট ২০টি। এ ছাড়া নায়িকা-দের দুটি সুরে আবৃত্তি আছে। সখীগণ, বসন্তকুমারী, প্রমথগণ, জনা, মদনমঞ্জরী-স্বাহা ও বসন্ত, কাম ও রতি, নায়িকা ও সখীগণ, ভৈরব-ভৈরবী, বালকগণ ও গোপিনীগণ এই গানগুলির গায়ক-গায়িকা। সংলাপের মত সংগীতের মধ্য দিয়েও ভক্তির প্রকাশ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বসন্তকুমারীর হরিগুণগান (২/৪), ভৈরব-ভৈরবীর মহাদেব ও কালীবন্দনা (৩/৪) অথবা বালকদের কীর্তন গান (৪/৪) ভক্তিভাবের প্রবাহ সৃষ্টি করেছে সত্য কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে এগুলি অপ্রয়োজনীয়।/

গিরিশচন্দ্রের পরবর্তী জনপ্রিয় পৌরাণিক নাটক 'পাণ্ডবগৌরব' (প্রথম অভিনয় ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯০০) দুর্বাশার উর্বশীর প্রতি অভিশাপ এবং সেই অভিশাপ খণ্ডনের কাহিনী নিয়ে রচিত। ''পাণ্ডব গৌরব' নাটকে দণ্ডীরাজার যে উপাখ্যান আছে গিরিশচন্দ্র সেটি পেয়েছিলেন উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পদ্যবন্ধে রচিত 'দণ্ডীপর্ব' (১৮৭০) থেকে [নৃত্যলাল শীল দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত]। গিরিশচন্দ্রের এই নাটক রচনার পূর্বে প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ লেখেন 'দণ্ডীচরিত বা উর্বশীর অভিশাপ' (১৮৮৬)। রোহিণীনন্দন সরকারের 'দণ্ডীপর্ব—মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত' (১৮৮৫) গ্রন্থের প্রকাশও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। উমাকান্তের গ্রন্থে বর্ণিত দণ্ডী উপাখ্যানই গিরিশচন্দ্রের উপজীব্য হয়েছিল।''[২৩] দুর্বাসা, দণ্ডী, সুভদ্রা এবং উর্বশী চরিত্র পুরাণানুসারী এবং যথাযথ।

২৩. গিরিশ রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ সং) : প্রথম খণ্ড (১৯৬৯) : দেবীপদ ভট্টাচার্য রচিত 'সাহিত্য সাধনা' দ্রষ্টব্য; পৃঃ ৫৯।

পাণ্ডব গৌরব নাটকের সূচনায় দণ্ডীরাজের স্বগত সংলাপ উপন্যাসের ন্যায় বর্ণনাধর্মী—

দণ্ডী। পশ্চিমে আরক্ত ভানু অস্তাচলগামী,
আসে ছায়া, বিকশিয়া কায়া;
নিবিড় গহন,
পাখী ফিরে নিজ নীড়ে;
স্তব্ধ—স্তব্ধ ক্রমে দূর গ্রাম্য-কোলাহল;
শ্বাসহীন সমীরণ যেন নিবিড় গহন-ছবি হেরে।

(১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক)

দণ্ডীকে উর্বশী জানিয়েছে যে তার জীবনে ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নেই—

উর্বশী। হে রাজন্!
জান কি হে অপ্সরীর হৃদয় গঠন......
শুনেছ অপ্সরী, নারী,
কিন্তু নাহি নারীর হৃদয়।
অপরূপ বিধির সৃজন;
রূপে ভুবন-মোহিনী, বিলাসিনী—
স্বর্গবাসে যায় লোক ভোগ-আকাঙ্ক্ষায়,—
পায় মাত্র প্রেমহীন দেহের সঙ্গম।...
মানা করি,—ফিরে যাও ঘরে;
নিজ মন বুঝিতে না পারি,
কেন আজি সতর্ক তোমারে করি।

(১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক)

এই দোলাচল-চিত্ততা থেকে এটুকু বোঝা যায় উর্বশীর দৃষ্টিতে পুরুরবা, দণ্ডী এক নয়। নাটক যত এগিয়েছে ততই শোনা গেছে আসন্ন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের রণবাদ্য। শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশেই সুভদ্রা পাণ্ডবদের যুদ্ধে উৎসাহিত করেছেন কৃষ্ণের বিরুদ্ধে। নারদের চক্রান্ত এই ঘটনার জটিলতাজাল আরও দৃঢ় করল। কিন্তু শেষরক্ষা হল না—অতিরিক্ত কৃষ্ণভক্তি নাটকটিকে বিশৃঙ্খল করে দিল।

নাট্যকার মূল কাহিনীর সঙ্গে দণ্ডী-উর্বশীর উপকাহিনীকে যুক্ত করেছেন। প্রথম অঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্কে দণ্ডী ও উর্বশী একসঙ্গে পলায়নে প্রস্তুত হয়েছিল কিন্তু ইতিমধ্যে অর্জুন-উর্বশীর সাক্ষাৎ। অর্জুন তাদের ভাল করেই চেয়েছিলেন, উর্বশীর পূর্ব-ইতিহাস শুনে তাঁর উক্তি—

অর্জুন। এতক্ষণে বুঝিলাম দ্বন্দ্ব কি কারণ ;
কেন দণ্ডী ঝাঁপ দিতে চাহিল সলিলে।
কহ মাতা, কিসে শাপ হইবে মোচন।

(৪র্থ অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক)

উর্বশীর কথা শুনে অর্জুন অষ্টবজ্র সম্মিলনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু কামনায় জর্জরিত দণ্ডীর মনে জেগেছে সন্দেহ, নিরপরাধিনী উর্বশীর প্রতি সে নির্মম বাক্য প্রয়োগ করেছে—

দণ্ডী। বুঝেছি উর্বশী, তোর মন,
অর্জুন তোমার প্রিয়।
ধিক্ ধিক্—কালামুখী, লাজ নাই তোর।...
ভাল, রসরঙ্গ প্রেমভঙ্গ করিব নিশ্চয়,
যে ব্যথা বেজেছে তার দিব প্রতিশোধ।

(৪র্থ অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক)

উভয়কে দণ্ড দিতে দণ্ডী শ্রীকৃষ্ণের রাজসভায় পর্যন্ত উপস্থিত হয়েছে। তার হৃদয়-জ্বালার এই অভিব্যক্তি নাট্যকার সুন্দরভাবে ফুটিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত উর্বশীর শাপমুক্তি ঘটল। নাট্যকার সূচনা থেকে পরিণতি পর্যন্ত উর্বশী চরিত্রের বেদনাতুর মুহূর্তগুলিকে ভালভাবে অগ্রসর করে নিয়েছেন। এই নাটকে যেটুকু দ্বন্দ্বের আভাস আছে তা এই দণ্ডী-উর্বশী উপকাহিনীকে জড়িয়েই।

'পাণ্ডবগৌরব' কৃষ্ণভক্তির প্রচলিত সুরটি প্রকাশ করলেও অত্যধিক ভাবাবেগ নাটকীয় রসকে ক্ষুণ্ণ করেছে। গিরিশচন্দ্রের পূর্ববর্তী নাটকগুলির মত এই নাটকেও নাট্যসংঘাতের সম্ভাব্য সুযোগ উপস্থিত থাকলেও ভক্তির জোয়ারে তা বিকশিত হতে পারেনি। নাটকের পরিণতিও ঘটেছে হাল্কা পরিবেশে। নাটক অপেক্ষা যাত্রার মেজাজই বেশী চোখে পড়ে। 'পাণ্ডব গৌরবে'র নারদ চরিত্র যাত্রার লৌকিক নারদের কথা মনে করায়। ভীম

এবং সুভদ্রা চরিত্র দুটি নাটকীয় গুণ বহন করে। অবশ্য গঠনগত ঐক্যের (Structural Unity) যে আদর্শ এ নাটকে আছে গিরিশচন্দ্রের অন্যান্য পৌরাণিক নাটকে তা নেই।

'পাণ্ডব গৌরব'ও 'জনা'র মত সংগীত-মুখর নাটক। এই অত্যধিক গান ব্যবহারে নাট্যসংঘাত বারংবার বাধা পেয়েছে। নাটকের সূচনা অপ্সরাদের হরিবন্দনা দিয়ে, সমাপ্তি শ্যামা-সংগীত দিয়ে। এর মাঝে সুভদ্রার ও উত্তরার গঙ্গা বন্দনা, মহিলাদের মহাদেব-বন্দনা, সুভদ্রার অম্বিকা বন্দনা-গীত আছে। নাটকের প্রয়োজনে এই সংগীতগুলির মূল্য প্রায় নেই বলা যায়।

গিরিশচন্দ্রের শেষ পৌরাণিক নাটক 'তপোবন'। এই নাটকের মধ্য দিয়ে সর্বসংস্কারমুক্ত ধর্ম এবং মানবচিন্তার একটি পরিণত বিকাশ ঘটেছে। বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের বিবাদ এবং শেষে মিলন, ত্রিশঙ্কু কাহিনী—এই নাটকের আলোচ্য বিষয়। নাটকের মূল চরিত্র দুটির মধ্য দিয়ে জ্ঞান এবং কর্মযোগের প্রচার এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্বামিত্রের উপলব্ধি—অভিমান বর্জনই ব্রাহ্মণত্ব—'তপোবন' নাটকের মূলসুর। 'ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই চারিত্রিক শক্তির সাধনা বাংলাদেশে নূতন প্রেরণা লাভ করিয়াছিল। যুগ প্রেরণার উপর ভিত্তি করিয়া এই নাটক রচিত বলিয়া ইহা গিরিশচন্দ্রের অন্যতম শক্তিশালী রচনা বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল।'[২৪]

পৌরাণিক নাটকগুলি রচনার ফাঁকে ফাঁকে গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক সংস্কার-যুক্ত অবতার-মহাপুরুষ নাটকগুলি রচনা করে সমকালীন জনসমাজে ভক্তি-রসের প্লাবন বইয়েছিলেন। এই পর্যায়ের প্রথম নাটক 'চৈতন্যলীলা' (প্রথম অভিনয় ২রা আগষ্ট ১৮৮৪) এবং দ্বিতীয় নাটক 'নিমাই সন্নাস' (প্রথম অভিনয় ২৮শে জানুয়ারী ১৮৮৫)। ষোড়শ শতাব্দীর নবজাগরণের অগ্রপথিক শ্রীচৈতন্যের জীবন একটি পৌরাণিক পুরুষের সন্ধান দেয়। চৈতন্য-লীলার অভিনয় সুদূর পল্লীর অভ্যন্তরে প্রভাব সঞ্চার করেছিল, কর্ণেল অলকট এই নাট্যাভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুখর হয়েছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ

২৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য: বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৯৬০, পৃষ্ঠা ৩৯২

অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্র সমকালের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের পুনরুজ্জীবনের প্রবণতা লক্ষ্য করেই এই দুটি নাটক লেখেন। এই প্রসঙ্গে তৎকালে কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮-৮৪) বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আকর্ষণ, শিশির-কুমার ঘোষের চৈতন্যভক্তি, বিজয়কৃষ্ণ ঘোষের গৌরাঙ্গভক্তি, বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখের বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আকর্ষণের কথা স্মর্তব্য।

'চৈতন্যলীলা' উচ্চশ্রেণীর নাট্যকর্ম হয়ে উঠতে পারেনি। প্রথম থেকে চৈতন্য চরিত্রে অবতারলীলা প্রয়োগের ফলে নাট্যিক চরমোৎকর্ষ দানা বাঁধতে পারেনি। পূর্ণাঙ্গ পৌরাণিক নাটকের মত এই নাটকেও গিরিশচন্দ্র সেই ত্রুটি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। অথচ বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্য ভাগবতে' মধ্যখণ্ড পর্যন্ত চৈতন্যচরিত্র যেভাবে আঁকা হয়েছে তা থেকে নাটকীয় উপাদান সংগ্রহ সম্ভব ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতেই চৈতন্য দেবতার স্থানে উন্নীত হয়েছিলেন, গিরিশচন্দ্র সেই চরিত্রের গভীরে মানবিকতার স্পর্শ ছোঁয়াতে রাজী হননি। সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বকে গৌরাঙ্গে আরোপ করাটা বৈষ্ণব-দর্শন বিরোধী। কৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের অনুকরণে পাপ, ষড়রিপু, ভক্তি, বৈরাগ্য, বিবেক ইত্যাদি চরিত্রগুলি স্থান পেয়েছে। ইতিহাসের কিছু অনুসরণ থাকলেও 'চৈতন্যলীলা' পৌরাণিক নাটকের আদর্শেই রচিত।

চৈতন্য-জীবনীর দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ থেকে নীলাচল-গমন পর্যন্ত অসংখ্য ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে 'নিমাই সন্নাস' নাটকে। পূর্ববর্তী নাটকের বিপুল জনপ্রিয়তা দেখে এবং অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষের অনুরোধে রচিত হয় 'নিমাই সন্নাস'। নাটকের কাহিনীর ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের আদর্শ প্রধানতঃ চৈতন্য-ভাগবত, এ ছাড়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং লোচনদাসের চৈতন্য-জীবনীও তিনি পড়েছিলেন। চৈতন্যের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের যৌথ প্রকাশ কৃষ্ণদাসের কাব্য থেকে এবং নিমাইয়ের গৃহত্যাগের রাত্রে বিষ্ণুপ্রিয়ার অঙ্গসজ্জার বিষয় লোচনদাসের কাব্য থেকে গৃহীত। অন্যান্য পৌরাণিক নাটকের মত এক্ষেত্রেও নাট্য পরিণতি মিলনাত্মক করার জন্য শেষ অংশে নাট্যকার নিমাই ও বিষ্ণুপ্রিয়ার মধ্যে 'ভাবসম্মিলন' ঘটিয়েছেন।

'নিমাই সন্নাস' নাটকে অত্যধিক গূঢ় আধ্যাত্মিক ভাবপ্রাধান্য ঘটায় স্টার থিয়েটারে নাটকটি বেশীদিন চলেনি। চৈতন্যলীলা অপেক্ষা 'নিমাই সন্নাসে'র সংলাপ যে 'বড় বড় স্পীচ দ্বারা পূর্ণ' একথা স্বীকার করতেই হয়। অবশ্য কোন কোন স্থলে সুন্দর ভাষাপ্রয়োগে এই ত্রুটি কিছুটা দূর হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে দুটি উদ্ধৃতি দেওয়া যায়—

নিমাই। হবে এ জীবন ফুল্ল নিধুবন,
হৃদি ফুল্ল কমল-আসন,
ওহে বাঁকা হয়ে মুরলী বদন,
রাধা অঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়ে,
চোখে চোখে চেয়ে,
করিবে রে প্রেম বিনিময়,...... (৪/১)

অথবা—

বিষ্ণুপ্রিয়া।... দেখ দেখ বিনায়েছি বেণী
ফুলসাজে সেজেছি সজনি,
পরেছি লো যা লো সখি!
আন তুলে ফুল, মালতী বকুল
গাঁথিব চিকন মালা,
বলে গেছে
আসিবে আসিবে প্রাণনাথ। (৪/৭)

'নিমাই সন্নাসে'র কাহিনী যেমন অসম্পূর্ণ, তেমনি অগোছাল। এর ফলে নাট্যরস গাঢ় হতে কখনই পারেনি।

গিরিশচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র সেন ইংরেজ কবি এডুইন আর্ণল্ডের (১৮৩২-১৯০৪) 'Light of Asia' নামক অষ্ট-সর্গে বিধৃত কাব্যের অনুসরণে দশ বছর আগে পরে নাটক (বুদ্ধদেব চরিত) এবং কাব্য (অমিতাভ) রচনা করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রমাদাস সেন, রমানাথ সরস্বতী, কৃষ্ণবিহারী সেন, অঘোরনাথ গুপ্ত প্রমুখরা ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যেমন বৌদ্ধধর্ম নিয়ে চর্চা করেছিলেন, তেমনি বিদেশী পণ্ডিতদের মধ্যে ম্যাক্সমূলর, ওলডেন-বার্গ; রিজ ডেভিডস দম্পতিও বৌদ্ধ সংস্কৃতি আলোচনায় স্মরণীয় নাম। আর্ণল্ডের 'Light of Asia' সেকালের শিক্ষিত বাঙালীকে আবেগাপ্লুত

করেছিল। গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধদেব চরিত' (প্রথম অভিনয় ২০শে আষাঢ় ১২৯৩) পৌরাণিক বিশ্বাস এবং বেদান্তের বক্তব্যে রচিত হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধদেবের ত্যাগপূত জীবন কোথাও চাপা পড়ে যায় নি। এই নাটকের অভিনয় দেখে আর্ণল্ড লিখেছিলেন—

"Another singular pleasure was to witness a performance of the light of Asia played by a native Company to an audience of Calcutta Citizens, whose Close attention to the long soliloquies and quick appreciation of all the Chief intelligence of the story gave an idea of their intelligence and proved how metaphysical by nature these Hindu people are.' [২৫]

গিরিশচন্দ্রের নাটকে আর্ণল্ডের মূল কাব্যের অনুসরণ বহুক্ষেত্রে দেখা যায়; যেমন দেববালাদের গান—

Light of Asia :

We are the voices of the Wondering wind,
Which moan for rest and rest can never find,
Lo ! as the wind is, so is mortal life,
A moan, a sigh, a sob, a storm, a strife.

[Book III]

বুদ্ধদেব চরিত :

জুড়াইতে চাই—কোথায় জুড়াই ?
কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই।
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি,
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই।......
অধীর—অধীর যেমতি সমীর,
অবিরাম গতি নিয়ত ধাই।

[২/২]

২৫. Edwin Arnold : 'India Revisited' (London, 1886); PP 250-51

'লাইট অব এসিয়া'র ২য় সর্গে কুমারী-মেলা আহ্বান, সিদ্ধার্থের গোপাকে নির্বাচন, স্বয়ম্বর সভায় সিদ্ধার্থের অস্ত্রবিদ্যায় নৈপুণ্য প্রদর্শন, গোপা-সিদ্ধার্থের বিবাহ, প্রমোদ ভবন নির্মাণ ইত্যাদির অধিকাংশই 'বুদ্ধদেব চরিতে'র দ্বিতীয় অঙ্কে [বিশেষতঃ দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে] পুনরুপস্থাপিত। তৃতীয় অঙ্কে নাটকে বর্ণিত সিদ্ধার্থ ও ছন্দকের নগর-পরিক্রমা, বিভিন্ন দৃশ্য দর্শনে সিদ্ধার্থের সংকল্প, আর্ণল্ডের কাব্যানুসারী। নাটকের পঞ্চমদৃশ্য প্রায় কাব্যানুসারী। এই গানগুলিও প্রায়শঃ আর্ণল্ড-অনুসারী।

অবশ্য 'বুদ্ধদেব চরিত' নাটকের মধ্য দিয়ে গিরিশচন্দ্রের আধ্যাত্মিক চিন্তারও স্ফুরণ ঘটেছে। নাটকের সূচনাতে তিনি নিজস্ব ভঙ্গিতে গোলক-ধামে লীলাকমল হস্তে আসীন বিষ্ণু এবং দণ্ডায়মানা 'দয়া'কে স্থাপন করেছেন—এর ফলে জয়দেবের বিষ্ণু অবতার গিরিশচন্দ্রে বুদ্ধ অবতারে রূপান্তরিত হয়েছেন। তৃতীয় অঙ্কে শুদ্ধোদনের কাছে সিদ্ধার্থের সংসার ত্যাগের জন্য অনুমতি প্রার্থনাও গিরিশচন্দ্রের স্বকীয় কল্পনা। ৪র্থ অঙ্ক ২য় গর্ভাঙ্কে সিদ্ধার্থের উক্তি—তৎকালীন বাঙালীর আধ্যাত্মিক চিন্তারই বহিঃ-প্রকাশ। আর্ণল্ডের কাব্য অনুসরণ না করেও গিরিশচন্দ্রের পক্ষে আরও উন্নততর নাটক রচনা সম্ভব ছিল। গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব 'সংস্কার' আরোপিত হওয়ার ফলেই নাটকটি কিছুকাংশে পৌরাণিক নাটকের চরিত্র গ্রহণ করেছে।

পরবর্তী নাট্যকর্ম 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' (প্রথম অভিনয় ৩রা জুলাই ১৮৮৬) গিরিশচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ পৌরাণিক নাটকগুলির সগোত্র নয় সত্য, কিন্তু পৌরাণিক ভাববিশ্বাসী গিরিশচন্দ্রের হাতে নাটকটি যথেষ্ট পৌরাণিক সংস্কার লাভ করেছে। ভক্তিরস আলোচ্য নাটকটির প্রাণকেন্দ্রে যে তরঙ্গ তুলেছে, তা নাটকের শেষ পর্যন্ত উদ্ভাসিত। নাটকের শেষ দিকে রাখালবেশী কৃষ্ণের উপস্থিতিতে এই নাটকের পৌরাণিকত্ব প্রসারিত হয়েছে। নানা জনশ্রুতি, কিংবদন্তী, কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ ইত্যাদি অনুসরণ করে গিরিশচন্দ্র এই নূতন ধরণের নাটকটি লিখেছেন, যার মধ্যে কোন ধর্ম প্রচারের চেষ্টা নেই, কোন মহৎ বাণী প্রচার নেই, অবিশ্বাস্য এবং অলৌকিক ঘটনার তড়িৎ-শিহরণও নেই। সম্ভবতঃ সেজন্যই বিল্বমঙ্গল লোকপ্রিয়তার তুঙ্গ-বিজয়ে সক্ষম হয়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর আর একটি সামাজিক ব্যাধির ছবি 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নাটককে স্থায়ী মূল্য দিয়েছিল। লাম্পট্য এবং বারবণিতাসক্তি ঊনিশের

শতকে সংক্রামক রোগের মত ছড়িয়ে পড়ে, পুরুষের ভ্রষ্টাচার এবং চরিত্রহীনতা সমাজকে গ্রাস করে। গিরিশচন্দ্র স্বয়ং মদ্যপান এবং বারাঙ্গনা-সঙ্গে কতখানি লিপ্ত ছিলেন তার পরিচয় অমৃতলাল বসু রচিত 'অমৃত-মদিরা' গ্রন্থে আছে। বহু নাট্যকার এই বিষয়কে আক্রমণ করে নাটক লিখলেও তাঁরা পথ দেখাতে পারেননি। রামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে এসে ধীরে ধীরে গিরিশচন্দ্রের দৃষ্টি ফিরল—রচিত হল 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর'।

'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নাটকের নায়ক বিল্বমঙ্গল যৌবনের তাড়নায় বারবণিতা চিন্তামণির রূপযৌবনে আসক্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু চিন্তামণির সংস্পর্শে এসে তাঁর অভিমান, অনুযোগ, ক্রোধ, কাম-তৃষ্ণা ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হতে থাকে, মনে জাগে বৈরাগ্যের আহ্বান। জৈবিক কামনা যে পদ্মপত্রের বুদ্বুদ-বিলাস মাত্র এই সত্য তাঁর মনে জাগল যখন তিনি নদীতে গলিত মৃতদেহটি দেখলেন—

এই নরদেহ—
জলে ভেসে যায়,
ছিঁড়ে খায় কুক্কুর শৃগাল,
কিম্বা চিতাভস্ম পবন উড়ায়।
এই নারী—এরও এই পরিণাম। [২/৩]

লৌকিক প্রেমের রূপে বৈরাগ্যের রশ্মি পড়ল। এর পর আর বিল্বমঙ্গলের জীবনে প্রবৃত্তির তাড়না নেই, নিবৃত্তির সাধনা আছে। চিন্তামণি কৃষ্ণদর্শন লাভের জন্য তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। শেষে উভয়েই কৃষ্ণ-সাক্ষাৎ লাভ করেছে।

গিরিশচন্দ্র তাঁব নাট্যকারজীবনে যেসব অসংখ্য চরিত্র সৃষ্টি করেছেন চিন্তামণি চরিত্রটি তাদের ভিতর অন্যতম। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের ভিতর যেমন দেবতা আছেন, মহাপুরুষ আছেন, তেমনি আছে লম্পট, নীচ চরিত্রও। তাঁর একাধিক নাটকে বারাঙ্গনা চরিত্র উপস্থিত এবং সেগুলি তাঁর মানব চরিত্রাভিজ্ঞতার ফসল। গিরিশচন্দ্র নিজের জীবনেও বারবণিতার সংস্পর্শে এসেছেন। সাহিত্য-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁর 'নাটক ও তদ্বিষয়ক বিবরণ' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন—

থিয়েটারের অভিনেতা ছিলেন বলিয়া চিরকালই তাঁহার নটীর সহিত কারবার করিতে হইয়াছে। এখানে নটী মাত্রেই বারবণিতা, সুতরাং, তাঁহার যেটুকু কল্পনাশক্তি আছে, সেইটুকুর বলে তাঁহার প্রণীত বারবণিতা চরিত্র এত সুন্দর দেখায়, এত প্রকৃত বোধ হয়, এত জীবন্ত প্রতিমূর্তি বলিয়া ভ্রম হয়।[২৬]

সুরেশচন্দ্রের এই অভিমতের প্রথমাংশের সঙ্গে আমরা প্রায় একমত। কিন্তু প্রবন্ধের অন্যত্র তিনি একথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, কেবলমাত্র বারাঙ্গনা চরিত্র সৃষ্টিতেই গিরিশচন্দ্র সার্থক। গিরিশ-প্রতিভার প্রকৃত মূল্যায়ন এটি নিশ্চয়ই নয়।

'কল্পনাশক্তির' বলে গিরিশচন্দ্র বৃত্তিহীনতার কালিমায় মলিন বারবণিতা চিন্তামণিকে যেমন পবিত্রতার প্রতিমূর্তি করেছেন তেমনই বিল্বমঙ্গল চরিত্রকেও তিনি নতুন সাজে সজ্জিত করেছেন। কামনাতুর রূপদিদৃক্ষু বিল্বমঙ্গল আস্তে আস্তে পরমসুন্দর কৃষ্ণরূপে দেখতে চেয়েছেন। অন্যদিকে দেহপসারিণী চিন্তামণির মধ্যে বৈরাগ্য, অর্থ-সম্পদের প্রতি আকর্ষণ ক্রমে ক্রমে নিবৃত্ত হয়ে ঢলে পড়েছে কৃষ্ণদর্শন এবং কৃষ্ণকৃপা লাভের কামনায়। বারাঙ্গনা চিন্তামণির মত লম্পট বিল্বমঙ্গলও গিরিশচন্দ্রের সহানুভূতি-বঞ্চিত নয়।

পৌরাণিক সংস্কার এবং সহজাত ভক্তিবাদ যে নাটকের কাহিনীকে আচ্ছন্ন করে সেই নাটকে জটিলবৃত্ত রচনা অসম্ভব। বিল্বমঙ্গল ঠাকুরও জটিলবৃত্ত নাটক নয়। ৫টি অঙ্ক এবং ১৯টি গর্ভাঙ্কে বিন্যস্ত এই নাটকটি যথাসম্ভব নাটকীয় হয়েছে।

'বিল্বমঙ্গল ঠাকুরে' গান আছে মোট তেরোটি—সবচেয়ে বেশী গান আছে পাগলিনীর কণ্ঠে (৬টি)। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে পাহারাদারদের কণ্ঠে সমবেত গীতটি পরিবেশের গুণে অপূর্ব।

এর পর একে একে গিরিশচন্দ্র লেখেন—'প্রেম ও বৈরাগ্যমূলক' নাটক 'রূপ সনাতন' (প্রথম অভিনয় ২১শে মে ১৮৮৭), 'ভগবদ্‌বিশ্বাসমূলক নাটক' 'পূর্ণচন্দ্র' (প্রথম অভিনয় ১৭ই মার্চ্চ, ১৮৮৮) এবং 'ভক্তি ও জ্ঞানমূলক নাটক' 'করমেতি বাঈ' (প্রথম অভিনয় ১৮ই মে ১৮৯৫)। এই তিনটি নাটকই

২৬. সাহিত্য, বৈশাখ, ১২৯৭

গিরিশচন্দ্রের ভক্তিরসাশ্রয়ী নাটক। প্রথম নাটকটিতে রূপ গোস্বামীর সংসার-ত্যাগের পর সনাতন গোস্বামীর সংসার-ত্যাগের ঘটনা নাট্যকার আশ্রয় করেছেন। এই খণ্ডিত নাট্যকাহিনীতে পুরাণের বিশ্বাসবোধ আছে, নেই ঐতিহাসিক তথ্যস্বীকৃতি। 'নব্যভারত' পত্রিকায় বলা হয়েছে—

> রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ প্রকাশ প্রভৃতি যে সমুদয় বিষয় এই নাটকখানির মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে. সে সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে চাহিনা। গ্রন্থখানি নাট্যাংশে তত উৎকৃষ্ট হয় নাই তাহার কারণ, বোধহয়, গ্রন্থকর্তাকে বাধ্য হইয়া অনেক সময়ে অনেক আশ্চর্য ঘটনা তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে।[২৭]

'পূর্ণচন্দ্র' নাটকটি গিরিশচন্দ্রের সার্থক রচনা নয়।

'ভক্তমাল' গ্রন্থের অনুসরণে গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় নাটক 'করমেতিবাঈ' রচিত হয়। করমেতি এবং পরশুরাম চরিত্র ব্যতীত অন্যান্য চরিত্র গিরিশচন্দ্র-কল্পিত। এই নাটকের আগমবাগীশ এবং অম্বিকা চরিত্রের উপর 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নাটকের সাধক ও থাকো চরিত্রের প্রভাব স্পষ্ট। কৃষ্ণপ্রেম-বিষয়ক অত্যন্ত সাধারণ কাহিনী নিয়ে গিরিশচন্দ্র যে পুরাণ-মূলক নাটক লিখতে পারেন, আলোচ্য নাটকটি তার উদাহরণ।

শ্রীবিদ্যার উপাসক মায়াবাদী দার্শনিক শঙ্করাচার্যের ঐতিহাসিক তথ্যমূলক জীবনী গিরিশচন্দ্রের হাতে আসে। সেজন্য 'শঙ্করাচার্য' (প্রথম অভিনয় ১৫ই জানুয়ারী ১৯০৯) রচনার সময় তাঁকে জনশ্রুতির উপর বহুলাংশে নির্ভর করতে হয়েছিল। জনশ্রুতি-নির্ভর নাটক অলৌকিক হতে বাধ্য, এ ত্রুটি 'শঙ্করাচার্যে'ও রয়ে গেছে। শঙ্করাচার্যের স্তোত্র-কবিতায় ঐকান্তিক ভক্তির যে সুর প্রবাহিত তা-ও নাট্যকারকে মুগ্ধ করেছিল। আর এর সঙ্গে মিশেছিল রামকৃষ্ণদেবের প্রভাব। কালীপদ ঘোষকে নাটকটি উৎসর্গ প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র লিখেছিলেন—'আমরা উভয়ে একত্রে বহুবার শ্রীদক্ষিণেশ্বরে মূর্তিমান বেদান্ত দর্শন করেছি। তুমি এখন আনন্দধামে, কিন্তু আমার আক্ষেপ—তুমি নরদেহে আমার 'শঙ্করাচার্য দেখলে না।' ইতিপূর্বে নাটকের ধারাকে তিনি ভক্তি ও বৈরাগ্যের ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, এই নাটকে তিনি অদ্বৈতবাদের প্রচার করলেন।

২৭. নব্যভারত, চৈত্র. ১২৯১

'শঙ্করাচার্য' পঞ্চাঙ্ক নাটক, কেন্দ্রীয় চরিত্র স্বয়ং শঙ্করাচার্য। এই সন্ন্যাসীকল্প মহাপুরুষ চরিত্রটি সৃষ্টিতে যে বিবেকানন্দর জীবন বিশেষভাবে প্রেরণা সঞ্চার করেছিল সে তথ্য পাই কুমুদবন্ধু সেনের কাছে নাট্যকারের মন্তব্যে : 'দেখ শঙ্করাচার্য নাটকে যা দেখানো হয়েছে, তা ঠিক হয়েছে। আমি inspiration-এ লিখেছি। ঠাকুর বলতেন সব শিয়ালের এক রা। প্রত্যেক মহাপুরুষ এক সত্যের প্রচার করে থাকেন। তবে স্বামিজীকে দেখে আমি শঙ্করের ছবি উপলব্ধি করছি।'[২৮]

গিরিশচন্দ্রের অপরাপর নাটকগুলির মত 'শঙ্করাচার্যে'র কাহিনীও দীর্ঘ, মন্থর। আগাগোড়া সঙ্গীত ব্যবহার নাটকটিকে দ্বন্দ্বহীন করেছে। তত্ত্বকথার বারংবার উপস্থাপনায় নাটকটি ভারাচ্ছন্ন।

গিরিশচন্দ্র আগে নট পরে নাট্যকার। মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' যাত্রার গীত রচনার জন্য এগিয়ে আসেন গিরিশচন্দ্র। ন্যাশানাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পূর্বে বিভিন্ন সৌখিন রঙ্গমঞ্চে তিনি অভিনয় করেছিলেন। অতঃপর ন্যাশানাল থিয়েটার, গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার, স্টার থিয়েটার, এমারেল্ড থিয়েটার, সিটি থিয়েটার, মিনার্ভা থিয়েটার, ক্লাসিক থিয়েটার, কোহিনূর থিয়েটার ইত্যাদি বহু রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে গিরিশচন্দ্র যুক্ত হন। নট গিরিশচন্দ্র এবং নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের প্রকৃত সম্মান সেকালের ব্যবসায়ীগোষ্ঠী দেয়নি, দিয়েছে দর্শক সমাজ। অন্যান্য নাট্যধারার মত পৌরাণিক নাটকেও গিরিশচন্দ্রের সমৃদ্ধি এই রঙ্গমঞ্চের নেপথ্য সজ্জাকক্ষেই। তাঁর মৃত্যুতে Englishman পত্রিকা লিখেছিল :

> The Modern Bengali stage owes to him its present state. Besides being public writer the deceased was a powerful actor himself. He had many admirers among Europeans as well as Bengalees. Mr. Skrine, late of the Indian Civil Service, in speaking of the deceased once said 'How little the world knows of it's greatest men'.[২৯]

এ কথা সত্য, গিরিশচন্দ্রের মননের প্রধান সুরটি পুরাণের সত্যান্বেষণেই বিভোর ছিল। গিরিশচন্দ্রের নিজেরই উক্তি :

২৮. কুমুদবন্ধু সেন : গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য, কলিকাতা, ১৯৬৬, পৃঃ ১০০

২৯. The Englishman, 10th Feb., 1912

যত জাতির যত উচ্চ গ্রন্থ আছে, সকলই Mythological অর্থাৎ পৌরাণিক গল্প অবলম্বনে লিখিত। পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে ভার্জ্জিল ; খৃষ্টীয় পুরাণ অবলম্বনে মিল্‌টন ; পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে বাঙ্গালায় মাইকেল।...

আগে বলিয়াছি যাঁহারা Mythological অর্থাৎ পৌরাণিক বলিয়া ঘৃণা করেন, কেবলমাত্র তাঁহারা জানেননা যে, পুরাণে যাহা আছে, তাহা কোন জাতীয় কবি-কল্পনায় অদ্যাপি সৃষ্ট হয় নাই।[৩০]

[পৌরাণিক নাটক]

এই প্রবন্ধটি রচনার পাঁচ বছর আগে 'ভারতী' পত্রিকায় 'নীতি ও সাহিত্য' নামে একটি রচনা বার হয়। মনে হয় গিরিশচন্দ্র সেটি পড়েছিলেন। ভারতীতে লেখা হয়েছিল :

আধুনিক অভিনয়ে ধর্ম ব্যাপারটার একটু বেশী বাড়াবাড়ি হইয়াছে। কি বিল্বমঙ্গলে কি করমেতিবাই সব জায়গায়ই শ্রীকৃষ্ণ বেচারির এক সময়ে না এক সময়ে দর্শকদিগের সম্মুখে একবার দেখা দিয়া লইতেই হয়! অভিনেতা বা অভিনেত্রীগণের অথবা দর্শকদিগের মধ্যে কাহারো, (স্ত্রী দর্শক ভিন্ন অবশ্য) যে শ্রীকৃষ্ণে অচলাভক্তি আছে তাহাও বোধ হয় না। তথাপি যে শ্রীকৃষ্ণকে একবার চাই-ই, তাহার কারণ আর কিছুই নয়, শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার ব্যাপার একটু রসাল প্রেম সংঘটিত, আর এইরূপ প্রেম বঙ্গীয় দর্শকের নিতান্তই প্রিয়।......

থিয়েটারে কেহ ধর্ম-আলোচনা করিতে যায় না, আমোদ করিতে যায়, থিয়েটার ধর্মমন্দির নহে, একথা সত্য।[৩১]......

গিরিশচন্দ্র স্পষ্টই লিখলেন :

পৌরাণিক নাটক ভালমন্দ হয় বা না হয়, এ কথার সমালোচনা হইতে পারে, কিন্তু পৌরাণিক নাটক যে উচ্চশ্রেণীব নাটক হয় না, ইহা যিনি বলিতে চান, তাঁহার তুলনা তাঁহাতেই থাকুক।

(পৌরাণিক নাটক)

৩০. রঙ্গালয়, ৩০শে চৈত্র, ১৩০৭ সাল।

৩১. ভারতী, শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩০২

ন্যাশানাল থিয়েটারে রাবণবধ, স্টার থিয়েটারে দক্ষযজ্ঞ, মিনার্ভায় জনা ইত্যাদি আরও অনেক পৌরাণিক নাটকের অভিনয়ের সময় তিনি অনুভব করেছিলেন পুরাণের প্রতি বাঙালী দর্শকদের কি গভীর আকর্ষণ—ধর্মের প্রতি কি নিবিড় টান! সুতরাং পৌরাণিক নাটক সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র উপরোক্ত অভিমত তাঁর অভিজ্ঞতার দৃষ্টি নিয়েই করেছেন।

ত্রুটিহীন কোন সাহিত্যই আজ পর্যন্ত রচিত হয়নি, গিরিশচন্দ্রও ত্রুটিমুক্ত লেখক নন। পৌরাণিক নাটক রচনায় তাঁর মানসিক আদর্শ দ্বারা ধর্মভাবকে পরিচালিত করেন। সেজন্য চরিত্রসৃষ্টিতে মাঝে মাঝে যে পক্ষপাতিত্ব দেখা দেওয়া স্বাভাবিক; গিরিশচন্দ্রও সেই ত্রুটি থেকে মুক্ত নন। কেবলমাত্র সাহিত্যের কষ্টিপাথরের বিচারে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলির উচ্চ-প্রশংসা লাভের সুযোগ কম. কিন্তু সেই বিচারের সময় ধর্মমতের ও ভক্তি-বিনম্রতার আলোকে নাটকগুলি বিচার করলে তারা উচ্চাসনে পৌছে যায়।

গিরিশচন্দ্রের পূর্বে বাংলা পৌরাণিক নাটকের কোন সুস্পষ্ট আদর্শ গড়ে ওঠেনি—গিরিশচন্দ্রই এই ধারার একটি সুস্পষ্ট পথনির্দেশক। তাঁর রচিত পৌরাণিক নাটকগুলির অসামান্য মঞ্চসাফল্য তাঁর সমসাময়িক কালের নাট্যকারদের পৌরাণিক নাটক রচনায় উৎসাহ যুগিয়েছিল। এঁদের ভিতর কেউ কেউ গিরিশচন্দ্রের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন; অনেকেই ছিলেন তাঁর ন্যায় নট অথবা নাট্যাধ্যক্ষ—কিন্তু গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার আলোকরশ্মিকে তাঁরা নাট্যরচনায় প্রতিফলিত করতে সফল হননি। ফলে গিরিশ-সমসাময়িককালে প্রচুর পৌরাণিক নাটক রচিত হলেও তাদের ভিতর সার্থক পৌরাণিক নাটকের সংখ্যা অঙ্গুলিমেয়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কৃষ্ণযাত্রা রচনায় অবক্ষয়ের চিত্র নির্মম হয়ে ফুটে উঠেছিল, শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কৃষ্ণযাত্রার ধারাটিই স্বতন্ত্র গতিবলে ধাবিত হয়। এই রচনাগুলি পুরাপুরি যাত্রা নয়, গীতাভিনয় ত' নয়ই —বরং সেগুলিকে যাত্র-পালা নাম দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। এই শ্রেণীর যাত্রা রচয়িতাদের উপর গিরিশচন্দ্র-উচ্চারিত ভক্তিবাদের প্রভাব যথেষ্ট; কিন্তু গিরিশচন্দ্রের নাট্যকৌশল তাঁদের মধ্যে ছিল না। লোকশিক্ষার জন্য পুরাণের কাহিনীকে ভক্তির মোড়কে প্রচার করাই ছিল তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য। মতিলাল রায়, চন্দ্রহাস দে, ব্রজমোহন রায়, অহিভূষণ ভট্টাচার্য, ধনকৃষ্ণ সেন, হরিপদ

চট্টোপাধ্যায়, প্রমুখের নাম এই প্রসঙ্গে স্মতর্ব্য। এঁদের কেউ কেউ গিরিশ-চন্দ্রের পূর্বেই গ্রন্থ রচনায় হাত দিলেও, প্রকৃতপক্ষে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের জনপ্রিয়তায় এঁদের দৃষ্টি আরও প্রসারিত হয়েছিল। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র নাগরিক জীবনে ভাবের প্লাবন বইয়ে দিলেন, যাত্রা-পালা রচয়িতারা সুদূর পল্লীর অভ্যন্তরে পর্যন্ত নিজেদের নিয়ে গেলেন।

রাজকৃষ্ণ রায় ॥

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-৯৪) আলোচিত হলেও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে তিনি প্রায়-অনালোচিত। ব্যক্তিজীবন এবং নাট্যজীবনে রাজকৃষ্ণ যত স্বপ্ন দেখেছিলেন তার অতি সামান্যই সফল হয়েছিল। পৌরাণিক নাট্যসাহিত্যের ধারায় তাঁর নাটকগুলি অবশ্যই আলোচিতব্য, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকাব করতে হয় তাঁর স্বল্পকালীন জীবন সাধনার সাহিত্য-ফসল তৎকালীন বাঙালী পাঠক এবং দর্শকসমাজকে তেমন গভীরভাবে নাড়া দিতে সক্ষম হয়নি। ব্যক্তিজীবনে দারিদ্র্য-জনিত ঋণের বোঝা যেমন মৃত্যুর শেষ দিনটি পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করেছে তেমনি বাঙালী নাট্যপিপাসুদের তাঁর নাটকগুলির প্রতি অনীহাও তাঁকে পীড়িত করেছে। এ কথা বলতেই হয় রাজকৃষ্ণের যে নাট্যপ্রতিভা ছিল প্রকৃত নাট্যাদর্শের অভাবে তার সার্থক স্ফুরণ হতে পারেনি।

রাজকৃষ্ণ রায় আগে কবি, পরে নাট্যকার। তাঁর বঙ্গ রঙ্গালয়ের সঙ্গে যখন প্রথম পরিচয় তখন গিরিশচন্দ্র পর্যন্ত প্রায় সকল নাট্যকারেরই আত্মপ্রকাশ এবং প্রতিষ্ঠা ঘটে গেছে। গীতাভিনয়ে মনোমোহন যে পথনির্দেশ করলেন, সেই পথ ধরে অজস্র গীতাভিনয় তখন শহরের দর্শকদের মন ভরিয়ে রাখত। এর পাশাপাশি সাধারণ রঙ্গালয়গুলিতে অভিনয় চলছিল মধুসূদন-দীনবন্ধু-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলির। রাজকৃষ্ণ তাঁর প্রায় দশটি কাব্যগ্রন্থ রচনার পর নাট্য-রচনায় হাত দেন এবং আমৃত্যু কাব্য, উপন্যাস এবং গল্প রচনার সঙ্গে সমান্তরাল গতিতে লিখতে থাকেন পৌরাণিক নাটক, প্রহসন এবং রোমান্টিক নাটক। আর্থিক প্রয়োজন এবং উচ্চাভিলাষের বশবর্তী হয়ে সাহিত্যেব বহুমুখী চর্চা প্রশংসনীয় হলেও তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির পথে যে এই দুটি প্রেরণাই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ফলে

সাহিত্যের কোন শাখাতেই রাজকৃষ্ণ একজন উচ্চশ্রেণীর শিল্পী হতে পারেননি।

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক যখন প্রবল গতি নিয়ে রচিত হচ্ছে, রাজকৃষ্ণের পৌরাণিক নাটকগুলিও প্রায় সেই সময়ই লেখা হতে থাকে। গিরিশচন্দ্রের প্রথম পৌরাণিক নাটক 'রাবণবধ' রচনার দু বছর পূর্বে রাজকৃষ্ণের প্রথম পৌরাণিক নাটক 'অনলে বিজলী' বার হলেও তাঁর নাটকে এমন কোন বৈশিষ্ট্য গিরিশচন্দ্র দেখেননি যার দ্বারা তিনি প্রভাবিত হতে পারেন। এবং এই নূতন সৃজনীশক্তির অভাবই রাজকৃষ্ণকে একদিকে মনোমোহন অপরদিকে গিরিশচন্দ্রের রচনাকে অনুকরণে বাধ্য করেছিল।

মনোমোহন বসুর পুরাণ-নির্ভর রচনাগুলিকে আমরা একবাক্যে নাটকের গৌরব দিতে পারিনা, তাই সেগুলিকে গীতাভিনয় বলা হয়ে থাকে। মনোমোহন যেমন গীতিকার ছিলেন তেমনি রাজকৃষ্ণের মননে কবিতার রস সর্বদাই প্রবল ছিল। এই গীতিভাবনাই মনোমোহনের সামাজিক নাটকগুলিকে বাস্তবসম্মত হতে দেয়নি, কবি-প্রতিভাই রাজকৃষ্ণ রায়কে সামাজিক নাট্যরচনা থেকে দূরে রেখেছিল।

কিন্তু রাজকৃষ্ণের রচনায় একটি বিষয় ছিল, তা হল যাত্রার রসহীন উঁকি-ঝুঁকি। মনোমোহনের রচনায় রুচির একটি অনাবিল সঞ্চরণ থাকায় তাঁর নাটকে এই রসহানি ঘটেনি। রাজকৃষ্ণের নাটক তাই নামে মাত্র, আসলে সেগুলি যাত্রাধর্মী রচনা। মঞ্চাভিনয়ের দিকে তাকিয়ে রচিত তাঁর অধিকাংশ নাটকেই মতিলাল রায়ের যাত্রা-পালার ছাপ পড়েছে। একদিকে মনোমোহনের গীতাভিনয় এবং সমসাময়িক যাত্রা-পালা অন্যদিকে গিরিশচন্দ্রের মঞ্চাশ্রয়ী নাটকসমূহ—এই দুটি স্পষ্ট প্রভাব রাজকৃষ্ণের রচনাসমূহে একাত্ম হয়েছে।

অথচ মনোমোহনের চেয়ে অনেক বেশী নাটক লিখলেও তাঁর প্রতিভার কাছে রাজকৃষ্ণের রচনাগুলি নিষ্প্রভ। মনোমোহন সমকালীন দর্শকদের মনের আকাঙ্ক্ষার সন্ধান রাখতেন বলেই তাঁর নাটকে মানবিকতার একটি বহিরাঙ্গিক প্রকাশ ঘটেছিল। তাঁর পৌরাণিক চরিত্রগুলি ধূলিমলিন সংসারের সঙ্গে বিমিশ্রিত হয়ে যাওয়ায় সাধারণ দর্শকদের কাছে দেব এবং মানবচরিত্রের একটি সহজগ্রাহ্য রূপ জন্ম নেয়। রাজকৃষ্ণের নাটক রচনায়

আন্তরশক্তি যেমন ছিল না, তেমনি পৌরাণিক চরিত্রগুলিকে মানবিক করার দক্ষতাও ছিল না।

অপরদিকে গিরিশচন্দ্রের অধিকাংশ পৌরাণিক নাটকের বিশিষ্ট ভক্তিরসও রাজকৃষ্ণের নাটকে অনুপস্থিত। ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত রচিত গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকসমূহে ভক্তিরস সংযত পথ ধরে সঞ্চারিত, অবশ্য রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে পরিচয়ের পর এই ভক্তিরস আরও দুর্বার হয়ে ওঠে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের শুদ্ধ ভক্তি এবং গীতায় উক্ত নিষ্কাম ধর্ম গিরিশচন্দ্রের নাটকে নিঃসংশয়, দ্বিধাহীন, কামনাহীন অচলাভক্তির এক অবিমিশ্র প্রকাশ ঘটিয়েছে। রামকৃষ্ণের নাটকে দেবভক্তির যেসব রূপ অঙ্কিত হয়েছে তার জন্ম মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যগুলির পৃষ্ঠা থেকে। এজন্যই সাধারণ অশিক্ষিত বাঙালীও রাজকৃষ্ণের 'প্রহ্লাদ চরিত্র'র মত নাটককে গভীরভাবে ভালবেসেছিল।[৩১]

ভক্তিরসের ভারসাম্য স্থির রাখতে না পারলে পৌরাণিক লক্ষণাক্রান্ত নাটক ধীরে ধীরে যাত্রার পথে চলে যায়। এই বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের দক্ষতা রাজকৃষ্ণে ছিল না। রাজকৃষ্ণ ভুলে গিয়েছিলেন ভক্তিরস পৌরাণিক নাটকের একটি অঙ্গমাত্র, সমগ্র উপাদান নয়। এই সূত্রে ভীষ্মের শরশয্যা, তরণীসেন বধ, হরধনুর্ভঙ্গ প্রভৃতি নাটকের নাম করা যায়, অপরিমিত ভক্তিরসের প্লাবন এই নাটকগুলিকে পৌরাণিক নাটকের মর্যাদা থেকে বিচ্যুত করেছে।

এই উচ্ছ্বসিত ভক্তিরস প্রকাশের জন্যই রাজকৃষ্ণ তাঁর নাটকগুলিতে সঙ্গীতের যত্রতত্র ব্যবহার করেছেন। ফলে অধিকাংশ সঙ্গীতই নাট্যসংগীত না হয়ে ভক্তিসংগীতে পরিণত হয়েছে। সমবেত সংগীত ব্যবহার তাঁর প্রায় সব নাটকেই আছে। ভীষ্মের শরশয্যা নাটকে প্রজাগণের গান, দুর্বাসার পারণ-নাটকে ঋষিকন্যাগণের গান, প্রহ্লাদ চরিত্র ও গঙ্গামহিমা নাটকে

৩১. "এক প্রহ্লাদ-চরিত্র নাটকের অভিনয়ে লক্ষাধিক দর্শক সংখ্যা হইয়াছে এবং উক্ত থিয়েটার (বেঙ্গল থিয়েটার) কোম্পানী প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা উপার্জন করিয়াছেন।" (প্রথম অভিনয়ের এক বছর পর প্রকাশিত নাট্য-সংস্করণে নাট্যকার প্রদত্ত তথ্য)।
—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: রাজকৃষ্ণ রায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ৪র্থ খণ্ড, চৈত্র, ১৩৬১, পৃঃ ৪৩

দেবগণের গান, অনলে বিজলী এবং নরমেধ যজ্ঞ নাটকে অপ্সরাগণের গান, রামের বনবাস নাটকে গন্ধর্ব কন্যাগণের গান, বামনভিক্ষা নাটকে ঋষিবালকগণের গান, হরধনুর্ভঙ্গ এবং দশরথের মৃগয়া নাটকে সখীগণের গান, তারক সংহার নাটকে দেবসেনাগণের গান ইত্যাদি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। গিরিশচন্দ্রের নাটকে এই জাতীয় সমবেত সংগীতের ব্যবহার আছে এবং নাটকের স্বার্থে সেগুলির অধিকাংশই প্রযোজ্য। রাজকৃষ্ণ নাটকের ঘটনার সঙ্গে এই গানগুলির আত্মিক সংযোগ স্থাপন করতে পারেননি কেননা জনমনরঞ্জনই তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল।

মনোমোহন এবং গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলির কাহিনীতে করুণরসের দুর্মর প্রবাহ নাট্যপরিণতিতে মিলনাত্মক রূপ পরিগ্রহ করেছে। তৎকালীন জনগণের পৌরাণিক সংস্কার তাঁদের Tragic কাহিনীকে শুভ-শেষ করতে বাধ্য করত। রাজকৃষ্ণের নাটকগুলিও মিলনাত্মক পথ ধরে চলত, ফলে নাটকের শেষে এক একটি ক্রোড়-অঙ্ক যুক্ত হত। 'লক্ষপতি' নাটকের শেষে বৃন্দাবনধামের দৃশ্য, 'যদুবংশ ধ্বংস' নাটকের শেষে 'সিংহাসনে লক্ষ্মীর সহিত বিষ্ণু উপবিষ্ট' দৃশ্য এর উদাহরণ। গিরিশচন্দ্রের মত রাজকৃষ্ণের অধিকাংশ পৌরাণিক নাটকে সমাপ্তি সংগীত ব্যবহৃত।

সাহিত্যের নানা ধারায় হস্তক্ষেপ করার ফলে যেমন কোন ধারাতেই রাজকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেননি তেমনি নাট্যভাষার ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে শেষ পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট ভাষাদর্শও তিনি গড়ে তুলতে পারেননি। গিরিশচন্দ্র-প্রবর্তিত 'গৈরিশছন্দ' প্রচলিত হওয়ার পূর্বে ব্রজমোহন রায়ের 'দানববিজয়' পালা এবং রাজকৃষ্ণ রায়ের 'হরধনুর্ভঙ্গ' নাটকে ভাঙা-অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার ঘটেছিল। ব্রজমোহনের রচনায় গদ্যসংলাপ, সমিলপদ্য, মিত্রাক্ষর ছন্দ, ছড়া ইত্যাদি সবই ব্যবহৃত। গিরিশচন্দ্রের প্রথম পৌরাণিক নাটক 'রাবণ বধ' অভিনয়ের পূর্বেই বেঙ্গল থিয়েটারে রাজকৃষ্ণের 'হরধনুর্ভঙ্গ' অভিনীত হয়। এই গ্রন্থের ছন্দ সম্পর্কে ভূমিকায় রাজকৃষ্ণ লিখেছেন —

> দুই তিনজন সুদক্ষ অভিনেতার অনুরোধে পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যে এই 'হরধনুর্ভঙ্গ' নাটকখানি লিখিত হইল। তাঁহাদের অনুরোধ নাটকখানি গদ্যে না হইয়া পদ্যে হইলে ভাল হয়।...এই জন্য আমি ইহার অধিকাংশ

স্থলে ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের দিকেই অধিকতর মনোযোগ করিয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একপ্রকার অনুরোধ রক্ষা করিলাম।......

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের এই রূপান্তর সম্পর্কে তিনি ভূমিকায় আরও বলেছেন—

ইংল্যাণ্ডে কোন কোন অভিনেতৃ সম্প্রদায় সেক্ষপীর, বেন জনসন, অটওয়ে, ইয়ং প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ও কবিদিগের ছন্দোময় নাটকের ছন্দ এইরূপ অভিনায়িক ভাষা-ছন্দে পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছেন।...

হরধনুর্ভঙ্গ নাটকের ভাঙা-অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্যে গতি বজায় ছিল—

বহুদিন হতে দেব! মস্তক আমার
স্পর্শ করে নাই তব চরণযুগল
পাদ্য-অর্ঘ্য ধন্য মোর
ধন্য আমি আজ
তব পদে প্রণিপাত ঋষিকুলরাজ।

[প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য]

কিন্তু এই ছন্দ তাঁর মনে ধরেনি। অথচ গৈরিশ ছন্দের পদ্ধতিও তিনি সার্থকভাবে অনুসরণ করতে পারলেন না। ফলে 'রাজা বিক্রমাদিত্য' নামক রোমাণ্টিক পৌরাণিক নাটকে তিনি আর এক ছন্দরীতির ব্যবহার করলেন, নাম দিলেন 'পদ্য পৌঙ্‌ক্তিক ছন্দ'। নাট্যকারের ধারণা ছিল 'প্রচলিত ধরণের গদ্যাপেক্ষা এরূপ পদ্য-পৌঙ্‌ক্তিক ধরণে গদ্য নাটক লিখিলে অভিনয় ও অভিনেতৃবর্গের পক্ষে অনেকটা সুবিধা হইতে পারে।' যদিও রাজকৃষ্ণ দাবী করেছেন যে, এই ছন্দ বাংলা ভাষায় তিনিই প্রবর্তন করেছেন, কিন্তু এই ছন্দ একান্তই গৈরিশ ছন্দের অনুকরণ। শেষ পর্যন্ত তিনি সরাসরি গৈরিশছন্দে নাটক রচনা করেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের ভাষা-প্রতিভা তাঁর কলমে না থাকায় শেষ পর্যন্ত রাজকৃষ্ণ গদ্য ভাষাতেই নাটক লেখেন। এই নির্দিষ্ট (standard) ভাষাদর্শ না থাকাও তাঁর পৌরাণিক নাট্যরচনায় ব্যর্থতার অন্যতম কারণ।

রাজকৃষ্ণ তাঁর পুরাণ বিষয়ক নাটকগুলিকে 'পৌরাণিক নাটক' হিসেবে চিহ্নিত না করে নাম দিয়েছেন 'পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক'। এই

পর্যায়ের নাটকগুলির মধ্যে রয়েছে 'অনলে বিজলী' (১৮৭৮), তারক সংহার (১৮৮০), হরধনুর্ভঙ্গ (১৮৮২), দশরথের মৃগয়া বা বালকসিন্ধু বধ (১৮৮৫), রামের বনবাস (১৮৮২), যদুবংশ ধ্বংস (১৮৮৪), তরণীসেন বধ (১৮৮৪), প্রহ্লাদ চরিত্র (১৮৮৪), প্রহ্লাদ-মহিমা (১৮৯১), নরমেধ যজ্ঞ (১৮৯১), বামন ভিক্ষা, দুর্বাশার পারণ, ভীষ্মের শরশয্যা, গিরি-গোবর্ধন, গঙ্গামহিমা এবং লক্ষপতি। 'অনলে বিজলী' রচনার পূর্বে 'সাবিত্রী সত্যবানে'র অতিপ্রচলিত কাহিনী নিয়ে একটি নাটক রচনার প্রচেষ্টা রাজকৃষ্ণ করেছিলেন, কিন্তু প্রচণ্ড গীতিরস এটিকে নাটক হতে দেয়নি।

'অনলে বিজলী' নাটকের আঙ্গিককে ভালভাবেই অনুসরণ করেছে। রামায়ণের শেষাংশ অর্থাৎ সীতার অগ্নিপরীক্ষার মর্মন্তুদ কাহিনীই এই নাটকের উপজীব্য। কিন্তু নাট্যকারের কাহিনী সংক্ষেপের ফলে অপ্রাসঙ্গিক বক্তৃতা এবং বিষয় অবাঞ্ছিতভাবে নাটকে স্থান অধিকার করেছে বলেই নাটক হিসাবে এটি সফল হতে পারেনি। দীর্ঘ সংলাপও নাটকটির অন্যতম ত্রুটি।

আগাগোড়া গদ্য সংলাপে রচিত 'তারক সংহার' নাটকটি একটানা বৈচিত্র্যহীনতায় ক্লান্তিকর। ছয় অঙ্কে সমাপ্ত এই দীর্ঘ নাটকটিতে ঘটনার বাহুল্য নাটকের মূল কাহিনীকে বিশৃঙ্খল করে দিয়েছে। অকারণে স্বগতোক্তির ব্যবহারও নাটকটির ব্যর্থতার কারণ।

ভক্তিরস বল্গাহীন হয়ে রাজকৃষ্ণের নাটককে কি পরিমাণে দুর্বল করে দিয়েছে তার পরিচয় 'তরণীসেন বধ' নাটকটি। কৃত্তিবাসী রামায়ণকে অনুসরণ করতে গিয়ে রাজকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রের মত সংযম রাখতে পারেননি। তরণীর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল রামের হাতে নিহত হয়ে মোক্ষ লাভ করবে। রামচন্দ্র জানেন তরণী তাঁর ভক্ত, মিত্র-বিভীষণের পুত্র। দৈববাণী শুনে রামের ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ এবং তরণীর মৃত্যু নাট্যকার অত্যন্ত সরল ভঙ্গিতে বিবৃত করেছেন। রাম চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তুললে এটি একটি সার্থক পৌরাণিক নাটক হতে পারত। রাজকৃষ্ণ মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ', মতিলাল রায়ের 'রাবণ বধ' এবং গিরিশচন্দ্রের 'রাবণ বধে'র সঙ্গে পরিচিত থেকেও তাঁদের কাব্য ও নাটকের সমপর্যায়ে উঠতে পারেননি।

রাম কথাশ্রয়ী তিনটি নাটক 'দশরথের মৃগয়া', 'হরধনুর্ভঙ্গ' এবং রামের

বনবাস' রাজকৃষ্ণ পর পর রচনা করেন। ইতিপূর্বে বাল্মীকি রামায়ণ অনুবাদের সময়ই তাঁর মনে এই জাতীয় নাটক রচনার ইচ্ছা জেগেছিল। এই নাট্যত্রয়ীর মধ্যে হরধনুর্ভঙ্গ মিলনাস্তক, অপর দুটি বিয়োগাস্তক।

'দশরথের মৃগয়া' নাটকটি আদ্যন্ত করুণ রসসিক্ত—সিন্ধু, সিন্ধু-পিতা, সিন্ধু-মাতা এবং দশরথ—সকলেই বেদনার অতলান্ত সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছেন। নাট্যকার পরিণতি-রসটিকে রঙ্গমঞ্চের তাগিদে মিলনাস্তক করেননি, এ তাঁর দুঃসাহস বলতে হয়। রামায়ণের কাহিনী নিয়ে নাটক লিখতে গিয়ে গিরিশচন্দ্র প্রমুখরা কৃত্তিবাসকেই আদর্শ করেছিলেন, কিন্তু রাজকৃষ্ণের আদর্শ বাল্মীকির রামায়ণ।

'হরধনুর্ভঙ্গ' নাটকের রামচন্দ্র পূর্ণব্রহ্ম। বিশ্বামিত্র, গৌতম, অহল্যা, জনক থেকে শুরু করে রাবণ পর্যন্ত সকল চরিত্রই রামচন্দ্রের এই রূপটি চেনেন। মোটামুটি কৃত্তিবাসী রামায়ণকে আদর্শ করলেও কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি মৌলিক কল্পনারও প্রয়োগ করেছেন। যেমন সীতা বিবাহের আগেই তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের কথা জানতে পেরেছেন, জনকের সভায় রাবণ ও বালীর আগমন ও পরাজয় বর্ণিত। এসব ঘটনা পুরাণে নেই।

পৌরাণিক নাটকেও যে Surprise সৃষ্টির প্রয়োজন আছে 'রামের বনবাস' রচনার সময় রাজকৃষ্ণ হয়ত তা মনে রাখেননি। তাই নাটকের শুরুতেই তিনি জানিয়ে রেখেছেন রামচন্দ্র আর কেউ নন স্বয়ং ভগবান, সীতা স্বভাবতঃই কমলা। বারংবার সংলাপের মধ্য দিয়ে তিনি উভয় চরিত্রের দেবত্বের কথা উল্লেখ করেছেন।

'রামের বনবাস' করুণ রসাত্মক নাটক। বাল্মীকি রামায়ণের এই করুণ রস মনোমোহনে যতটা উপস্থিত গিরিশচন্দ্রে ততটা নয়। এ বিষয়ে রাজকৃষ্ণ মনোমোহন-অনুসারী। তবে এ নাটক আঙ্গিক সফল হয়ে উঠতে পারেনি। বারংবার পতনজনিত মূর্ছা, ভাঙা-অমিত্রাক্ষর ও সমিল গদ্যে রচিত দীর্ঘ সংলাপ এবং সঙ্গীত বাহুল্য বড় বেশী চোখে পড়ে। ছড়ার রীতিতে রচিত কথোপকথনে যাত্রা-রীতি লক্ষ্য করা যায়—

মন্থরা । ওরে ও মিন্সে গুনো, এ গুনো কি ?

১ম ভৃত্য । কিছু না—কিছু না।

মন্থরা। আমি কি কাণা ?
বল্, বোল্‌চি, দেখা বস্তা খুলে,
নৈলে, গাল দেবো বাবা তুলে।
২য় ভৃত্য। কুঁজ ভাঙ্‌বো এক কিলে।
মন্থরা। কি বল্‌লি রে ড্যাকরা ছোঁড়া,
উন পাঁজুরে ঘাটের মড়া ?
এত বড় তোর বুকের ছাতি ?
মুখ ভাঙ্‌বো মেরে নাতি। [২/১]

'প্রহ্লাদ চরিত্র' রাজকৃষ্ণ রায়ের পৌরাণিক নাটকগুলির ভিতর উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এই চরিত্রটি আশ্রয় করে গিরিশচন্দ্র ছাড়াও মহেশচন্দ্র দাস দে, হরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখরা নাটক ও যাত্রা-পালা লিখে-ছিলেন। রাজকৃষ্ণ নাটক হিসাবে 'প্রহ্লাদ চরিত্র'কে উচ্চাঙ্গের বলে দাবী করেননি। প্রকৃতপক্ষে এই নাটকের ভক্তিস্রোতই জনপ্রিয়তার মূল কারণ। হিরণ্যকশিপুবধ পর্যন্ত নাট্যকাহিনী বিস্তৃত। প্রহ্লাদ-জীবনীর দ্বিতীয় অংশ নিয়ে 'প্রহ্লাদ-মহিমা' নামে তিনি আর একটি নাটক লেখেন।

প্রহ্লাদ চরিত্র নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয় বিষ্ণুর বিরুদ্ধে হিরণ্যকশিপুর আক্রোশ এবং তার প্রতিফল। কিন্তু হিরণ্যকশিপুর এই ক্রোধের কারণ উল্লিখিত না হওয়ায় চরিত্রটি দর্শকের সামান্যতম সহানুভূতি থেকেও বঞ্চিত থাকে। অপরদিকে আজন্ম কৃষ্ণ-উন্মাদ প্রহ্লাদ চরিত্রও নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অপরিবর্তিত। গিরিশচন্দ্রের নাটকের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সুর এই নাটকে প্রহ্লাদের হরিগুণকীর্তনের মধ্যে ধ্বনিত।

গিরিশচন্দ্রের নাটকে প্রহ্লাদ-মাতা কয়াধু দ্বন্দ্ব-হীনা চরিত্র। রাজকৃষ্ণ-সৃষ্ট হরি-প্রিয় প্রহ্লাদ এবং হরি-বিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর মধ্যবর্তিনী এই নারী অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে নাটকের দাবী মিটিয়েছে।

'প্রহ্লাদ-মহিমা' নাটকটি 'প্রহ্লাদ চরিত্র' নাটকের উপসংহার বলা যায়। প্রহ্লাদ সিংহাসনের হাতছানি উপেক্ষা করেছে, কয়াধু এবং গুরুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে—অন্ধকার পথে একা বার হয়েছে হরিনাম প্রচারে। অতঃপর দস্যুহাতে পতন এবং তা থেকে উদ্ধারের কাহিনী নাটকে আনুপূর্বিক

বর্ণনা করা হয়েছে। হরিভক্তি প্রচারই যে এই নাটকের উদ্দেশ্য তা দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের মুখে হরিনাম উচ্চারণ থেকেই প্রতীয়মান হয়। অলৌকিকতা নাটকটির রসভূমিকে বিপর্যস্ত করেছে।

মহাভারতীয় কাহিনীকে পটভূমিকায় রেখে রাজকৃষ্ণ রায় লেখেন 'দুর্বাসার পারণ'। বনবাসী যুধিষ্ঠিরের কাছে দুর্বাসার শিষ্যসহ অতিথি হওয়াই এই নাটকের কেন্দ্রীয় ঘটনা। নাট্যকার কাহিনীর মধ্যে নিজস্ব ভাবকে ইচ্ছামত সঞ্চারিত করেছেন। তবে ভক্তিরস কাহিনীর গতিপথকে অন্যান্য নাটকের মত রুদ্ধ করেনি।

'দুর্বাসার পারণ' নাটকে হাস্যরস কখনও কখনও গ্রাম্যতায় পরিণত হয়েছে। গিরিশচন্দ্রের মত রাজকৃষ্ণের এই নাটকে হাস্যরস সৃষ্টির উৎস বিদুষক। কিন্তু বিদুষক চরিত্রের সরলতা এবং সরসতার আড়ালে যে ভক্তিআর্দ্র রূপটি সচরাচর গিরিশচন্দ্রের নাটকে সুলভ, এ নাটকে তা নেই। আঙ্গিকের দিক থেকে নাটকটিতে ত্রুটি আছে। ঘটনাসজ্জায় অসংলগ্নতা সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি। কথকের সুরে সংলাপ-সৃষ্টি নাটকের গতি ক্ষুণ্ণ করেছে—

দ্রৌপদী। (কথকের সুরে)

হরি, অকূল পাথারে ডুবেছি হে।
আজ, তুমি বই আর উপায় নাই,
তোমার চরণ-তরী বিনে—দয়াল হরি,—
এ বিপদ সাগর কিসে হব পার ?
আজ ভাগ্যদোষে ঋষি দুর্বাশার রোষে
তোমার ভক্ত পাণ্ডবেরা ভস্মীভূত হয়।···

'ভীষ্মের শরশয্যা' নাটকটির কাহিনীর সূচনা কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের উদ্যোগ এবং শ্রীকৃষ্ণের সন্ধি-প্রয়াস থেকে। এর পর একে একে বিদুরের ক্ষুদভক্ষণ, কর্ণ-কুন্তী সংবাদ, অর্জুনের ভগবতী স্তব এবং শ্রীকৃষ্ণের গীতা-বর্ণন—যুদ্ধ শুরু—ভীষ্মের পাণ্ডব-নিধন প্রতিজ্ঞা, অর্জুন কর্তৃক ভীষ্মের নিকট থেকে পাণ্ডবের মৃত্যুবাণ গ্রহণ ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। নাটকটির নামকরণের সঙ্গে কাহিনীর সঙ্গতিহীনতা এভাবেই ঘটেছে। নাটকের প্রতি রাজকৃষ্ণের ঔদাসীন্যই এর কারণ।

চরিত্রসৃষ্টির দিকেও রাজকৃষ্ণের সতর্ক দৃষ্টি ছিল এমন বলা যায় না। তাঁর সৃষ্ট অর্জুন চরিত্রে মূল মহাভারতের অর্জুনের বীরত্ব অনুপস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বিদুরের ভিক্ষার ঝুলি থেকে ক্ষুদ চুরি করে খাওয়া দেব চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি-সম্পন্ন নয়। মহাভারতের কর্ণ কখনই মাতা কুন্তী এবং ভ্রাতা পঞ্চপাণ্ডবের স্নেহ ও ভালবাসার জন্য কাঙাল নন—যেমনটি রাজকৃষ্ণ-সৃষ্ট কর্ণ চরিত্রে দেখা যায়। অন্যান্য চরিত্রের প্রাধান্যের ফলে প্রধান চরিত্র ভীষ্ম অপূর্ণ থেকে গেছেন। তাঁর চরিত্রের ত্যাগ এবং অটল প্রতিজ্ঞারক্ষার মহিমা প্রকাশের জন্য নাট্যকার বেশী পৃষ্ঠা ব্যয় করতে পারেননি। গিরিশচন্দ্র ভীষ্ম চরিত্রকে নিয়ে পৃথক কোন নাটক লেখেননি, কিন্তু ত্রুটি সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলালের ভীষ্ম অনেক বেশী উজ্জ্বল। বিদুর-পত্নী পদ্মাবতীর উপস্থিতি নাটকের পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল। যাত্রার বিবেকের অনুরূপ গান 'ভীষ্মের শরশয্যা' নাটকে দেখা যায়—

"মানুষ ত' আর কিছুই নয়
জলের তিলক বালির বুকে।
এই আছে এই নেইকো আবার
শুকিয়ে যায় এক পলকে।..ইত্যাদি

বিদুরের মুখে কীর্তনের সুরে সংলাপও শোনা যায়:

ধরা তো সামান্য, বাঁধিব তোমারে,
চোর চূড়ামণি তুমি।
আজ ভকতি ডোরে বাঁধিব তোমারে,
ছেড়ে দিব না—ছেড়ে দিব না,
চোরে না বাঁধিলে পরে
ঐ রাঙা চরণ আর পাব না।

[২/৫]

প্রখর ভক্তিবাদ নিয়ে পৌরাণিক নাটক রচনা করতে গিয়ে অস্বাভাবিকতা এবং অলৌকিকতাকে রাজকৃষ্ণ এত বেশী প্রাধান্য দিয়েছিলেন যে স্বাভাবিক-ভাবেই পুষ্ট কাহিনী থাকা সত্ত্বেও একাধিক নাটক ব্যর্থ হয়েছে। এইরূপ নাটকের মধ্যে 'শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা', 'প্রমদ্বরা', 'লক্ষপতি' ও 'গিরিগোবর্ধনে'র নাম সহজেই করা যায়। অলৌকিক দৃশ্যপ্রয়োগ, অনুভূতিহীনতা, অলৌকিক

চরিত্র ব্যবহার ইত্যাদির ফলে রচনাগুলি পৌরাণিক নাটকের গুণবর্জিত হয়ে পড়েছে।

যে কটি পৌরাণিক নাটকে রাজকৃষ্ণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন 'নরমেধ যজ্ঞ' তার একটি। অথচ নাট্যকর্ম হিসাবে এটি সর্বাঙ্গসুন্দর নয়। যযাতি চরিত্রের মানস-অস্থিরতা ফুটিয়ে তোলার সহজ সুযোগ নাট্যকার গ্রহণ করতে পারেননি। এ নাটকের কুসীদজীবী চরিত্রটি অত্যন্ত জীবন্ত হওয়ার কারণ এইরূপ চরিত্র ব্যক্তিগত জীবনে নাট্যকার নিজে দেখেছেন।

'নরমেধযজ্ঞ' সঙ্গীত-মুখর নাটক। পৌরাণিক নাটকে প্রায়শঃই নারদের গান থাকে, এ নাটকেও আছে। নাট্যকার ভক্তিভাব এবং কারুণ্যরস সৃষ্টির জন্যও গানের আশ্রয় নিয়েছেন। একাধিক স্থানে সংলাপের স্থান গ্রহণ করেছে গান। অর্জুন, জনার্দন থেকে কুসীদজীবীর মাতা পর্যন্ত সকলেই গান গেয়েছেন।

গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক সংস্কারযুক্ত ভক্তিমূলক এবং বৈরাগ্যমূলক নাটক লিখে প্রভূত জনখ্যাতি পেয়েছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁর দ্বারা উৎসাহিত হয়ে রাজকৃষ্ণ লেখেন হরিদাস ঠাকুর (১২৯৫ সাল), মীরাবাঈ (১২৯৬ সাল), চন্দ্রহাস (১২৯৫ সাল) প্রভৃতি নাটক। এই নাটকগুলিতে হরিভক্তির বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস থাকলেও পৌরাণিক আবহাওয়া রক্ষিত হয়নি। ঐতিহাসিক তথ্য থাকা সত্ত্বেও নাট্যকার জনশ্রুতি এবং কিংবদন্তীকে আশ্রয় করে নাটকগুলি রচনা করায় পৌরাণিক নাট্যাদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সেকারণে গিরিশচন্দ্রের সমশ্রেণীর নাটকগুলি বহু পরিচিত, কিন্তু রাজকৃষ্ণের এই নাটকগুলি প্রায় অনাদৃত।

অমৃতলাল বসু ॥

গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িক অমৃতলাল বসুও (১৮৫৩-১৯২৯) গিরিশচন্দ্রের মত আগে নট পরে নাট্যকার। অভিনেতা রূপে তাঁর উপর গিরিশচন্দ্রের প্রভাব পড়লেও নাট্যকার হিসেবে তিনি স্বতন্ত্র দ্বীপের অধিবাসী ছিলেন। 'রসরাজ' অমৃতলাল ১২৮৩ থেকে ১৩০৭ বঙ্গাব্দের মধ্যে কয়েকটি প্রহসন লিখে তৎকালীন দর্শকচিত্তে সাড়া জাগালেও তাঁর চিন্তাধারা সেকালের বাঙালীর আধ্যাত্মিক ও সামাজিক-চিন্তার সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি। পৌরাণিক

নাটক রচনার জন্য যে ভাববোধ থাকা প্রয়োজন তা তাঁর ছিল না। নাটক রচনার মধ্যাহ্ন এবং অপরাহ্ন যুগে তিনি দুটি পৌরাণিক নাটক লেখেন, হরিশ্চন্দ্র (১৮৯৯) এবং যাজ্ঞসেনী (১৯১৮)। ঐ দুটি নাটকেই পুরাণের যুগ-পরিবেশ লঙ্ঘন করায় 'কালাতিক্রমণে'র দোষ দেখা দিয়েছে।

হরিশ্চন্দ্রের সুপরিচিত কাহিনীকে নিয়ে রচিত ক্ষেমীশ্বরের 'চণ্ডকৌশিক' নাটকের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ ছাড়াও মনোমোহন বসুর 'হরিশ্চন্দ্র নাটক' এবং পার্বতীচরণ তর্করত্নের 'হরিশ্চন্দ্র চরিত নাটক' অমৃতলালের 'হরিশ্চন্দ্র' নাটক রচনার পূর্বেই রচিত। কাহিনীর ক্ষেত্রে যেমন তিনি নূতন কিছুই বলেননি, তেমনি দৃশ্যসংস্থাপনের ক্ষেত্রেও তাঁর মৌলিকতা চোখে পড়ে না। পূর্বের নাটকগুলিতে হরিশ্চন্দ্র চরিত্রের যে দার্ঢ্য চোখে পড়ে, আলোচ্য নাটকে তা অনুপস্থিত। রোহিতাশ্ব চরিত্রটি তার অবালকোচিত ব্যবহারের জন্য দর্শকের সহানুভূতি-বঞ্চিত।

'যাজ্ঞসেনী' নামকরণ হলেও নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র দ্রৌপদী নয়। কৌরব এবং পাণ্ডবদের মূল সংঘর্ষ-কাহিনীই নাটকটির প্রতিপাদ্য বিষয়। ভীম এবং শকুনি চরিত্রই নাট্যকারের সহানুভূতিতে প্রস্ফুট। নাট্যকার দ্রৌপদী চরিত্রকে আগাগোড়া দ্বন্দ্বহীন রেখেছেন। কোন নাট্যিক কৌশলও দেখা যায়না। অমৃতলাল তাঁর জীবনের এই শেষ রচনাটিতেও নাট্যরচনার মূল দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

অমৃতলালের অধিকাংশ নাটকই সঙ্গীত-প্রধান। পৌরাণিক নাটকে সংগীত ব্যবহার একটি চলিত রীতি। কিন্তু তাঁর পৌরাণিক নাটকে গান খুবই কম।

অতুলকৃষ্ণ মিত্র ॥

অতুলকৃষ্ণ মিত্র (১৮৫৭-১৯১২) রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে নাটক রচনার সূচনা থেকেই জড়িত ছিলেন। 'অবৈতনিক নাট্য সমাজ' 'গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার, 'এমারেল্ড থিয়েটার' ছাড়াও অন্যান্য রঙ্গমঞ্চে তাঁর নাটকগুলির নিয়মিত অভিনয় হত। চরিতমূলক নাটক, প্রহসন, গীতিনাট্য ইত্যাদি লিখলেও তাঁর অধিকাংশ নাটকই পৌরাণিক। সেযুগে গিরিশচন্দ্রের প্রভাব থেকে কোন নাট্যকারই দূরে থাকতে পারেননি, অতুলকৃষ্ণও নয়। তাঁর পৌরাণিক

নাটকগুলির মধ্যে 'আদর্শ সতী' (১৮৭৬), 'নন্দবিদায়' (১৮৮৮), 'মা' (১৮৯৪), 'ভীষ্মের শরশয্যা' (১৮৮৫), 'নিত্যলীলা বা উদ্ধব সংবাদ' মোটামুটি আলোচনার অপেক্ষা রাখে। অন্যান্য পুরাণাশ্রয়ী রচনাগুলি গীতনাট্য পর্যায়ে পড়ে।

সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনী নিয়ে অতুলকৃষ্ণের পূর্বেই কালীপ্রসন্ন সিংহ, কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায় প্রমুখ নাট্যকারগণ নাটক লিখেছিলেন। অতুলকৃষ্ণের 'আদর্শ সতী' কাহিনী চরিত্র এবং রসের দিক থেকে নূতন কোন বৈশিষ্ট্য আনেনি। এই প্রথম নাটকটি গীতিভারাক্রান্ত বলেই নাট্যকার সম্ভবতঃ এটিকে 'গীতিনাট্য' বলতে চেয়েছেন।

মধ্যযুগের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য বাঙালীর পুরাণ। এই কাব্যের কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনী নিয়ে অতুলকৃষ্ণ 'মা' (পরে নামকরণ করেন 'ফুল্লরা') নাটকটি লেখেন। পূর্ববর্তী নাটক 'নন্দ বিদায়'-এর মত 'মা' নাটকেও গিরিশচন্দ্রের প্রভাব স্পষ্ট। 'নন্দবিদায়ে' গান ছিল ত্রিশটির বেশী, 'মা' নাটকেও কালকেতু, ফুল্লরা, চণ্ডী, ব্যাধরমণীগণ, সাধনা প্রভৃতি সকলেই গান গেয়েছেন। এমন কি সংলাপের রীতিতেও গান ব্যবহৃত হয়েছে—

কালকেতু—...(হায়) হুতাশে আকুল হেরিনে মা কূল
অকূল পাথারে পড়েছি।
চণ্ডী—... (কেন) চিনে চিনিলি না, মা বলে এলি না
সন্তানের ডাকে কবে কবি ঘৃণা
না এসে থাকিতে পেরেছি ?...

'মা' নাটকে চরিত্র সৃষ্টিতে যে সাফল্য নাট্যকার দেখিয়েছিলেন পরবর্তী 'প্রভাসযজ্ঞ' নাটক রচনায় তা রক্ষা করতে পারেননি। এই একই বিষয় নিয়ে গিরিশচন্দ্র মঞ্চসফল নাটক লেখেন পরবর্তীকালে। বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলাকে অনুসরণ করে অতুলকৃষ্ণ লেখেন 'নিত্যলীলা বা উদ্ধব সংবাদ'। এই নাটকটিও অত্যধিক উচ্ছ্বাস এবং নাট্যগুণের অভাবে সফল হতে পারেনি।

অতুলকৃষ্ণ মিত্র রচিত 'ভীষ্মের শরশয্যা' পৌরাণিক নাটকটি রাজকৃষ্ণ রায়ের একই নামে রচিত নাটকের পূর্বে লেখা। রাজকৃষ্ণের নাটকের দীর্ঘ কাহিনী বিস্তারের ত্রুটি এ নাটকে নেই। কিন্তু যুদ্ধপর্বের নাট্যময় ঘটনাকে

একটি অখণ্ড সূত্রে যুক্ত করতে অতুলকৃষ্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। কাহিনীর এই ঐক্যবিচ্যুতি না ঘটলে এটি উচ্চাঙ্গের নাটক হতে পারত। মহাভারতের ভীষ্ম বীর এবং মহৎ। অতুলকৃষ্ণ তাঁর ভীষ্ম চরিত্রে এই দ্বৈতগুণের প্রকাশে সক্ষম হননি। অন্যান্য নাটকের মত এই নাটকেও গান আছে। নাটকের সমাপ্তি সংগীত আছে ভাগীরথীর কণ্ঠে। মতিলাল রায়ের 'ভীষ্মের শরশয্যা' যাত্রাপালায় গঙ্গার বিলাপাত্মক সঙ্গীত "মরি রে মরি প্রাণকুমার, এ দশা তোমারে কে করিল রে" ইত্যাদির সঙ্গে অতুলকৃষ্ণের নাটকের ভাগীরথীর বিলাপাত্মক সঙ্গীতের বেশ মিল আছে। ভাগীরথীর গানটি সুন্দর—

কোথা যাবি বাপ রে আমার।
কোথা ফেলে পালাবি রে,
অঞ্চলের নিধি বিধবার।
ওরে তোরে হারা হয়ে যাদু
মুখ চেয়ে রব আর কার॥...

পৌরাণিক নাটক রচনায় অতুলকৃষ্ণ স্বয়ংসৃষ্ট কোন ভাষা ব্যবহার করেননি। মাইকেল মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর, গিরিশচন্দ্রের গৈরিশ ছন্দের অনুসরণের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ গদ্যের আদর্শকে গ্রহণ করলেও তার যথাযথ ব্যবহার করতে সক্ষম হননি।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়॥

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের রসসাগর মন্থিত করে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) কবি-মানস ও নাট্যমানস গড়ে উঠেছিল। সমকালীন সমাজ জীবনের ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন এক মহা ইতিহাস। গীতিপ্রবণ কল্পনার সঙ্গে ধ্রুপদী প্রত্যয় যুক্ত হয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিমানসটি গঠিত হয়েছিল, আর তারই ফলে পুরাণ, ইতিহাস এবং সমাজের সঙ্গে তাঁর সহজ সম্পর্ক-স্থাপনও সম্ভব হয়। গিরিশচন্দ্রের নাট্য-প্রতিভার উত্তর-মধ্যাহ্ন-যুগে কবি দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যকার হিসাবে বাংলা সাহিত্যে অনুপ্রবেশ। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম প্রহসন 'সমাজ-বিভ্রাট ও কল্কি-অবতার' (১৮৯৫) রচনার পূর্বেই গিরিশচন্দ্রের দু'একটি বাদে সমস্ত পৌরাণিক নাটকই প্রকাশিত ও অভিনীত হয়, সামাজিক নাটকও রচিত

হয়—এককথায় ঐতিহাসিক নাটক ব্যতীত নাট্যসাহিত্যের অপরাপর ধারায় গিরিশচন্দ্র তখন অনন্য-প্রতিভা। দ্বিজেন্দ্রলাল বুঝেছিলেন গিরিশচন্দ্রের নাট্যকর্মে একমাত্র প্রহসনের ধারাটিই অপূর্ণ, সেজন্য শুরুতেই তিনি একে একে প্রহসন লিখতে শুরু করেন। ঐতিহাসিক নাটকের রচনায় উভয় নাট্যকারই পাশাপাশি এগিয়েছিলেন। সামাজিক নাট্যরচনায় গিরিশ-অনুসারী হতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল অসার্থক। পৌরাণিক নাট্যকাব্য রচনায় তিনি যে রীতি এবং আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন তা গিরিশচন্দ্রের রচনা থেকে পৃথক।

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর পুরাণ-নির্ভর নাট্যরচনাগুলিকে 'পৌরাণিক নাটক' বলে দাবী করেননি, নাম দিয়েছেন 'গীতিনাটিকা'। ঊনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ পৌরাণিক কাব্য এবং নাটকের মত দ্বিজেন্দ্রলালের তিনটি পুরাণ-নির্ভর রচনারও (পাষাণী, সীতা, ভীষ্ম) আদর্শ হল রামায়ণ ও মহাভারত। কিন্তু মনোমোহন, রাজকৃষ্ণ, ব্রজমোহন, গিরিশচন্দ্র অথবা অতুলকৃষ্ণের মত ভক্তি-আচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি পৌরাণিক নাট্যকাব্যগুলি রচনা করেননি। এ সম্পর্কে তাঁর জীবনীকার বলেছেন—"তিনি তার্কিক ও যুক্তিবাদী। কিন্তু তর্কের ত' কোনও মীমাংসা নাই। তিনি জগতের প্রত্যেক বিষয়ই তর্কের দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিতেন; সুতরাং তর্কের অন্ত না পাইয়া, স্বতঃই অনেক স্থলে সন্দেহবাদী হইয়া পড়িয়াছেন।... তাঁহার কবিতায় দেখা যায়—তিনি স্বর্গ, নরক, ঈশ্বর, দেবদেবী সম্বন্ধে বস্তুত বড় বেশী আস্থাশীল ছিলেন না। ভাল-মন্দ যাহা কিছু—তিনি প্রত্যক্ষের ভিতর দিয়া দেখিতেন; এবং তিনি প্রধানতঃ পুরুষকার ও নীতি মানিতেন।"[৩৩] 'কল্কি-অবতার' প্রহসনের দেব-চরিত্র এবং 'মন্দ্র' কাব্যের 'রাধার প্রতি কৃষ্ণ' কবিতাটি পড়লেই বোঝা যায় দেব-চরিত্রে মানবরস আরোপের প্রতিই তাঁর অধিক লক্ষ্য ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সুদীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় শতাব্দীর প্রথমার্ধে খ্রীষ্ট ও ব্রাহ্মধর্মের প্রসারে হিন্দুধর্মের সনাতন তরঙ্গে তুষারের স্তব্ধতা, দ্বিতীয়ার্ধে, সত্তরের দশকে ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে ভাঙনের ফলে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটে। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে পরমহংসদেবের সাক্ষাৎকার হিন্দুধর্মের গতিকে ত্বরান্বিত করল। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের

৩৩. দেবকুমার রায়চৌধুরী : দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ৬৬৪-৬৫

'নবজীবন' (১২৯১, শ্রাবণ) এবং রাখালচন্দ্রের 'প্রচার' (১২৯১, ১৫ই শ্রাবণ) পত্রিকা দুটি বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুধর্ম-প্রীতির সমর্থনে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'সঞ্জীবনী' এবং গোঁড়া হিন্দুসমাজের মুখপত্র 'বঙ্গবাসী' উভয়ের বিরুদ্ধে তর্কে লিপ্ত হল। এ সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বাদানুবাদ সকলেই জানতেন।[৩৪] শশধর তর্কচূড়ামণি, চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখের যুক্তিহীন, সামঞ্জস্যহীন ধর্মব্যাখ্যা হাস্যকর পর্যায়ে পৌঁছেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের সমকালেই এ সকল ঘটনা ঘটেছিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল সকল বিষয়ই যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করতেন। পৌরাণিক নাটক রচনায় এই যুক্তিবাদী মনটিকে সম্পূর্ণে দূরে সরিয়ে রাখতে হয়, অন্যথায় পুরাণের বিশ্বাস, অলৌকিকতা ইত্যাদিকে নাটকে রূপ দেওয়া সম্ভব হয় না। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর ঐতিহাসিক নাটক রচনার সময় ভাববাদের রাশটিকে যতটুকু আল্গা করেছিলেন পৌরাণিক নাটক রচনার সময় সেটুকু করলেই চলত। কিন্তু ব্যক্তিজীবনে হিন্দুধর্ম এবং সংস্কারের বিকৃত স্বরূপটিই বেশী দেখেছিলেন, আহতও হয়েছিলেন। 'একঘরে' প্রহসনে হিন্দুসমাজের প্রতি তিনি আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। পৌরাণিক নাটক রচনার সময়ও সেই মনোভাব তাঁর মন থেকে বিদূরিত হয়নি। এই ভিন্ন-কোটিক মনোভাবজাত তাঁর পুরাণ-বিষয়ক নাটকগুলিতে তাই ভক্তিরসের কোন পরিচয় নেই। ক্ষীরোদপ্রসাদও তাঁর নাটকে পৌরাণিক চরিত্রে মানবিকতা আরোপ করেছেন, কিন্তু ভক্তিরসের প্রাথমিক সর্তটি পালন করায় তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলি অনেক বেশী সার্থক হয়েছে।

পুরাণের কাহিনীকে দ্বিজেন্দ্রলাল একটি মানবিক দৃষ্টি দিয়ে বিচার করতে চেয়েছিলেন। 'হাসির গান'-এ রাম-বনবাস, দুর্বাসা, কৃষ্ণ-রাধিকা সংবাদ ইত্যাদি গানে পুরাণের সিদ্ধরস উপেক্ষিত, চরিত্রগুলি একালের কামনা-বাসনায় রক্তিম। রামের বনবাস যাত্রার করুণ পরিবেশ দ্বিজেন্দ্রলাল হাসির হালকা হাওয়ায় বিলীন করে দিয়েছেন—

যদি নিতান্ত যাইবি বনে, সঙ্গে নে সীতা লক্ষ্মণে,
ভালো এক জোড়া পাশা, আর (ঐ) ভালো দু জোড় তাস।
ও কি হেরি সর্বনাশ।......
(রাম-বনবাস)

৩৪. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়: রবীন্দ্র জীবনী, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৫৭-৫৯

বৈষ্ণবদের পরম আরাধ্য রাধা-কৃষ্ণের সংলাপে দ্বিজেন্দ্রলাল সচেতনভাবেই কালাতিক্রমণ করেছেন—

কৃষ্ণ বলে "এমন বর্ণ দেখিনি ত কভু"
আর—রাধা বলে "হাঁ আজ সাবান মাখি নি ত তবু—
নইলে আরও শাদা।"
(কৃষ্ণ-রাধিকা সংবাদ)

'পাষাণী' নাটক বার হওয়ার দু' বছর পরে কবির 'মন্দ্র' কাব্যের প্রকাশ। এ কাব্যে "রাধার প্রতি কৃষ্ণ' কবিতায় কবি পুরাণের মানবিক মূল্য নিরূপণ করেছেন। এই কবিতায় কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠেশ্বর কৃষ্ণ নন, রাধা মহাভাবস্বরূপিনী রাধা নন। কৃষ্ণের প্রেম পুরাণের অলৌকিক, আধ্যাত্মিক জগতের মায়ালোক ছেড়ে এসে প্রবেশ করেছে নিত্যবহমান লোকজগতে—

প্রেম পরিণয় নহে। পার্থিব আলয় নহে তার ;
তার গৃহ প্রভাতের উজ্জ্বল আকাশে ;
মানে না সে ধাবমান দূরত্বের ব্যবধান;
সঙ্গীত হইয়া যায়, প্রেম যাহে হাসে।

দ্বিজেন্দ্র-পূর্ব অথবা দ্বিজেন্দ্র-সমসাময়িক কোন পৌরাণিক নাট্যকার পুরাণের এই নবীন ব্যাখ্যা দেননি। দ্বিজেন্দ্রলালের গান ও কবিতায় প্রচারিত এই নবীন পুরাণ চিন্তা তাঁর পৌরাণিক নাটকে প্রসারিত হয়েছে।

পুরাণের কাহিনী নিয়ে নাটক রচনা করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল যে নূতন পথ ধরেছিলেন তার জন্য তাঁকে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।[৩৫]

৩৫. "আমাদের দেশের আলঙ্কারিকেরা রামায়ণাদি গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনী-গুলিকে 'সিদ্ধরস' আখ্যা দিয়াছেন, কারণ, এই সকল কাহিনী-বর্ণিত চরিত্রগুলির রসমূর্তি আমাদের জনসাধারণের চিত্ত চিরস্থায়ীভাবে অধিকার করিয়া আছে। সে রসবিরোধী নূতন কল্পনা করিয়া যাঁহারা সেই মূর্তিগুলিকে ভাঙ্গিয়া দিতে চান তাঁহারা কখনও সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারেননা। পাশ্চাত্ত্য অলঙ্কার-শাস্ত্রবিদেরাও ঠিক এই কথা বলেন। বাস্তবিক সর্বসাধারণের ভক্তি-ভাজন ব্যক্তিগণের চরিত্রে অযথা কলঙ্কলেপন—কি নীতি, কি রুচি, কি সাহিত্য—কোন দিক্ হইতেই সমর্থন করা যায় না।"
—মন্মথমোহন বসু : বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ১৯৫৯, পৃঃ ১৮৬

এর কারণ পুরাণের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং পৌরাণিক চরিত্রের প্রতি অপরিসীম ভক্তি বাঙালী মানসের অস্থি-মজ্জায় জড়িত। পৌরাণিক চরিত্রকে নাট্যরূপ দিতে গিয়ে বাঙালী চরিত্রের এই স্বভাব-আবেগকে দ্বিজেন্দ্রলাল স্মরণে রাখতে চাননি। মহাভারতে সত্যবতী চরিত্রকে যে উচ্চাসন দেওয়া হয়েছে, 'ভীষ্ম' নাটকে সে স্থান দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁকে দেননি। মহাভারতের ভীষ্ম চরিত্রের ব্রহ্মচারী স্বরূপের যে মাধুর্যময় চিত্র অঙ্কিত, তার উপর দ্বিজেন্দ্রলাল মানবিক প্রেমের রঙ বুলিয়ে চরিত্রের ত্যাগব্রতী রূপটি অস্বীকার করেছেন। শাম্বরাজের পদাঘাত পর্যন্ত দ্বিজেন্দ্রলালের ভীষ্মকে নীরবে সহ্য করতে হয়েছে। অহল্যার পরপুরুষ প্রেমের তীব্রতা অঙ্কন করতে গিয়ে তিনি মাতৃহস্তে শিশুপুত্রের হত্যা পর্যন্ত দেখিয়েছেন। বাঙালীর আজন্ম সংস্কারের মূলে দ্বিজেন্দ্রলাল এভাবেই আঘাত করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের বস্তুবাদী, তার্কিক মন পৌরাণিক ধর্মাদর্শকে গ্রহণ করতে পারেনি।

'পাষাণী' এবং 'সীতা' নাটকে পুরাণের বিকৃতির জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল যে সব সমালোচনা শুনেছিলেন, 'মন্দ্র' কাব্যের ভূমিকায় তার একটি উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি যদিও লিখেছিলেন 'আধুনিক দায়িত্বশূন্য' সমালোচকদের 'বাল্মীকির রামায়ণখানি উল্টাইয়া দেখিবার অবকাশ হয় নাই', কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হয় দ্বিজেন্দ্রলালও রামায়ণ-কাহিনী পুরোপুরি গ্রহণ করেননি। 'সীতা' নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার স্বয়ং স্বীকার করেছেন রাম চরিত্র-সৃষ্টিতে তিনি বাল্মীকিকে অনুসরণ না করে ভবভূতিকে অনুসরণ করেছেন। অতঃপর তিনি লিখেছেন, "এরূপ করায় আমার বিবেচনায় রামের চরিত্র বাল্মীকি চরিত্র অপেক্ষা হীন না হইয়া মহৎই হইয়াছে।" পৌরাণের প্রচলিত কাহিনীর এই নবীকরণে বাঙালীর সংস্কারে আঘাত লেগেছিল। 'ভীষ্ম' নাটকেও ভীষ্ম, অম্বা এবং সত্যবতী চরিত্রচিত্রণে নাট্যকার পৌরাণিক প্রসিদ্ধি ত্যাগ করেছেন।

প্রহসন এবং ঐতিহাসিক নাটকের মত পৌরাণিক নাট্যকাব্যেও দ্বিজেন্দ্রলাল প্রচুর সংগীত ব্যবহার করেছেন। পিতা বিখ্যাত গায়ক কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের কাছ থেকে তিনি এই সংগীত-রীতি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন; 'আর্যগাথা' দ্বিতীয় খণ্ডে স্কচ, আইরিশ এবং ইংরেজী গানেরও অনুবাদ করেছিলেন। জার্মাণ অপেরা রীতিও তাঁর নাটকে ছায়া ফেলেছিল।

গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল এবং ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে সংগীতের বহুল ব্যবহার হলেও প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমন্বয়ী এই বিশেষ সংগীতের ব্যবহার দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকেই দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থের 'সোনার কাঠি' নামক রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের এই সংগীত রীতিকে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম পৌরাণিক নাটক 'পাষাণী' (১৯০০) স্ত্রী বিয়োগের তিন বছর পূর্বেই রচিত হয়। রাজর্ষি জনকের আদেশে বিশ্বামিত্রের মহর্ষি গৌতমের আশ্রমের উদ্দেশ্যে যাত্রা-শুরুতে নাটকেরও সূচনা, আর নাটকের যবনিকাপাত গৌতমের পুণ্যতেজে অহল্যার পবিত্র হওয়ার মধ্য দিয়ে। নাটকে "দ্বিজেন্দ্রলাল অভিসম্পাত বৃত্তান্ত ও অহল্যার পাষাণরূপিনী হওয়ার কাহিনীকে গ্রহণ করেননি। এর কারণ উপলব্ধি করাও দুরূহ নয়। তিনি প্রধানতঃ পুরাণ কাহিনীর অতিপ্রাকৃত অংশকে যতদুর সম্ভব বর্জন করে স্বাভাবিক ও বাস্তবধর্মী করার চেষ্টা করেছেন। ইন্দ্রের অভিশাপ অথবা অহল্যার পাষাণে পরিণত হওয়া দুই-ই তাঁর কাছে অবাস্তব ও অস্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে। নাটকে গৌতমের আশ্রম-প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পেয়েই ইন্দ্র ও অহল্যা স্থানান্তরে যাত্রা করেছে। কৈলাস-পর্বতের নির্জন শিখরে ইন্দ্র ও অহল্যার সুখসম্ভোগ, ইন্দ্রের আসক্তিতে ভাঁটা পড়া, অহল্যাকে পরিত্যাগকালে অহল্যার ইন্দ্রকে ছুরিকাঘাত, আহত ইন্দ্রকে গৌতম ও চিরঞ্জীবের শুশ্রূষা, পতি-পুত্র-বিরহিত আশ্রমে মনোবিকারগ্রস্তা অহল্যার প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি কাহিনী রামায়ণ-অনুমোদিত নয়। কাহিনীর শেষাংশেও নাট্যকার রামায়ণ কাহিনীকে অনুসরণ করেননি।"[৩৬]

'পাষাণী' নাটকে প্রচলিত সামাজিক ন্যায়-অন্যায় বিচার পদ্ধতিকে নাট্যকার একরকম আক্রমণ করেছেন। মানবমনের নিভৃত সংকুচিত বাসনার প্রকাশ করে নাট্যকার যেন বলতে চেয়েছেন পদস্খলনে অন্যায় থাকতে পারে কিন্তু তার জন্য সামাজিক কঠোর প্রতিবিধান কখনই সমর্থনযোগ্য নয়। এজন্যই রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের পরিবর্তন ঘটিয়ে তিনি গৌতম কর্তৃক অহল্যাকে ক্ষমা করার ছবি এঁকেছেন।

৩৬. রথীন্দ্রনাথ রায় ॥ দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার

'পাষাণী'র সার্থক পৌরাণিক নাটক হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে দুর্বার রোমান্টিকতা। অহল্যার বন্ধনহীন কামনা-বাসনার প্রতি নাট্যকারের অসীম সহানুভূতি উপেক্ষার নয়। জ্ঞানী চন্দ্রশেখর যেমন শৈবলিনীর প্রেম-তৃষ্ণাকে পূর্ণ করতে পারেনি, শাস্ত্রবিশারদ গৌতমও তেমনি অহল্যার সতৃষ্ণ প্রেমকে ফুলের মত ফুটিয়ে তুলতে পারেনি। অহল্যা রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার মত 'মানবী নারী' হতে চেয়েছে। পৌরাণিক চরিত্রে এই মানবিকতা আরোপে পুরাণ-রস ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়েছে। পাষাণী চরিত্রে নাট্যকার দ্বন্দ্বের রেখাটিকে যদি আরও গাঢ় করতে পারতেন তাহলে তার রোমান্টিক চিত্তবিকাশ সম্পূর্ণ হত।

গৌতম-শিষ্য চিরঞ্জীব পাষাণী নাটকের একটি দীপ্ত চরিত্র। চিরঞ্জীব চরিত্রের একটি নাট্যিক-বিবর্তন আছে, প্রথম জীবনে সে ছিল দস্যু পর-জীবনে গৌতমের সংস্পর্শে সে একটি তাত্ত্বিক চরিত্রে বিশ্বাস্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। সংসার-অনাসক্ত এই চরিত্রটির মুখে দ্বিজেন্দ্রলাল সাতটি গান বসিয়েছেন। Dramatic relief এবং হাস্যরসসৃষ্টির প্রয়োজনে গানগুলির মূল্য আছে। মদন ও রতি চরিত্রের বিকাশ মুখ্যত সঙ্গীত-প্রবাহে। কৌতুক সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁদের দ্বৈত-সঙ্গীতের মূল্য যথেষ্ট—

উভয়ে। এমনি কোরে আমরা মজাই কুল।
এ ভুবনে আমরাই যত অনিষ্টের মূল।......

মদন ও রতির মত অহল্যার কণ্ঠেও রোমান্টিক সঙ্গীত ব্যবহার করা হয়েছে—

আর একবার ভালবাসো
বাসতে যেমন আগের দিনে
ঘুমন্ত প্রাণের ব্যথা আবার জাগিয়ে প্রাণে।......

'পাষাণী'কে নাট্যকার বলেছেন গীত-নাটিকা। নাটকের সূচনায় গান না থাকলেও শেষ দৃশ্যটি আগাগোড়াই অপ্সরাদের গান। তাছাড়া, যোগীগণ, তাপস বালকগণ, তমসা এবং রাজার মুখেও গান বসানো হয়েছে।

'পাষাণী' নাটকের কাব্যভাষা মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ নয়—গিরিশ-চন্দ্রের মত দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে কোন ছন্দেরও জন্ম দিতে পারেননি। মধুসূদন এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাষার একটি সমন্বয় তিনি করতে চেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের ভাষার প্রতিধ্বনি 'পাষাণী'তে যত্রতত্র শোনা যায়। বসন্তমুখর প্রকৃতির রূপে বিভোর অহল্যার উক্তি প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য—

সুদূর তটিনী বহে ঘন তরুচ্ছায়ে
অর্ধাবগুণ্ঠনবতী, ক্ষিপ্র পদক্ষেপে
বন্ধুর কান্তার দিয়া।…
………সবার উপরে
এক গাঢ় নীলাকাশ নিস্পন্দ, নির্মল,
সদ্যমেঘমুক্ত নত চুম্বিত ধরার
সুখস্মিত বিম্বাধর—রক্তিম লজ্জায়। [২/২]

'সীতা' (১৯০৮) 'পাষাণী' রচনার আট বছর পরে বার হয়। নাটকের সমগ্র বিষয় বিচারে এটি দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ নাটক। জন্মদুঃখিনী রাম-দয়িতা বাঙালীর জীবনাদর্শ। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নব্যরুচির দর্পণে এই চরিত্রটিকে প্রতিফলিত করলেও চরিত্রটির চিরন্তন নম্র-সৌরভ তাঁর নাটকে এক অবিমিশ্র সৌন্দর্য পরিগ্রহ করেছে। নাট্যকার সমগ্র চরিত্রশালাকে রূপায়ণের সময় যদি একই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতেন তাহলে এটি উচ্চাঙ্গের পৌরাণিক নাটক হতে পারত। 'পাষাণীর' কাহিনী রামায়ণের আযোধ্যাকাণ্ড থেকে চয়িত, 'সীতা'র কাহিনী 'উত্তরকাণ্ডের' কাহিনী থেকে গৃহীত। সীতা-নির্বাসনের কাহিনী নিয়ে বাংলা সাহিত্যে অনেকগুলি নাটক রচিত হলেও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক সেগুলি থেকে স্বতন্ত্র।

ভবভূতির রামচন্দ্রের মত দ্বিজেন্দ্রলালের রামচন্দ্রও নাটকের শুরু থেকেই হৃদয়-অনুভূতিতে উচ্ছ্বসিত। দুর্মুখের মুখে সীতার চরিত্র সম্পর্কিত লোক-অপবাদ শুনে রাম রাজ্যের উপর, অযোধ্যাপুরীর উপর, এমনকি সমাজের উপরও তাঁর আস্থা হারিয়েছেন, তাঁর মনে একটিই ধ্রুব বিশ্বাস—

তবু হৃদয়ে আসীন
সীতা—পতিপ্রাণা সীতা রবে চিরদিন
এই বক্ষে, ভস্মীভূত বিশ্বচরাচরে,
ব্যোমব্যাপী ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংসের ভিতরে। [১/৫]

কিন্তু এই মানসিক দোলাচল অবস্থা রামচরিত্রে প্রস্ফুট ও বিকশিত হতে পারেনি। বশিষ্ঠের আশ্রম-প্রত্যাগত রাম ভ্রাতা, ভগ্নী এবং জননীকে প্রথমে

জানালেন তিনি সীতার বনবাসই বাঞ্ছনীয় মনে করেন, কিন্তু কৌশল্যার অনুরোধে তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন—

……জননী আমার।
সত্যভঙ্গ হোক, ভগ্ন হোক রাম,
মা তোমার হোক পূর্ণ মনস্কাম। [২/৪]

পুনরায় সেই রামকেই সীতার বনবাসে সম্মতি দিতে দেখা যায় যখন সীতা নিজে রামের কাছে এসে স্বেচ্ছাবনবাস কামনা করেন।

বাল্মীকি অথবা ভবভূতির অনুসরণ না করে সীতার পরিণতির ভিন্ন দৃশ্য নাট্যকার এঁকেছেন। বাল্মীকির রচনায় দেখি সীতার পাতালপ্রবেশ। ভবভূতির নাটকের পরিণতি মিলন-মধুর। দ্বিজেন্দ্রলাল অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়ম লঙ্ঘন করে নাটকের করুণ-পরিণতি এঁকেছেন। কিন্তু বাল্মীকি মাত্র তিনটি শ্লোকের মধ্য দিয়ে সীতার পাতাল প্রবেশের যে দুঃখ-ভীষণ চিত্র এঁকেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল তার সামান্যমাত্র সুযোগ নিতে পারেননি। বাল্মীকি-রামায়ণে সীতা ধরিত্রী দেবীর কাছে প্রার্থনা করেছেন—"তথা মে মাধবী দেবী বিবরণ দাতুমহ'তি'—অতঃপর ধরিত্রীর কোলে আশ্রয় পেয়েছেন। বনবাস-প্রত্যাগতা সীতা পুনবায় লোকাপবাদ না শুনলে এই পাতাল-প্রবেশ কামনা করতেন না। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে সীতা এই অপবাদ না শুনেও প্রায় স্বেচ্ছামৃত্যু কেন বরণ করলেন বোঝা যায়না।

দ্বিজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব অপ্রধান চরিত্রসৃষ্টিতে। অন্তঃপুরের চার বধূ এবং শান্তা চরিত্র নাট্যকারের পারিবারিক দৃশ্য রচনায় নিখুঁত। প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে লক্ষ্মণ ও ঊর্মিলার চরিত্র ভালই ফুটেছে। কৌশল্যা চরিত্রও নাট্যকারের রচনা-নৈপুণ্যে সুন্দর।

পাষাণী নাটকে কোন নির্দিষ্ট ছন্দাদর্শ চোখে পড়েনা। 'সীতা' নাটকে আগাগোড়া মিত্রাক্ষর ব্যবহৃত হওয়ায় নাটকে গতি এসেছে। এই ছন্দ তিনি আর কোন নাটকে ব্যবহার করেননি।

মহাভারত-কাহিনীকে অবলম্বন করে দ্বিজেন্দ্রলাল একটিই নাটক লেখেন, 'ভীষ্ম'। নাট্যকারের মৃত্যুর বছর খানেক পরে এটি গ্রন্থাকারে বার হয়। তাঁর পূর্বে রাজকৃষ্ণ রায় 'ভীষ্মের শরশয্যা' নামে একটি নাটক লিখেছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার স্বয়ং বলেছেন : 'আমি ভীষ্মের জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে বসি নাই। কিম্বা ভীষ্ম সম্বন্ধে মহাভারতের বর্ণিত কাব্যটুকু সঙ্কলন করিতেও বসি নাই। ভীষ্মের জন্মবৃত্তান্ত হইতে নাটক আরম্ভ না করিয়া সেইজন্য আমি তাঁহার প্রতিজ্ঞা হইতে এই নাটক আরম্ভ করিয়াছি এবং কোন কোন স্থলে বিশুদ্ধ কল্পনার আশ্রয় লইয়াছি। রাজকৃষ্ণর নাটকের দীর্ঘ ঘটনাবিস্তারের ত্রুটি বর্তমান নাটকে না থাকলেও 'বিশুদ্ধ কল্পনার আশ্রয়ে'র ফলে নাটকটি পুরাণের সংস্কারলোক থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

মহাভারতের একটি অতিক্ষুদ্র চরিত্র 'অম্বা'। দ্বিজেন্দ্রলাল অম্বাকে 'ভীষ্ম' নাটকের পুরোভূমিকায় স্থাপন করেছেন। তাঁর কল্পনায় অম্বা কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং ভীষ্মেব প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী হিসেবে চিত্রিত করেছেন। ভীষ্ম-বঞ্চিতা অম্বা শাল্বরাজার কাছেও প্রেমভিক্ষা করেছেন এবং ব্যর্থ হয়ে পুনরায় ভীষ্মর কাছে ফিরে এসেছেন। প্রথম অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যে অম্বা ভীষ্মর মনকে দোলায়িত করেছিলেন, তৃতীয় অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে তিনি পুনরায় ভীষ্মর মনে ঝড় তুলেছিলেন। অম্বা চরিত্রের গভীরে প্রেমের ফল্গু প্রবাহিত হলেও নাটকের, বিশেষতঃ ভীষ্ম চরিত্রের প্রচলিত স্বরূপের প্রকাশের পথে এই চরিত্রটি অবশ্যই অন্যতম প্রতিবন্ধক।

সত্যবতী চরিত্রে নাট্যকার কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। মহাভারতের আদি-পর্বেই সত্যবতীর মৃত্যু ঘটেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের সত্যবতী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সত্যবতী দেহসম্ভোগে আতুর। শান্তনুর মৃত্যুর পর তাঁর উক্তি অ-মহাভারতীয়—

'আজ স্বেচ্ছাধীন আমি—ওহো কি উল্লাস!
হাঁ, লইব প্রতিশোধ—করিব সম্ভোগ ;
কিসের সঙ্কোচ? ধর্ম দিয়াছি শৈশবে;
ধীবরনন্দিনী আমি—অনন্ত যৌবনা।

তেমনি স্বামীর মৃত্যুর পরই শাল্বরাজের কাছে তাঁর প্রেমনিবেদন রসবোধে আঘাত করে।

পাঁচ অঙ্কের এই নাটকে গান আছে মোট সাতটি। বিচিত্রবীর্যের দুই স্ত্রী অম্বিকা এবং অম্বালিকা কুমারী থেকে বিধবা-অবস্থা পর্যন্ত গান গেয়েছে। তাদের মুখে গান আছে চারটি। নাটকে গীতরস পরিবেশনের জন্য এবং

চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য এই গানগুলির প্রয়োজন আছে। তাদের কণ্ঠে যখন শোনা যায় 'আমরা মলয় বাতাসে ভেসে যাব শুধু'...ইত্যাদি গানটি তখন তাদের চরিত্রের প্রফুল্ল সজীব রূপটি সহজেই অভিব্যক্ত হয়। সখীদের এবং নর্তকীদের গানও নাট্যকার ব্যবহার করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের গানটি অপ্রয়োজনীয় হলেও ভূতগণের মহাদেব-বন্দনা গানটির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

পৌরাণিক নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের নারীর প্রতি সহানুভূতি প্রবল। অহল্যা, সীতা এবং অম্বা—এই ত্রয়ী চরিত্রের একটানা দুঃখভোগের দৃশ্য আঁকতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল পৌরাণিক যুগের ন্যায়-নীতিকে গ্রাহ্য করেননি। অহল্যার মনে যে কামনার শতদল বিকশিত হয়েছে তার নিবৃত্তি না ঘটায় সেই প্রেম রুদ্র আক্রোশে লালসার দাবদাহে পরিণত হয়েছে। অম্বার প্রেমের সমুদ্র-শিহরও বারংবার ব্যর্থ হয়েছে। অতঃপর সেই প্রেম প্রতিহিংসার পথ খুঁজেছে। সীতা ভিন্ন স্বাদের চরিত্র হলেও নাট্যকারের সমবেদনা তাঁর প্রতিও ধাবিত। কিন্তু গৌতম-ইন্দ্র, ভীষ্ম-শাল্ব চরিত্রের দিকগুলি ফুটিয়ে তুলে দ্বিজেন্দ্রলাল যেরূপ অহল্যা ও অম্বা চরিত্রের পদস্খলনের জন্য পুরুষের ঔদাসীন্য লালসা এবং শঠতাকে দায়ী করেছেন—সীতা চরিত্রের ব্যথা-বেদনাকে প্রকাশের জন্য রাম চরিত্রের কিছু ত্রুটি তুলে ধরলে কোন ক্ষতি ছিল না। এক্ষেত্রে কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল মধুসূদন হতে পারেননি। সীতার দুর্ভোগের সমস্ত দায়দায়িত্ব তিনি বশিষ্ঠের কাঁধে চাপিয়াছেন।

পৌরাণিক নাটক রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল নিঃসন্দেহে নতুন পথের দিশারী। অথচ সীতা ব্যতীত তাঁর অপর দু'টি পৌরাণিক নাটক রঙ্গমঞ্চের দর্শকদের বেশী আকর্ষণ করতে পারেনি। এর কারণ সম্ভবতঃ পৌরাণিক নাট্য-দর্শকদের মানসিকতা গিরিশ-নাট্যে এতবেশী মুগ্ধ ছিল যে, দ্বিজেন্দ্রলালের নতুন পুরাণ-ব্যাখ্যা তাঁদের কাছে গ্রহণীয় হতে পারেনি। 'সীতা'য় দ্বিজেন্দ্রলাল যে চরিত্রাঙ্কন করেছেন তাতে পুরাণের আদর্শ অনেকাংশে অক্ষুণ্ণ। সেজন্যই সীতা নাটকটি বঙ্গরঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের আলোয় যথেষ্ট আলোকিত।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ॥

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭) সন্ধিযুগের নাট্যকার।

'একদিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিতে গেলে ক্ষীরোদপ্রসাদকে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের মধ্য ও আধুনিক যুগের মধ্যে যোগরক্ষাকারী বলিয়াও নির্দেশ করিতে পারা যায়। মধ্যযুগের পৌরাণিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া নাটক রচনার ধারাটি যেমন তিনি আধুনিক যুগ পর্যন্ত অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলেন, তেমনই আধুনিক যুগের আত্মসচেতনতা দ্বারাও তিনি তাঁহার পৌরাণিক নাটকগুলিকে একটি বিশেষত্ব দান করিয়াছিলেন।'[৩৭] মোট ৪৭টি নাটকের মধ্যে তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলি হল, 'বভ্রুবাহন' (১৩০৬), 'সাবিত্রী' (১৩০৯), 'উলূপী' (১৩২৩), 'ভীষ্ম' (১৩২০), 'মন্দাকিনী' (১৩২৮) এবং 'নরনারায়ণ' (১৩৩৩)। আধুনিক শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর প্রতিভাকে পুরাণের পৃষ্ঠায় বিস্তৃত করেছিলেন বলেই তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলি একটি স্বতন্ত্র স্বরভিত মূর্তি নিতে পেরেছে।

গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভার চরম বিকাশের যুগে ক্ষীরোদপ্রসাদের পৌরাণিক নাট্যরচনার সূত্রপাত। গিরিশচন্দ্রের ভাব-ভাষা এবং চরিত্র-সৃষ্টিকে তৎকালীন কোন নাট্যকারই অতিক্রম করতে পারেননি। ক্ষীরোদ-প্রসাদের প্রথম তিনটি পৌরাণিক নাটকে গিরিশচন্দ্রের অনুসরণ স্পষ্ট-দৃশ্য। কিন্তু এই নাটকগুলিতে তাঁর স্বভাবপ্রবণ রোমান্সপ্রিয়তা অতিরিক্ত একটি নাট্যাবেশ সঞ্চার করেছে। 'নর-নারায়ণ' নাটকে পৌঁছে নাট্যকার সম্পূর্ণ নিজ শক্তির উপর নির্ভর করলেন। 'নরনারায়ণ' কেবলমাত্র মঞ্চসাফল্যই লাভ করেনি, নাটক হিসেবেও রসোত্তীর্ণ হয়েছে।

গিরিশচন্দ্রের ন্যায় ক্ষীরোপ্রসাদের অধ্যাত্ম-বিশ্বাস প্রবল ছিল। এই বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের মনোভাব ছিল স্বতন্ত্র। ক্ষীরোদপ্রসাদের জন্ম তান্ত্রিক বংশে, তিনি থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির সভ্য ছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় 'অলৌকিক রহস্য' নামক পত্রিকা বার হত। দৈবশক্তির উপর এই প্রবল বিশ্বাস তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলির উপর ছায়াপাত করেছে। কিন্তু পৌরা-ণিক নাট্যরচনার সময় তিনি গিরিশচন্দ্রের ন্যায় যাত্রা অথবা কথকতার রীতিকে-রসকে গ্রহণ করেননি, পৌরাণিক ঘটনা, চরিত্র এবং রসকে তিনি পুরাণের ভাবগম্ভীর পরিবেশেই মূর্ত করেছেন।

৩৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য: বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৬১, পৃঃ ২০২

'বভ্রুবাহন' 'সাবিত্রী' এবং 'রঞ্জাবতী' নাটক তিনটিতে ক্ষীরোদ-প্রতিভার সম্যক বিকাশ হয়নি। শেষ নাটকটিকে পুরোপুরি পৌরাণিক নাটক বলা যায় না—ধর্মমঙ্গল কাহিনীর মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্য যুক্ত হয়ে নাটকটি অলৌকিকতায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনী নিয়ে ইতিপূর্বেই ক'টি নাটক রচিত হয়েছিল, ক্ষীরোদপ্রসাদ নূতন কোন বৈশিষ্ট্য সঞ্চার করতে পারেনি। অর্জুন-পুত্র বভ্রুবাহনের উপর লেখা তাঁর প্রথম পৌরাণিক নাটকটিও অতি-প্রাকৃতে ভরপুর। 'উলূপী' নাটকে বভ্রুবাহন চরিত্রটি অধিকতর সুন্দর-অঙ্কিত। 'সাবিত্রী' নাটকে নায়িকার মুখে ব্যবহৃত দুঃখকরুণ গানগুলি অপরিহার্য।

'উলূপী' নাটক ক্ষীরোদ-প্রতিভা আলোচনায় সহায়ক হতে পারে। মহাভারতের উপর লেখা তাঁর শেষ তিনটি পৌরাণিক নাটকের ভিতর এটি অন্যতম। 'উলূপী'তে নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের প্রভাব কাটিয়ে উঠেছেন, নিজের রোমান্টিক চেতনার সঙ্গে পুরাণ-কাহিনীর সফল মিলন ঘটিয়ে তিনি নাটকটি লিখেছেন। অর্জুন উলূপীর রূপে মুগ্ধ হয়ে বিবাহ করেছিলেন এবং পুত্র ইলাবন্তের জন্মের পর ছেড়ে গিয়েছিলেন। মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব থেকে কাহিনী-বীজ সঞ্চয় করে উলূপীর মর্মবেদনায় সহানুভূতির স্পর্শসঞ্চার করে ক্ষীরোদপ্রসাদ নাটক শুরু করেন। নারদ কর্তৃক উলূপীর পাতিব্রত্য পরীক্ষায় উলূপী জয়ী হয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর কারণ সে নিজে হবে জেনে প্রাণ-বিসর্জন দিতে ছোটে, স্বামীর জীবন রক্ষার জন্য পুত্র বভ্রুবাহনের মৃত্যুজনিত বেদনাও সহ্য করে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ রোমান্টিক নাট্যকার। উলূপী চরিত্রের অন্তরতম প্রদেশে যে জীবন-পিপাসা এবং যৌবন-তৃষ্ণা অহরহ প্রজ্জলিত ছিল তা তিনি বুঝে-ছিলেন। উলূপীর পাতিব্রত্য তার যৌবনের নিসিক্ত কামনা এবং ভারতীয় নারীধর্মের আদর্শ। ক্ষীরোদপ্রসাদ আন্তরিকতার সঙ্গে এই ভাবটি ফুটিয়ে তুলেছেন। উলূপী চরিত্রের বিকাশের জন্য নাট্যকার কয়েকটি পুরাণ-প্রসিদ্ধির পরিবর্তন করেছেন। মহাভারতে ইলাবন্তের মৃত্যু ঘটেছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে, অশ্বমেধ পর্বে নয়। তা ছাড়া মহাভারতের কোথাও গঙ্গা অভিশাপে বলেননি যে পুত্র-হস্তে নিহত অর্জুনকে রৌরব নরকে পতিত হতে হবে। নাটকীয়

চরিত্রে দীপ্তি আরোপের জন্য গিরিশচন্দ্র ও এমন সামান্য পরিবর্তনও করেননি, অথচ এই পরিবর্তনে 'উলুপী'র পৌরাণিক নাট্যগুণ ক্ষুণ্ণ হয়নি।

'উলুপী'তে ক্ষীরোদপ্রসাদ সুন্দর ঝরঝরে গদ্যভাষার আশ্রয় নিয়েছেন। যৌবনের মূর্তিমতী প্রকাশ উলুপীর সৌন্দর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে অনন্ত নারদকে বলেছেন—

> "...উন্মাদিনী মা আমার কেশ এলো করে ঐ সব পাহাড়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে যখন ছুটোছুটি করে বেড়ায়, তখন মনে হয়, যেন দেবতারা পাহাড়ে বসে মেঘে জড়ানো চাঁদ লোফালুফি করছে।"
> (১/৪)

উলুপীর সঙ্গে জনা চরিত্রের দূরাগত সাদৃশ্য থাকলেও উলুপীর উক্তির মধ্যে অন্তর-বেদনা অনেক বেশী নিবিড়—

> "মরণ মঙ্গল—না নরক মঙ্গল?......এইমাত্র জানি, একদিন না একদিন মৃত্যু আছে।...তার সঙ্গে নরক আসবে কেন? যার প্রতিকার আছে আমার দেবতার কাছে তাকে আসতে দেব কেন? নারায়ণ! আমাকে স্বামীঘাতিনীর বল দাও।"

ক্ষীরোদপ্রসাদকে প্রকৃতপক্ষে রোমান্টিক নাট্যকার বলাই যুক্তিযুক্ত। উলুপী রচনার পূর্বেই তাঁর আলিবাবা, জুলিয়া, বেদৌরা, সপ্তম প্রতিমা প্রভৃতি গীতিনাট্য রচিত ও প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। এই নাটকগুলি আমাদের নিয়ে যায় রূপকথার মায়াজগতে, সঙ্গীতের নির্জন দ্বীপে। নৃত্য ও গীতে ভরপুর এই গীতিনাট্যগুলিতে কোন দ্বন্দ্ব-সংঘাত নেই। উলুপী রচনার পূর্বে 'প্রতাপাদিত্য' নামে একটিমাত্র ঐতিহাসিক নাটক বার হয়। এই নাটকটির কাহিনীও কিংবদন্তী নির্ভর। উলুপীতে পৌঁছেও ক্ষীরোপ্রসাদ সেই দ্বন্দ্ব-সৃষ্টির ক্ষমতাটি আয়ত্ত করতে পারেননি। অন্যথায় উলুপী চরিত্রটিতে যে সকল উপাদান ছিল তার উপর নির্ভর করে বাংলা নাটকে তিনি একটি দ্বন্দ্ব-সংঘাত পরিপূর্ণা নায়িকা হয়ে বেঁচে থাকতে পারতেন। নাট্যকারের রোমান্টিক প্রতিভাই এই পথে সবচেয়ে বাধা হয়েছে। অর্জুন চরিত্র তত বিকশিত নয়। অনন্ত চরিত্রের অপার কন্যা ও দৌহিত্র-স্নেহ মন জুড়ে থাকে। কৃষ্ণ-চরিত্র নাটকের মুখ্য-ভূমিকা কখনও গ্রহণ করেনি।

ক্ষীরোদপ্রসাদের পূর্বে গিরিশচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং অন্যান্য নাট্যকার মহাভারতের একটি অনুপম ত্যাগপূত চরিত্র ভীষ্মকে অবলম্বন করে লিখেছেন। গিরিশচন্দ্র ঐ নামে নাটক না লিখলেও তাঁর নাটকে ভীষ্ম উপস্থিত। কিন্তু কোন নাট্যকারই ভীষ্ম চরিত্রের বীরত্ব এবং মহত্বকে সমান্তরাল রেখায় এগিয়ে নিতে পারেননি। ক্ষীরোদপ্রসাদের ভীষ্ম অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করলেও তাঁর নাটকে পূর্বসূরীদের ত্রুটি অনুপস্থিত নয়। রাজকৃষ্ণের নাটকের মত ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকের কাহিনীও দীর্ঘ বিস্তৃত—পাঁচ পুরুষের জীবনবৃত্ত। ভীষ্মের জীবনকে খণ্ডিত করে তিনটি নাটকে বিধৃত করতে কাহিনীর প্রতি যেমন মর্যাদা দেওয়া যায় তেমনি চবিত্রেরও যথাযথ বিকাশ সম্ভব হয়। ক্ষীরোদপ্রসাদের সেই ধৈর্য ছিল না বলে নাটকটির চরমোৎকর্ষ ঘটল না।

ভীষ্ম নাটকের নায়ক চরিত্র। নাট্যকার এই চরিত্রে সঠিক দ্বন্দ্ববেগ প্রয়োগে ব্যর্থ হয়েছেন। ভীষ্ম চরিত্রকে অতিরিক্ত আদর্শমুখীন করার ফলে হয়ত তাঁর চরিত্রের ব্রহ্মচর্য স্বরূপটি ফুটেছে, কিন্তু দর্শকের কাছে তা সম্পূর্ণ 'বিশ্বাস্য' হতে পারেনি। কাশীরাজ-কন্যা অম্বার বারংবার রূপ-যৌবন সমর্পণে সাড়া না দিয়ে তিনি ভীষ্ম চরিত্রের মর্যাদা হয়ত রক্ষা করেছেন, কিন্তু চরিত্রটিকে জীবন-অনুভূতি বঞ্চিত করার ফলে চরিত্রটি দ্বন্দ্বমুখর হতে পারেনি। প্রেমের ক্ষেত্রে ভীষ্ম যেমন নীরব, তেমনি দৈব-শক্তির প্রতি তাঁর সীমাহীন বিশ্বাস। দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে, তৃতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে এবং চতুর্থ অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে যেটুকু দ্বন্দ্ব-সংঘাতের শিখা জ্বলে উঠেছিল তার কৃতিত্ব ভীষ্মের নয়, —অম্বার, শিখণ্ডীর।

এই দ্বন্দ্বহীনতাই 'ভীষ্ম' নাটকের ট্রাজেডির সম্ভাবনাকে হতাশ করেছে। ভীষ্ম চরিত্রের সকল শক্তির উৎস কি নাটকের সূচনায় পরশুরামের উক্তিতেই তা বোঝা যায়, ভীষ্মের জগৎ সংসারের প্রতি কোন স্বার্থময় আকর্ষণ না থাকায় তাঁর মৃত্যু আর যাই হোক চূড়ান্ত ট্রাজেডি নয়। ভীষ্ম চরিত্রে মানবিক অনুভূতির প্রয়োগ করা হলে, ভীষ্ম চরিত্রের বীরত্ব নাটকের শেষ পর্যন্ত প্রদর্শিত হলে এটি অবশ্যই সার্থক ট্রাজেডি হতে পারত।

'ভীষ্ম' নাটকে গদ্যভাষার পাশাপাশি পদ্যছন্দও ব্যবহৃত। এই ভাষারীতি তাঁর শেষ পৌরাণিক নাটকেও অনুসৃত। পদ্যছন্দে গিরিশচন্দ্রের প্রভাব

একেবারে অস্বীকার করা নাট্যকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

ভীষ্মের শরশয্যার কাহিনী অবলম্বনে নাটক লিখতে বসে রাজকৃষ্ণ সুদূর অতীত থেকে নাট্যকাহিনীর সূত্রপাত করেছেন এবং তার ফলে নাটকটি একদিকে হয়েছে ঘটনা-ভারাক্রান্ত, অন্যদিকে কাহিনীতে এসেছে অসংলগ্নতা। দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁদের ভীষ্ম নাটকে কাহিনী-বয়নের ক্ষেত্রে ঐ একই ত্রুটির শিকার হয়েছেন। আসলে এঁরা কেউই ভেবে দেখেননি যে ভীষ্মের সুদীর্ঘ জীবন-কাহিনী একটি মাত্র নাটকে গ্রথিত করা সম্ভব নয়। রাজকৃষ্ণ হয়ত এটি বুঝেছিলেন এবং সেজন্যই ভীষ্মের শরশয্যা অংশটিকে নিয়েই নাটক লিখতে বসেছিলেন। কিন্তু উচ্চাঙ্গের নাট্যশক্তির অভাবে তাঁর নাটক সাফল্যের তুলাদণ্ডে উত্তীর্ণ নয়। আমাদের মনে হয় এই বিষয়ে সতর্ক ছিলেন বলেই গিরিশচন্দ্র কেবলমাত্র ভীষ্ম-কেন্দ্রিক কোন নাটক লেখেননি।

ভীষ্ম নাটকে গদ্য ছন্দের পাশাপাশি পদ্য ছন্দও ব্যবহৃত। এই ভাষা ও ছন্দরীতি তাঁর শেষ পৌরাণিক নাটকেও অনুসৃত। পদ্যছন্দে গিরিশচন্দ্রের প্রভাব একেবারে অস্বীকার করা নাট্যকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। গিরিশ-চন্দ্রের পাণ্ডব-গৌরব নাটকের মুখ্য চরিত্র ভীষ্মের মুখ থেকে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ঝরে পড়েছে অভিমানের ভাষা—

অতি ছল, অতি খল, অতীব কুটিল,
তুমিই তোমার মাত্র উপমা কেবল,
কিন্তু নাম ধর ভক্তাধীন,
কায়-মন-প্রাণ, অর্পণ করেছি রাঙা পায়—
তথাপি যদ্যপি তুমি না বুঝ বেদনা,
রণস্থলে দেবতামণ্ডলে
উচ্চকণ্ঠে করিব প্রচার—
নহে তুমি লজ্জা নিবারণ।
নহ কভু ভক্তাধীন।
নহে কেন কর হতমান?
হলে কণ্ঠাগত প্রাণ,
কৃষ্ণনাম আর না আনিব মুখে।

(৩/৫)

ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে ভীষ্মের কৃষ্ণের প্রতি উক্তিতে পরোক্ষে সেই একই অভিমানের অশ্রুবর্ষণ—

অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী প্রাণী
ভীমা রণচণ্ডীর মন্দিরে
বলি দিতে এসেছ নির্দয়।
বালক-অর্জুন-রথে করি আরোহণ
অশ্ব-রজ্জু করিয়া ধারণ
হাস্যমুখে সে সংহারে সাক্ষী রবে তুমি,
এই লও পুনঃ উপহার
কোমলাঙ্গ বিঁধিয়া তোমার
সেই সব ক্ষত্রিয়ের মৃত্যুর যাতনা
প্রতি লোমকূপে
তোমারে করাব আমি পান।

ক্ষীরোদপ্রসাদের সর্বশেষ এবং সর্বাধিক জনপ্রিয় নাটক 'নর-নারায়ণ'। তাঁর অসম্পূর্ণ 'কৃষ্ণ' নাটকটি পরবর্তীকালেও কেউ সম্পূর্ণ করেননি। 'নর-নারায়ণ' রচনা শেষ হওয়া পর্যন্ত নাম ছিল 'কর্ণ', পরে পরিবর্তিত নাম হয় 'নর-নারায়ণ'। নাট্যকার তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীকে একটি পত্রে (১৭।১০।১৯২৪) জানিয়েছিলেন 'নর-নারায়ণ'ই তাঁর একমাত্র স্বাধীন রচনা অর্থাৎ তাঁর পূর্ববর্তী নাটকগুলি একান্তই দর্শক এবং মঞ্চাধ্যক্ষ-গণের ইচ্ছানুযায়ী রচিত। এজন্যই তাঁর শেষ নাটকে নাট্যপ্রতিভার বিদ্যুৎ-বিকাশ সহজেই চোখে পড়ে।

ক্ষীরোদপ্রসাদের বিভিন্ন নাটকে কৃষ্ণ চরিত্রের উপস্থিতি। 'নর-নারায়ণে' নাট্যকারের কৃষ্ণভক্তির চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটলেও নাট্যকার যুক্তিকে অস্বীকার করেননি। তাঁর পূর্ববর্তী নাট্যকারগণ কৃষ্ণের প্রতি যে অহৈতুকী ভক্তির পরিচয় রেখেছেন ক্ষীরোদপ্রসাদ সে পথে যাননি। অথচ নাটকের সর্বত্র এই ভাবটি না থাকার ফলে অন্যান্য চরিত্রের মত কৃষ্ণভক্তিতে প্রণত হয়েছেন। তবে অবিশ্বাসী কর্ণ নিয়তির বারংবার আঘাতে ধীরে ধীরে মানবাশ্রিত ভগবান কৃষ্ণের ঐশ্বরিক শক্তিকে স্বীকার করে নিয়েছেন। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

বাংলা নাট্যসাহিত্যে ক্ষীরোদপ্রসাদের পূর্বে কর্ণ চরিত্র বহুবার রূপায়িত হয়েছে। গিরিশচন্দ্রের 'অভিমন্যুবধ' (১৮৮০), 'বৃষকেতু' (১৮৮৪) এবং 'পাণ্ডবগৌরবে' (১৯০০), মতিলাল রায়ের যাত্রা নাটক 'কর্ণবধ'-এ, অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'কর্ণার্জুন' (১৯২৩) নাটকে কর্ণ চরিত্র উপস্থিত। ক্ষীরোদ-প্রসাদের কর্ণের নূতন গুণ হল কৃষ্ণের নারায়ণত্বে প্রাথমিক অবিশ্বাস। মহাভারতেও কর্ণচরিত্রে এই অবিশ্বাস বীজাকারে ছিল, ক্ষীরোদপ্রসাদ তারই নাট্যরূপ দিয়েছেন।

নাটকের প্রস্তাবনা সঙ্গীত এবং সূচনা অংশ অতিক্রম করার পর দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণরূপে স্বীকার করতে কর্ণ রাজী নন। কর্ণ চান অর্জুনের পরাভব; সেজন্য তাঁর 'সূতপুত্র' উপাধিও অগৌরবের নয়—কেননা তা যদি সত্য হয় তাহলে পরশুরামের অভিশাপ সফল হবে, অর্জুনের ঘটবে পরাজয়। ভীষ্ম দ্রোণ দুর্যোধনকে যুদ্ধে নিবৃত্ত করতে চাইলেন, কিন্তু কর্ণ চান যুদ্ধ—এই যুদ্ধেই পরীক্ষিত হবে কৃষ্ণ নারায়ণ কিনা, নিশ্চিত হবে অর্জুনের পরাজয়। কর্ণ জানেন তিনি দেবেরও অবধ্য, কেননা তাঁর অঙ্গে সহজাত কবচকুণ্ডল। তাই দুর্যোধন যখন বলেন, 'বিনা যুদ্ধে আমি/সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমি দিব না পাণ্ডবে'; তখন কর্ণ প্রতিজ্ঞা করেন, 'সৈন্য লয়ে একা আমি যাব রণস্থলে/ অর্জুন বধের ভার লইলাম আমি।'

কিন্তু কর্ণের অন্তরে দ্বিধার দোলাচল ধরা পড়ে পদ্মাবতীর প্রতি তাঁর উক্তিতে—

> ...আমিও শুনেছি ঋষিমুখে
> ধনঞ্জয়-বাসুদেব নর-নারায়ণ।
> বিশ্বাস না করি, প্রীতি করি।

এই সংলাপেরই শেষে 'সত্য যদি হই আমি রাধার নন্দন' ইত্যাদি উক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব আত্মপ্রকাশ করেছে। শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনায় দূতরূপে আগমনের সংবাদে কর্ণ যে 'নিরুত্তর' ও 'আনমনা' হয়ে পড়েন তাও এই কৃষ্ণ-সম্পর্কিত 'প্রীতি'র 'বিশ্বাসে' পরিণত হওয়ার স্তরমাত্র। অতঃপর স্বপ্নের অর্ধচেতন রাজ্যে কর্ণ কৃষ্ণকেই দেখতে পান—

> ও কি ও সুন্দর, ও কি মধুরূপা রেখা।
> ও কি বর্ণ, নবীন নীরদ ও কি আঁখি—

আয়ত মধুর ? বাসুদেব—বাসুদেব—
এমন কিশোর তুমি ?

অতঃপর কর্ণের কৃষ্ণ-বিশ্বাসে আর বিরোধিতা থাকে না। কবচকুণ্ডল হারিয়েও যে কর্ণ আত্মবিশ্বাসে স্থিত হয়ে বলেন—'আছে কর্ণ—আর তার উপাধি রাধেয়'; তিনিই কৃষ্ণের কাছে নিজ জন্ম-রহস্য শুনে যেন সর্বস্বান্ত, রিক্ত। এমন দুঃখদীর্ণ চরিত্র মহাভারতে আর নেই।

কর্ণ জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব হতে চাইলেন না—সিংহাসনের প্রলোভন মেনে নিলেননা, সর্বহারা কর্ণ মর্ম, সত্য এবং মনুষ্যত্বের জটিল দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যুদ্ধকেই শ্রেয় মনে করলেন। 'জয়দ্রথ বধে'র ঘটনা দেখেও জীবন-বিতৃষ্ণ কর্ণ কিছুতেই কৃষ্ণের নারায়ণত্ব স্বীকার করতে রাজী নন—'সত্য যতদিন নিজে নাহি উপলব্ধি করি/ততদিন বিধাতাও দিলে সাক্ষী/মানব বলিব বাসুদেবে।' এরপর পত্নীর নিকট থেকে বিদায়, ঘটোৎকচ বধ একে একে ঘটেছে।

নাটকের সমাপ্তি অংশ এসে পৌছুল। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে কর্ণের রথচক্র মাটিতে মগ্ন, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কর্ণ বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবেন কোন অসাধারণ শক্তিতে কৃষ্ণ বাসুকি-প্রদত্ত নাগ অস্ত্রকে পর্যন্ত ব্যর্থ করলেন! যে কৃষ্ণ স্বপ্নঘোরে কৃষ্ণের মূর্তি দেখে, বিশ্বরূপ দেখে তাঁর নারায়ণত্ব স্বীকার করেননি, আজ সেই কৃষ্ণের উদ্দেশে বলেন—

...দেবের যা সাধ্য বহির্ভূত,
বাঁচাতে সখারে তুমি সে কার্য করিলে।
ওই নমনীয় দেহে ধরে কি বিশ্বের
ভার, হে কৃষ্ণ করিলে তুমি কপিধ্বজে
ভূতলে প্রোথিত ?... ...

বিশ্বের প্রতি অসীম অভিমান নিয়ে কর্ণ ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। মৃত্যু যে কত করুণ, মর্মভেদী, যন্ত্রণা-দীর্ণ হতে পারে কর্ণের মৃত্যু না দেখলে তা বোঝা যায় না।

কর্ণ চরিত্রে ট্রাজেডির উপাদান যথেষ্ট। ক্ষীরোদপ্রসাদ নাটকের শেষে কোন 'ক্রোড়-অঙ্ক' যুক্ত করেননি। দৈবের সঙ্গে, পুরুষকারের সঙ্গে চরম সংগ্রামে একটি

মহৎ চরিত্রের পতনে ট্রাজেডি কম নেই। গুরুর অভিশাপ, দ্রৌপদী কর্তৃক অপমান, জন্মরহস্যের তিক্ততা, নিয়তির একচক্ষু আক্রমণ—ইন্দ্রের প্রতারণা—ইত্যাদি ঘটনাগুলি সেই ট্রাজেডির ক্রমান্বয়ী রূপ। কর্ণ বারংবার সংগ্রাম করেছেন সত্য, কিন্তু নাট্যকারের কৃষ্ণ চরিত্রে নারায়ণত্ব প্রতিষ্ঠায় মূল লক্ষ্য স্থাপিত হওয়ায় এই ট্রাজিক রস একটি নিটোল রূপ পায়নি। নাট্যকার কোন ক্রোড়-অঙ্ক যুক্ত না করলেও এই নাটকের শেষ দৃশ্যটি অনেকটা পৌরাণিক নাটকের ক্রোড়-অঙ্কের সমতুল্য। নর-নারায়ণ নাটকে মোট ত্রিশটি চরিত্র আছে। কিন্তু দুর্যোধন, যুধিষ্ঠির, কুন্তী, অর্জুন, পদ্মাবতী, বৃষকেতু প্রমুখ কোন চরিত্রই বলয়াকৃতি পায়নি। এর মধ্যে ব্যতিক্রম দ্রৌপদী। যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদীর বহ্নিমান চরিত্র সুঅঙ্কিত। দুঃশাসনের কেশলাঞ্ছনা, বস্ত্রহরণ, দুর্যোধনের উরুদর্শনে আর্ত দ্রৌপদীর তীব্র অভিমান, শ্লেষ এবং প্রতিশোধস্পৃহা চরিত্রটিকে 'জীবন্ত' করেছে। দ্রৌপদী চরিত্রে ক্ষাত্রতেজ, ধর্মনিষ্ঠা এবং নারীর সুকুমার চিত্তের চমৎকার বিকাশ নাট্যকার দেখিয়েছেন।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের সফল পৌরাণিক নাটকসমূহের মধ্যে 'নর-নারায়ণ' অন্যতম। এই সাফল্যের পিছনে আছে ক্ষীরোদপ্রসাদের ভাষা-প্রয়োগ। কখনও এই ভাষা অপূর্বভাবে প্রকাশ করে কর্ণের অন্তর্জ্বালা—

প্রতিযোদ্ধা-জ্ঞানে এতকাল যার বধে
নিশিদিন করিয়াছি উপায় কল্পনা—
অদৃষ্টের তীব্র পরিহাস—
আজ সে আমার কৃষ্ণ কনিষ্ঠ সোদর !
দূর হতে যারে দেখে প্রমত্ত কামনা
ছুটিবে বাঁধিবে বক্ষে মুগ্ধ আলিঙ্গনে
হে প্রিয়, হে প্রিয়তম—
এক হস্ত চক্ষে দিয়া,
অন্য বাহু প্রসারিয়া,
বিঁধিতে হইবে মোরে মর্মহীন শরে—
প্রাণাধিক সেই ধনঞ্জয়ে। [২/৪]

কখনও এই ভাষায় সংলাপে আসে দ্রুতগতি :

কর্ণ। —বল, কিন্তু কি বলিবে জানি প্রিয়তমে।

পদ্মা। —কৌরব মরেছে বহুদিন।

কর্ণ। —জানি—জানি। যেদিন কৌরব-সভামাঝে
রজস্বলা দ্রৌপদীর হয়েছে লাঞ্ছনা।

পদ্মা। —সেদিন মরেছে ভীষ্ম, সেদিন মরেছে
দ্রোণ।

কর্ণ। —জানি—জানি—সে সঙ্গে মরেছি আমি।

বাংলা পৌরাণিক নাটকে সঙ্গীত প্রয়োগের ক্ষেত্রে একমাত্র দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যতীত অন্যান্য নাট্যকারগণ গিরিশচন্দ্র কর্তৃক কমবেশী প্রভাবিত। ক্ষীরোদ-প্রসাদ ও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নন। "বালকগণ, পুরবাসীগণ, বিলাস রঙ্গিনীগণ, সঙ্গিনীগণ, পুরনারীগণ, ধর্মপত্নীগণ (মন্দাকিনী নাটকে), সখীগণ, পুরবাসীগণ, দেববালাগণ, বন্দিনীগণ (ভীষ্ম নাটকে), চারণীগণ (নরনারায়ণ নাটকে)—এই সব নাটকের সঙ্গে অপ্রত্যক্ষভাবে জড়িত চরিত্রের মুখে গিরিশচন্দ্র যেভাবে গান জুড়ে দিয়েছিলেন সেইভাবে ক্ষীরোদপ্রসাদও জুড়ে দিয়েছেন। মন্দাকিনী ও নরনারায়ণ-এ শুধু গান দিয়েই একটি করে দৃশ্য রচিত হয়েছে।"[৩৮]

অন্যান্য পৌরাণিক নাট্যকারগণ ॥

দ্বিজেন্দ্রলাল এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ বাংলা পৌরাণিক নাটকের ধারাটিকে যেমন রক্ষা করেছিলেন তেমনই পৌরাণিক নাটকের মধ্যে বিংশ শতকীয় নাট্যভাবনা ও নাট্যরীতির সঞ্চার করেছিলেন। এর পর বাংলা নাটক একান্তই আধুনিক নাট্যদর্শকদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে পড়ে। ফলে পৌরাণিক নাটক রচনায় উৎসাহ নাট্যকারদের মন থেকে দূরে সরে যেতে থাকে এবং সেই শূন্যস্থানে সামাজিক ও রাজনৈতিক নাটকের প্রাধান্য সঞ্চারিত হতে থাকে। প্রথম এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সন্ধিপর্বে অপরেশচন্দ্র মুখো-পাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এবং মন্মথ রায় পৌরাণিক নাটকের ক্ষীয়মান স্রোতটিকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের পৌরাণিক নাটকে ঊনবিংশ শতাব্দীর দেববিশ্বাস এবং ভক্তিরস হুবহু প্রবাহিত না হলেও অতি-আধুনিক সমাজে পৌরাণিক নাটক রচনায় তাঁদের উৎসাহ উল্লেখ করার মত।

৩৮. প্রভাতকুমার গোস্বামী : বাংলা নাটকে গান,

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥

নট ও নাট্যকার অপরেশচন্দ্রের (১৮৭৫-১৯৩৪) প্রথম নাটক রামানুজের রচনাকাল ১৯১৪। এর পূর্বেই গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু হয়েছে। অপরেশচন্দ্রের নাট্যমানস একান্তই গিরিশচন্দ্রের ভাবাদর্শে অনুপ্রেরিত। তাঁর প্রথম নাটকটির উপরই গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক-সংস্কারমূলক চরিত নাটকের প্রভাব পড়েছে। তবে গিরিশচন্দ্রের নাটকের মত ভক্তিরস আয়ত্ত করার প্রতিভা অপরেশচন্দ্রের ছিল না। এই সূত্রে বলা যায় যে, চৈতন্যলীলা রচনা করে গিরিশচন্দ্র যে খ্যাতি পেয়েছিলেন, 'গৌরাঙ্গ' লিখে অপরেশচন্দ্র সেই খ্যাতির চূড়া ছুঁতে পারেননি। এর কারণ গিরিশচন্দ্রের চৈতন্য যে পরিমাণে মানবায়িত, অপরেশচন্দ্রের গৌরাঙ্গ সেই পরিমাণে অলৌকিকতায় আচ্ছন্ন।

প্রেমভক্তিমূলক নাটক রচনায় এই জড়তা অপরেশচন্দ্র আংশিক কাটিয়ে উঠেছেন তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলিতে। কর্ণার্জুন তাঁর প্রথম পৌরাণিক নাটক; এর পর লেখেন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, শকুন্তলা এবং পুষ্পাদিত্য। কর্ণার্জুন রচনার পূর্বে রচিত তাঁর 'উর্বশী' নাটক এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্য-আশ্রয়ী 'ফুল্লরা' সামান্যমাত্র কৃতিত্ব লাভ করতে পারেনি। অপরেশচন্দ্রের কর্ণার্জুনই একমাত্র উল্লেখযোগ্য পৌরাণিক নাটক। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরামচন্দ্র নামক নাটক দুটিতে যথাক্রমে কৃষ্ণ এবং রাম চরিত্রের পৌরাণিক ধারাবিবরণ আছে মাত্র।

অপরেশচন্দ্রের কর্ণার্জুন রঙ্গালয়ে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। মহাভারতের উপেক্ষিত কর্ণ চরিত্র নাট্যকারের সহানুভূতিতে অপরূপ ভাস্বরতা লাভ করেছে। এই নাটকটির সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর পূর্ব পরিকল্পনা ত্যাগ করেন এবং পরে 'কর্ণ' নামকরণের পরিবর্তে তাঁর নাটকের নাম দেন 'নরনারায়ণ'।[৩৯]

৩৯. 'নরনারায়ণ' নাটকের নিবেদন অংশে সতীনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—'পরে যখন ক্ষীরোদপ্রসাদ পুনরায় লেখা আরম্ভ করেন তখন নবগঠিত আর্ট থিয়েটার লিমিটেড কর্তৃক সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার স্বর্গীয় অপরেশচন্দ্রের কর্ণার্জুন নাটক অভিনয়ের আয়োজন সংবাদে কর্ণ লেখা বন্ধ রাখিয়া আলমগীর প্রভৃতি অন্যান্য নাটক লিখিতে বাধ্য হয়েন।'

অপরেশচন্দ্রের কর্ণার্জুন নাটকের সঙ্গে ক্ষীরোদপ্রসাদের নরনারায়ণ নাটকের কাহিনী, চরিত্র এবং রসগত মিল লক্ষণীয়। কর্ণ চরিত্রের অন্তলাম্ভ ট্রাজেডি উভয় নাট্যকারই অনুভূতির কলমে লক্ষ্য করে এঁকেছেন, দুটি নাটকেই কর্ণ চরিত্রের করুণ পরিণতির জন্য দায়ী নিয়তি। অবশ্য নিয়তির প্রভাবটি ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে নেপথ্যে কাজ করেছে আর অপরেশচন্দ্রের নাটকে নিয়তি যেন একটি সজীব চরিত্রের ভূমিকায় উপস্থিত। কর্ণার্জুন নাটকের কোথাও কোথাও নাটকীয়তার সংযম বাঁধ ভেঙে ছড়িয়ে পড়েছে, নরনারায়ণ নাটকে সেই ত্রুটি চোখে পড়ে না।

আর্ট থিয়েটারের প্রথম অভিনয় রজনীতে কর্ণার্জুনেরও প্রথম অভিনয়। কর্ণার্জুন যে তৎকালীন শিক্ষিত দর্শক সমাজকেও বিপুলভাবে আকর্ষণ করেছিল তার প্রমাণ নাটকটির একটানা তিনশ' রজনীর অভিনয়। কর্ণার্জুনের পূর্বে আর কোন নাটক এই গৌরব অর্জন করেনি।

নাট্যকার অপরেশচন্দ্র গিরিশ-প্রতিভার নিকট উৎসর্গীকৃতপ্রাণ। গিরিশচন্দ্রের সমগ্র নাট্যকলা সম্পর্কে এবং নাট্যমনন সম্পর্কে অপরেশচন্দ্র তাঁর 'বাংলা নাটক ও গিরিশযুগ' শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তাই লিখেছিলেন—

> যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, গিরিশচন্দ্র নাট্যশালা হইতে বাঙালী জাতিকে তাহার প্রাণের তারে যে সুর অনাহত অবস্থায় ছিল, সে সুরে সুর তুলিয়া তাহাকে জাগাইয়াছেন। মাতাইয়াছেন, আত্মপ্রসাদে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। [৪০]

সেই গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের অনুকরণের ইচ্ছা অপরেশচন্দ্রের মনে সঙ্গত কারণেই জেগেছিল। সংলাপে, সঙ্গীতে এবং করুণরসে তাঁর নাটক গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকেরই বেশী ঘনিষ্ঠ, দ্বিজেন্দ্রলাল অথবা ক্ষীরোদ-প্রসাদের নয়। অপরেশচন্দ্রই বাংলা পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের শেষ যথার্থ উত্তরসূরী।

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ॥

অপরেশচন্দ্রের মত যোগেশ চৌধুরীও (১৮৮৯—১৯৪১) একাধারে নট এবং নাট্যকার। তৎকালীন অপরাপর নাট্যকারের মত তিনিও প্রধানতঃ

৪০ । রূপ ও রঙ্গ, ৩রা আশ্বিন, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ

ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের দিকে তাকিয়ে নাটক লিখতেন। তাই ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক তিনি যেমন লিখেছিলেন তেমনই লিখেছিলেন প্রহসন। আবার এরই পাশাপাশি রচিত হয়েছে তাঁর পৌরাণিক নাটক 'সীতা', 'রাবণ' এবং 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া'। মৃত্যুর পূর্বের শেষ প্রায় দশটি বছর তিনি একটিও পৌরাণিক নাটক লেখেননি। একথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে, যে পৌরাণিক নাটক লিখে তাঁর নাট্যজীবনের সূচনা, যে পৌরাণিক নাটক নাট্য-কাররূপে তাঁকে সর্বাপেক্ষা বেশী জনপ্রিয় করেছিল, সেই পৌরাণিক নাটক রচনার প্রতি শেষ জীবনে তাঁর কি বিস্ময়কর নীরবতা! অবশ্য এর জন্য দায়ী নাট্যকার নন, দায়ী তৎকালীন দর্শকসমাজ।

সীতার বনবাসের কাহিনী নিয়ে যোগেশচন্দ্রের পূর্বে গিরিশচন্দ্র সহ বেশ ক'জন নাট্যকার পৌরাণিক নাটক লিখেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা'র জনপ্রিয়তা অপরিমেয়। এর অন্যতম কারণ সীতা চরিত্রের অন্তরে দ্বিজেন্দ্রলাল মানবিকতার একটি বিচিত্র স্পর্শমণি ছুঁইয়েছিলেন। এজন্য দ্বিজেন্দ্রলালকে অবশ্য সীতা চরিত্রকে পরিবর্তিত করতে হয়নি। যোগেশ চৌধুরীর সীতাও মানবী-রসোজ্জ্বল। কর্তব্যনিষ্ঠ রামচরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রেও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্র-অনুসারী। শম্বুকের উক্তিতে আমরা বিংশ শতাব্দীর যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তাধারারই প্রতিধ্বনি শুনি।

পৌরাণিক নাটকে অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশের সুযোগ অন্তত কম, বিশেষতঃ রামের ন্যায় চরিত্রে—পুরাণে যিনি দ্বন্দ্বহীন একটি সরলরেখ চরিত্রমাত্র। যোগেশচন্দ্র কৌশলে রামচরিত্রে কর্তব্যের সঙ্গে প্রেমের একটি প্রচণ্ড সংগ্রামের ঘনীভূত রূপ দিয়েছেন। এজন্যই অপরেশচন্দ্রের কর্ণার্জুনের মত যোগেশচন্দ্রের সীতাও সর্বাধিক জনপ্রিয় নাটক। অপরেশচন্দ্রের ন্যায় যোগেশচন্দ্রেব পৌরাণিক নাট্যশিল্পের উপরও গিরিশচন্দ্রের প্রভাব পড়েছে তবে আধুনিক নাট্যকার রূপে তাঁর উপরে এই প্রভাব তুলনামূলক ভাবে কম। এই সূত্রে রাবণ, বিভীষণ এবং রাম চরিত্রের কথা উল্লেখযোগ্য। তবে তাঁর রাবণ মধুসূদনের রাবণ নয়, কৃত্তিবাসের সেই রামভক্ত রাবণ। হয়ত বিংশ শতাব্দীর দর্শকদের চাহিদায় নাটকটি আলোড়ন তুলতে সে কারণেই ব্যর্থ হয়েছে।

যোগেশচন্দ্রের তৃতীয় পৌরাণিক নাটক শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া। এই পুষ্পস্বরূপা নারী চরিত্রটি ষোড়শ শতাব্দীর চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলিতে প্রায় উপেক্ষিতা।

নাট্যকারকে সেজন্য প্রচলিত জনশ্রুতি এবং নিজস্ব কল্পনার উপরই নির্ভর করতে হয়েছে। এর ফলে চরিত্রটির পৌরাণিক ধর্ম আংশিক ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সীতা নাটকের মত বিপুল জনপ্রিয়তা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার ভাগে জোটে নি। শিশিরকুমার ভাদুড়ী আমেরিকায় ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে সীতা মঞ্চস্থ করেছিলেন। এর এক বছর পরে রঙমহল থিয়েটারের উদ্বোধন হয় (৮ই আগষ্ট ১৯৩১) বিষ্ণুপ্রিয়া অভিনয়ের মধ্য দিয়ে।

অতঃপর যোগেশচন্দ্র ঐতিহাসিক নাটক, সামাজিক নাটক এবং প্রহসন রচনার দিকে মন দেন। পৌরাণিক নাটক রচনায় এ সময়ে তাঁর নীরবতার কারণ তৎকালীন পরাধীনতার জ্বালা, সামাজিক অবক্ষয় ইত্যাদির জন্য দর্শক সমাজের জীবন্ত ঘটনার প্রতি রসতৃষ্ণা। সেকালের বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে পৌরাণিক নাটকের অভাবটি বেশ চোখে পড়ে। রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকায় যোগেশচন্দ্র বাঙালী দর্শকদের হৃদস্পন্দন ভাল-ভাবেই অনুভব করেছিলেন এবং সেজন্যই তাঁর পৌরাণিক নাটক রচনাতে মধ্যাহ্নেই সন্ধ্যার ছায়া নেমে এসেছিল।

মন্মথ রায় ।।

বাংলা নাটক রচনায় মন্মথ রায়ের (১৮৯৯-) শিক্ষানবিশী পর্বে ক্ষীরোদপ্রসাদ, অপরেশচন্দ্র প্রমুখ নাট্যকারগণ জীবিত ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকের এই পর্বে ভারতবর্ষ তথা বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে এক প্রচণ্ড সংঘর্ষের অঙ্কুরবিকাশ। নাট্যকার মন্মথ রায় পৌরাণিক নাটক রচনার মাধ্যমেই তাঁর নাট্যকার জীবন শুরু করেন। কিন্তু তাঁর পৌরাণিক নাটক প্রচলিত পুরাণ কাহিনীর নাট্যরূপ মাত্র নয়, অথবা দ্বিজেন্দ্রলাল-ক্ষীরোদ-প্রসাদের মত যুক্তি ও মানবিকতায় তাঁর নাটক আচ্ছন্ন নয়—তাঁর নাটকেই প্রথম পুরাণের আবরণে সমকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতার চিত্র আত্মপ্রকাশ করল। এই দিক থেকে বলা যায় বাংলা পৌরাণিক নাটকে মন্মথ রায় যেমন আধুনিক শৈলীর জনক তেমনই এই ধারার তিনি একক, অনন্য নাট্যকার।

মন্মথ রায়ের চারটি পৌরাণিক নাটক—চাঁদ সদাগর (১৯২৭), দেবাসুর (১৯২৮), কারাগার (১৯৩০), এবং সাবিত্রী (১৯৩১) —আলোচনা করলে প্রথমেই দেখা যায় তাঁর নাটকের মধ্যে আচারসিদ্ধ দেবতা অনুপস্থিত,

দেবদেবীর পোষাক পরে যেন নরনারীরাই চলাফেরা করছেন। নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসকার ঠিকই বলেছেন :

> পৌরাণিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়াও অতি-আধুনিক যুগের মনোভাব যে সার্থকভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে, এই যুগের সুপরিচিত নাট্যকার মন্মথ রায়ের নাটকগুলিই তাহার প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িককালেই পৌরাণিক বিষয়বস্তুর ব্যবহার নাটকের মধ্যে অপ্রচলিত হইয়া আসিতে থাকিলেও মন্মথ রায় তাহাই তাঁহার নাট্য-রচনার অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহাদের মধ্য দিয়া তাঁহার যে বক্তব্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার ভক্তি এবং ভাব দুইই অতি-আধুনিক—তাহাদিগকে কোনমতেই পূর্ববর্তী যুগের বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। পৌরাণিক নাটক হইলেও পৌরাণিক নীতি কিংবা ধর্মের গুণকীর্তন তাঁহার নাটকে নাই; বরং তাহাদের পরিবর্তে অতি-আধুনিক মনোভাবই তাহাদের মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে।[৪১]

মন্মথ রায়ের পৌরাণিক নাটক 'চাঁদ সদাগর' মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা মানবিক, সংগ্রামী চরিত্রের নাট্যরূপ। চাঁদ সদাগর দেবী মনসার বিরুদ্ধে প্রস্তরকঠিন সংগ্রামী প্রতিজ্ঞা নিয়ে যে চারিত্র্যশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, বিংশ শতাব্দীর পরাধীন বাঙালী চরিত্রে সেই তেজ এবং বীর্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন বলেই নাট্যকার সুদূর পুরাণের পরিবর্তে বাঙালীর পুরাণকেই তাঁর প্রথম আদর্শ করেছিলেন। তৎকালীন সংবাদ-সাময়িকীর মতে—

> নাটকখানি আমাদের ভাল লেগেচে নাট্যকারের চরিত্রাঙ্কন ও ঘটনা-সংস্থাপনের প্রশংসনীয় দক্ষতায়।...পুরাণোল্লিখিত চরিত্রের ওপর কল্পনার তুলিতে তিনি যে রঙ ফলিয়েছেন, তা বাস্তবিকই অনিন্দনীয়।[৪২]

মন্মথ রায়ের পৌরাণিক নাটকগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, পৌরাণিক চরিত্রগুলির উপর সমকালীন জীবন-চিন্তার ছাপ। অত্যাধুনিক নাটকের

৪১. আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬১, পৃঃ ৩৬৫-৬৬

৪২. আত্মশক্তি, ৪ঠা কার্তিক, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ

মুখ্য উপাদানই হল চরিত্র, মুখ্য লক্ষ্য হল সেই চরিত্রের জটিল জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর-সঞ্চয়। মন্মথ রায়ের পূর্বে বেশ কয়েকটি বাংলা পৌরাণিক নাটকে শচী, শ্রীবৎস, চিন্তা, কংস, শ্রীকৃষ্ণ, সাবিত্রী, সত্যবান প্রভৃতি চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে, কিন্তু যে চরিত্রগুলি ছিল একান্ত প্রথাসিদ্ধ তাদের কাছে মন্মথ রায় ঋণ গ্রহণে যাননি। তাঁর নাটকে সেই চরিত্রগুলিই পুরাণের অথবা পূর্ববর্তী পৌরাণিক নাট্যকারদের অনুসরণে অঙ্কিত না হয়ে একটি যুগানুসারী রূপ পরিগ্রহ করেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পৌরাণিক নাট্যকার কালীপ্রসন্ন সিংহ, কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং বিংশ শতাব্দীর নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকের সাবিত্রী চরিত্র মহাভারতের বনপর্বে প্রদত্ত চরিত্রের হুবহু অনুসরণ মাত্র। কিন্তু মন্মথ রায়ের সাবিত্রী আধুনিক সমাজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপিয়াসী নারী-সমাজের প্রতিনিধি। তাঁর কারাগার নাটকের বিদুর চরিত্র বাংলা পৌরাণিক নাটকে একক। পূর্ণচন্দ্র শর্মা, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ নাট্যকারগণ শ্রীবৎস রাজার চরিত্রে ভক্তিভাব আরোপে সতর্ক ছিলেন, বিপরীতে মন্মথ রায় ভক্তির স্থানে নিয়তিকে বেশী স্থান ছেড়ে দিয়েছেন। সতী চরিত্র সৃষ্টিতে নাট্যকার যে অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রয়োগ করেছেন, পূর্ববর্তী আর কোন নাট্যকারের রচনাতে তেমন দেখা যায়না।

'দেবাসুর' নাটক রচনা সূত্রে নাট্যকার সুদূর বৈদিক গ্রন্থের বলাসুর-দধীচির কাহিনীতে চোখ পেতেছেন, কিন্তু সুপ্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীকে তিনি যেন সমকালেই প্রতিফলিত করেছেন। পরাধীন ভারতবাসীর চোখে তখন বঙ্কিমচন্দ্রের দেশজননীর স্বপ্ন অনির্বাণ হয়ে রয়েছে। দেবাসুর নাটকের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে মনে এসে যায়—

দধীচি। ···(সুর্যার প্রতি)···আজ দেশেব এই দুর্দিনে মা চাই—যে মা সন্তানকে শুধু আদর দিয়ে স্নেহকাতর করে না···ভালবেসে শুধু ভালবাসা শেখায় না, চাই সেই মা...যে মা দেশের অপমানকে নিজের অপমান মনে করে,···এবং সে অপমানের গ্লানি দুর করবার ভার তার সন্তানের হাতে দেয়···চাই সেই মা, যে মা সন্তানকে বলে এই যে দেশ এ তোমার মাতারও মাতা···পিতারও পিতা··· দেবতারও দেবতা। সেই পরম দেবতার পূজো করো···সেই

> পরম দেবতার জন্য প্রাণ দিতে হয়—প্রাণবলি দাও…বংশের মুখোজ্জ্বল হবে…জীবন সফল হবে…মৃত্যু সার্থক হবে। —এই শিক্ষা…এই শিক্ষা…এই শিক্ষা। অসুর তোমাদের পায়ের তলে লুটিয়ে পড়বে, কারাবন্ধন খসে যাবে—মুক্ত দেবতার জয়ধ্বনিতে সুরলোক আবার স্বর্গ হবে।… (২য় অঙ্ক, দৃশ্য)

দেবাসুর পঞ্চাঙ্ক নাটক এবং প্রতিটি অঙ্কে মাত্র একটিই দৃশ্য। এই নাটকটিকে নাট্যকার পৌরাণিক নাটক বলতে চাননি।[৪৩] কিন্তু কারাগার যদি পৌরাণিক হয় তা হলে দেবাসুরকেও পৌরাণিক নাটক বলতে বাধা থাকে না।

কারাগার যেমন পৌরাণিক নাটক তেমনই বিস্তারিত অর্থে রূপক নাটকও বটে। কিন্তু সেই রূপকের বাতাবরণ নাট্যকারের অন্তর্জ্বালায় তীব্র হয়ে উঠেছিল বলেই তৎকালীন বিদেশী সরকার নাটকটিকে বাজেয়াপ্ত করেছিল। দীনবন্ধুর নীলদর্পণ (১৮৬০) নাটকে ভারতবাসীর অর্থনৈতিক অসহায়তার প্রকাশ সহজসাধ্য ছিল কেননা নাটকের স্থান এবং কাল ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ। কিন্তু কারাগার নাটকে পরাধীন জাতির রাজনৈতিক অসহায়তার কথা পুরাণের কাহিনী ও চরিত্রের আধারে পরিবেশন করতে হয়েছিল। কারাগারের জনপ্রিয়তাই প্রমাণ করে এই কঠিন কাজে নাট্যকার সফল-উত্তীর্ণ।

মন্মথ রায় গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল অথবা ক্ষীরোদপ্রসাদের সমকক্ষ নাট্যকার নন সত্য, কিন্তু তিনি পৌরাণিক কাহিনীর আশ্রয়ে পরাধীন ভারতবাসীর অপরিসীম মর্মকাতরতার রূপটি যে ভাবে ফুটিয়েছেন অপর কোন নাট্যকার সেই পদ্ধতি পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার কথা কখনই ভাবেননি। সমকালীন বিক্ষুব্ধ জনচিত্তে ভক্তির বারিসিঞ্চনই যে একমাত্র নাট্যাদর্শ হতে পারে না এই ভাবনায় পুষ্ট হয়েছিলেন বলেই মন্মথ রায়ের পৌরাণিক নাটকগুলির একটি বিশিষ্ট মূল্য আছে।

৪৩. নাটকখানিকে বৈদিক নাটক বলিলে ভুল বলা হইবে কিনা জানি না, কিন্তু পৌরাণিক নাটক বলিলে যে বিশেষ ভুল করা হইবে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। অনেক স্থলে আমার পরিকল্পনা পুরাণের বিরোধীও বটে।
—দেবাসুর : 'লেখকের কথা' দ্রষ্টব্য

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রনাথের পুরাণ-নির্ভর নাটক ॥

বাংলা নাট্যজগতে রবীন্দ্রনাথের পদপাত পৌরাণিক নাটকের ঐশ্বর্যের যুগেই। তাঁর ঈষৎ পূর্বে এবং সমকালে তারাচরণ শিকদার, মনোমোহন বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাজকৃষ্ণ রায়, অমৃতলাল বসু, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ আরও অনেক নাট্যকার জরাতুর হিন্দু-ধর্মের পুনরুজ্জীবনের শপথ নিয়ে পৌরাণিক নাটক লিখলেন, উদ্দেশ্য বাঙালীর জীবনে ধর্মের জোয়ার বইয়ে দেওয়া। গিরিশচন্দ্র তাঁর 'নাট্যকার' প্রবন্ধে বললেন-'ধর্মপ্রাণ হিন্দু ধর্মপ্রাণ নাটকেরই স্থায়ী আদর করিবে?' এঁদের পৌরাণিক নাটক রচনার পিছনে যে কারণটি সবচেয়ে যথেষ্ট ছিল তা হল, খ্রীষ্ট এবং ব্রাহ্মধর্মের দ্রুত প্রসারের হাত থেকে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করা। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্রাহ্মধর্মের অপ্রতিহত গতির কাছে জরাতুর হিন্দুধর্ম একরকম নত হয়েই ছিল। ১৮৭২-এ কেশবচন্দ্র-দেবেন্দ্রনাথ বিরোধ প্রবল হয়ে উঠলে পুরাণভ্রষ্ট বাঙালী আবার অতীত কাহিনীর স্মৃতিমন্থনে ব্যাকুল হল। কাব্যে নবীনচন্দ্র, প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এবং নাটকে গিরিশচন্দ্র বাঙালীকে আবার পুরাণ-কথা শোনালেন। গিরিশচন্দ্রের পথ ধরে শতাব্দীর শেষ তিনটি দশকে অজস্র পৌরাণিক নাটক হিন্দুর মন এবং চোখ ভরিয়ে তুলল। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, যদি-না পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টধর্ম এদেশে প্রবল হত, যদি-না ব্রাহ্মধর্মের প্রসার ঘটত তাহলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এত অধিক সংখ্যায় পৌরাণিক নাটক লেখা হত না। রামকৃষ্ণের ভক্তি-বিশ্বাস এবং বিবেকানন্দের জীবনবাদ পৌরাণিক নাট্যকারদের ধ্রুবতারার মত পথ দেখিয়েছিল।

অপরদিকে পৌরাণিক নাটকের এই প্রশ্নহীন ভক্তিবিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের মোটেই ভাল লাগেনি। গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, নাট্যকাব্য, রূপক-সাংকেতিক নাটক, নৃত্যনাট্য, সামাজিক নাটক এবং প্রহসন লিখলেও ঠিক সেই কারণেই তিনি পূর্ণাঙ্গ পৌরাণিক নাটক লেখার দিকে ঝোঁকেননি। 'ব্যঙ্গকৌতুক'

গ্রন্থের 'সারবান সাহিত্য : নাটক' শীর্ষক রচনায় তিনি বাংলা নাটকের মধ্যে সারপদার্থের যে একান্ত অভাব তা উল্লেখ করতে আদৌ কুণ্ঠিত হননি। পুরাণের কাহিনীগুলিকে নিয়ে রচিত গীতিনাট্য ও নাট্যকাব্যগুলি তাই পৌরাণিক নাটক নয়, পুরাণ-বিষয়াশ্রয়ী কাব্য। তাঁর দুটি গীতিনাট্য বাল্মীকি প্রতিভা (১৮৮১) ও কালমৃগয়া (১৮৮২) ছাড়াও চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২), বিদায়-অভিশাপ (১৮৯৪), গান্ধারীর আবেদন (১৩০৬), নরকবাস (১৩০৪), এবং কর্ণ-কুন্তী সংবাদ (১৩০৬) ইত্যাদি পুরাণ-নির্ভর রচনাগুলি পৌরাণিক নাটক নয়, কেননা কবির মনে কোন পৌরাণিক বিশ্বাস, বিশেষ পার্বণ-বিধি ছাপ ফেলতে পারেনি। তাঁর নিজস্ব অধ্যাত্মবাদ মূর্ত হয়েছে শারদোৎসব, রাজা, অচলায়তন ইত্যাদি নাটকে। রবীন্দ্রনাথ পুরাণের ভক্তিবিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠার মূলসুরটি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের দুটি গীতিনাট্য বাল্মীকি প্রতিভা এবং কালমৃগয়া যদিও পৌরাণিক দু'একটি চরিত্রকে আশ্রয় করে লেখা কিন্তু রবীন্দ্র-চিত্তে তখন নাট্যরসের নয়, গীতিরসেরই উন্মাদনা। জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন—"বাল্মীকি প্রতিভা ও কালমৃগয়া যে উৎসাহে লিখিয়াছিলাম সে উৎসাহে আর কিছু রচনা করি নাই। ওই দুটি গ্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একটা সংগীতের উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে।"

এর প্রায় এক দশক পরে ১৮৯২-তে লেখা হল 'চিত্রাঙ্গদা'। ১৯০০ সালে 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদে'র প্রকাশকাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাট্যে পুরাণ-চেতনার ব্যাপকতা লক্ষণীয়। কাব্যগুলির ভিতর দিয়ে ধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব মনোভাব প্রকাশিত হল। তিনি বেছে নিলেন পুরাণের কোন উপেক্ষিত চরিত্রকে অথবা পৌরাণিক কোন ঘাত-প্রতিঘাতমুখর ঘটনাকে। অতঃপর এই নাটিকাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিসরে যুক্ত হল নাট্যদ্বন্দ্ব; চরিত্রগুলির আত্মায় সিঞ্চিত করা হল মানবীয় সুখ দুঃখ। ভক্তিরসের দুর্বার প্রবাহের পরিবর্তে স্থাপন করা হল যুক্তিতর্ককে।

রবীন্দ্রনাথের পুরাণ-নির্ভর নাটকে আসন পেল সমকালীন পৌরাণিক নাটকের উপেক্ষিত চরিত্রসমূহ। অর্জুন-দয়িতা চিত্রাঙ্গদা, দুর্যোধন-জননী গান্ধারী, কচ-পূজারিণী দেবযানী, প্রথম পাণ্ডব কর্ণ প্রভৃতি চরিত্রকে রবীন্দ্রনাথ

পুরাণের পৃষ্ঠা থেকে তুলে এনে মানবীয় সুখ-দুঃখে মথিত করলেন। নব-দূর্বাদলশ্যাম কৃষ্ণ, ভক্ত নীলধ্বজ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, সুপরিচিত পঞ্চপাণ্ডব অথবা রাম চরিত্র এবং রামের বনবাস, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, সীতাহরণ, চৈতন্যলীলা ইত্যাদি অতিপরিচিত প্রাচীন বা অর্বাচীন পুরাণ-কাহিনীও রবীন্দ্রনাথকে বিন্দুমাত্র আকর্ষণ করেনি।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা [১] সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল তীব্রভাষায় লিখেছিলেন—"ঘরে ঘরে বিদ্যা হইলে সংসার আঁস্তাকুড় হয়, কিন্তু ঘরে ঘরে এ চিত্রাঙ্গদা হইলে সংসার একেবারে উচ্ছন্নে যায়।" দ্বিজেন্দ্রলালের এই সমালোচনা যে উদ্দেশ্যমূলক ছিল তা এখন সকলেই জানেন, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল কেন যে বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাটক তারাচরণ শীকদারের ভদ্রার্জুন (১৮৫২) সম্পর্কে নীরব ছিলেন তা বোঝা যায়না। ভদ্রার্জুনের নায়িকা সুভদ্রা নামশ্রবণে নয়, চোখে দেখে অর্জুনকে ভালবেসেছেন। এই প্রেম জাগরণের জন্য যে মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল তারাচরণ তা দেখান নি। অর্জুনকে দেখে সুভদ্রার মনে যা জেগেছে তা প্রেমের অরুণরাগ নয়, প্রেমের বিরাগ। সত্যভামা যখন জানিয়েছেন যে গভীর রজনীতে তিনি অবশ্যই অর্জুন-সুভদ্রার মিলনের ব্যবস্থা করে দেবেন তখন দেহলালসায় কাতরা সুভদ্রা বলেছে :

তখন মিলনে বল কিবা হবে ফল।
কি হবে আহুতি দিলে নিভিলে অনল ॥

রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদাকে এই একই পরিবেশে কেমন প্রেমবিহ্বল করে এঁকেছেন তা দেখা যাক্। অর্জুনকে প্রথম দেখে চিত্রাঙ্গদা বলেছে :

যে ভূমিতে আছেন দাঁড়ায়ে
সে ভূমির তৃণদল হইতাম যদি,
শৌর্যবীর্য যাহা কিছু ধুলায় মিলায়ে
লভিতাম দুর্লভ মরণ, সেই তাঁর
চরণের তলে।

---

১. দেহী প্রেমের সীমায়তি আর যন্ত্রণা সম্পর্কে কবি যেমন নিঃসংশয়, তেমনি দেহহীন প্রেমের সম্পূর্ণতায় সুস্থির-বিশ্বাসী, সেই অসংশয়িত বিশ্বাস অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার মহাভারতীয় গল্পকে আশ্রয় করে সার্থক রূপ পেয়েছে।
—ভূদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, আধুনিক পর্যায়, কলিকাতা, ১৯৬৩, পৃঃ ১৭৩।

এরপর কামনার যে লেলিহান শিখা জ্বলে উঠেছে তা "অচেতন হয়ে গেল অসহ্য পুলকে।" অতঃপর যে চিত্রাঙ্গদা জেগে উঠেছে সে তারাচরণের সুভদ্রার মত ব্যক্তিত্বহীনা নায়িকা নয়, মাতৃত্বের গর্বের চেয়ে নারীত্বের অধিকার তার কাছে অনেক বড় :

আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি ! · ······
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী
আমারে পাইবে তবে পরিচয়।

অর্জুনের দুই প্রেমিকা সুভদ্রা ও চিত্রাঙ্গদায় কত তফাৎ ! রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদায় বিহ্বল যৌবনস্বপ্ন এবং হৃদয়াবেগের মধ্যে যে চারিত্রিক সংযম ও দৃঢ়তা আছে, দ্বিজেন্দ্রলালের পাষাণী নাটকের অহল্যা চরিত্রে তা কি পাওয়া যায় ? আমাদের বিশ্বাস চিত্রাঙ্গদায় প্রেমের বিশ্লেষণ আছে, পাষাণীতে আছে কেবল দেহলালসার উদ্দাম শিখা। ইন্দ্রের প্রত্যাখ্যানের পর তার সংলাপ স্মরণীয় :

আরো দিতে পারি। চেয়ে দেখ
এই ঘন দীর্ঘ কেশগুচ্ছ, এই শুভ্র
কুন্দ দন্তপাতি, এই সুগোল সুঠাম
তন্বী দেহলতা, এই লালসা বিহ্বল
আকর্ণ বিভ্রান্ত চক্ষু, রক্ত বিম্বাধর
পীন বক্ষ, —যত চাহ দিব, যত চাহ
পান কর। —যাইও না।

এই কারণেই চিত্রাঙ্গদা সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলালের অভিমত খাটেনি। রবীন্দ্রনাথ পৌরাণিক নাটক লেখেননি, লিখলে বাংলা সাহিত্যে চিত্রাঙ্গদা একটি স্মরণীয় নায়িকা হতে পারতো।

বিদায় অভিশাপ এবং গান্ধারীর আবেদন পড়তে গিয়ে মনে হয় বাংলা পৌরাণিক নাটকে দ্বন্দ্বহীনতা সম্পর্কে কবি সজাগ ছিলেন। এ কথা সত্য

কোন নাট্যশাখাই ভাল নাটকের জন্ম দিতে পারেনা যদি না নাটকের মধ্যে দ্বন্দ্বের ভাগ তীব্র হয়। হেগেলের মতে নাটক হল দ্বন্দ্বময় পরিস্থিতির সমষ্টি। সপ্তদশ শতাব্দীর নাট্য সমালোচক সেণ্ট এভারমণ্ড বলেছিলেন, ট্রাজেডি ও ধর্মদর্শন একই সাথে চলতে পারেনা। পরবর্তীকালে আই. এ. রিচার্ডসও এই মতকে সমর্থন করেছেন। বাংলা পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে দেখি দৈবশক্তির চেয়ে মানবশক্তির স্বরূপকে নাট্যকাররা বড় করে দেখাতে পারেননি বলেই পৌরাণিক নাটকে দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্বজনিত ট্রাজেডি সৃষ্টি সম্ভব হয়নি। রবীন্দ্রনাথের বিদায় অভিশাপ এবং গান্ধারীর আবেদন-এ মানবিক রস ঊর্ধ্বাভিগ হয়েছে বলেই নাট্যকাব্য দুটি দ্বন্দ্বদীর্ণ হতে পেরেছে।

মহাভারতের দেবযানীকে আমরা প্রথম পেয়েছিলাম মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটকে, সে নাটকে দেবযানী যযাতি-পত্নী হলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর নারী-জাগৃতিতে নবীনা। রবীন্দ্রনাথের 'বিদায় অভিশাপ'-এর ক্ষুদ্র কাহিনীটি আহৃত হয়েছে মহাভারতের পৃষ্ঠা থেকে, তবে মহাভারতে কচ দেবযানীকে প্রত্যাভিশাপ দিয়েছিলেন, বিপরীতে রবীন্দ্রনাথের কচ দেবযানীকে দিয়েছেন বর।[২] যাইহোক এই ক্ষুদ্রতম নাট্যকাব্যে একদিকে কর্তব্যের আহ্বান অন্যদিকে প্রেমের মোহময় আকৃতি—উভয়ের প্রবল দ্বন্দ্ব পাওয়া গেল। গিরিশচন্দ্রের জনা, অমৃতলালের যাজ্ঞসেনী, মনোমোহন বসুর হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি নাটকে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের যে অভাব পদে পদে দেখা যায় তা রবীন্দ্রনাথের আট-ন' পৃষ্ঠার নাটিকায় কি অপূর্ব কৌশলে তীব্র হয়েছে! দেবযানীর ব্যর্থ প্রতিহত প্রেম ক্রুদ্ধ সর্পিণীর মত সিদ্ধকাম কচকে দংশন করেছে:

তোমা 'পরে
এই মোর অভিশাপ—যে বিদ্যার তরে
মোরে কর অবহেলা, সে বিদ্যা তোমার
সম্পূর্ণ হবে না বশ—তুমি শুধু তার
ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ,
শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ।

২. 'কস্যচিৎ ভক্তস্য:' ছদ্মনামে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে লেখেন—'মহাভারতের চিত্র কিম্বা চরিত্র মহাভারতে যাহা আছে তাহার অপেক্ষা যে সুন্দর ও সুগম্ভীর করিতে পারা যায় আপনার "বিদায় অভিশাপ" পড়িবার পূর্বে সে জ্ঞান ছিল না।'
—দ্রঃ সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বৈশাখ—আষাঢ়, ১৩৮৪, পৃঃ ১৩৭

এই ক্ষুদ্র নাট্যকাব্যে দেবযানী চরিত্রে কুমারী-প্রেমের কৌতূহল, সান্ত্বনা, আশা, নৈরাশ্য, অভিমান, দহন ইত্যাদি একে একে সজ্জিত করে রবীন্দ্রনাথ পুরাণের জগতে দ্বন্দ্বের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। মধুসূদনের দেবযানী এবং রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা প্রণয়িনী ও গৃহিণী দুই-ই, প্রেয়সী সত্তা তাদের জীবনের ভগ্নাংশ মাত্র, নিটোল পরিণাম নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দেবযানী কেবলমাত্র প্রেয়সী। সে মর্ত্যের মানবী। তাই বোধহয় প্রেমস্বপ্নজাত আনন্দ এবং প্রেমভঙ্গজাত বেদনা আঘাতে-সংঘাতে তার চিত্তকে অনবদ্য করে তুলেছে।

এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বিস্ময়কর পরিচয় আছে গান্ধারীর আবেদন নাট্য-কাব্যের গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র চরিত্রে।[৩] যুক্তিবাদী রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে পিতা ধৃতরাষ্ট্রের যে হৃদয়-সংগ্রাম ঘটেছে তাতে শেষ পর্যন্ত পিতৃসত্তাই জয়ী হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গান্ধারী সত্যধর্মের জয় চেয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছেন :

পাপী-পুত্রে ক্ষমা কর যদি
নির্বিচারে মহারাজ, তবে নিরবধি
যত দণ্ড দিলে তুমি যত দোষী জনে
ধর্মাধিপ নামে, কর্তব্যের প্রবর্তনে,
ফিরিয়া লাগিবে আসি দণ্ডদাতা ভূপে,
ন্যায়ের বিচার তব নির্মমতা রূপে
পাপ হয়ে তোমারে দাগিবে। ত্যাগ করো
পাপ দুর্যোধনে।

গান্ধারীর গোপন হৃদয়ের ছবিও রবীন্দ্রনাথ পাশাপাশি এঁকেছেন :

মাতা আমি নহি ? গর্ভভার জর্জরিতা
জাগ্রত হৃদ্‌পিণ্ডতলে বহি নাই তারে ?

৩. 'গান্ধারীর আবেদন' কাহিনী-গ্রন্থের নাট্যকল্প রচনাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা যায়। এই উত্তম নাট্যকাব্যটিতে রবীন্দ্রনাথ মূলের চরিত্রগুলির ভাব প্রায় অবিকৃত রেখে সে-গুলিকে সংক্ষিপ্ত এবং উজ্জ্বল করতে চেষ্টা করেছেন, অথচ ঘটনা-সংস্থান ও সংলাপ বিষয়ে অনেকটা স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করেছেন।

—ক্ষুদিরাম দাস : রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়, কলিকাতা, ১৮৮৮ শকাব্দ, পৃষ্ঠা ১১৮

বাংলা পৌরাণিক নাটকে ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারী বহু স্থানেই আছেন সত্য, কিন্তু তাঁরা প্রাণহীন ছায়া, পুতুলমাত্র—তাঁদের মধ্যে কোথাও মানবিক বিকাশ সম্ভব হয়নি।

'নরকবাস' উচ্চাঙ্গের পুরাণাশ্রয়ী নাট্যকাব্য নয় যদিও এর কাহিনীটি পৌরাণিক। হিন্দু পুরাণে মর্ত ও স্বর্গের মধ্যবর্তী যে স্থান নরক রূপে চিহ্নিত নরকবাসে সেই পরিকল্পনাটি অনেকটা পাশ্চাত্য-আদর্শে তৈরী। এই নাট্য-কাব্যে লেখকের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ধর্মসংস্কারের হৃদয়হীনতা বর্ণনা। ফলে এই কাহিনীতে যথেষ্ট পৌরাণিক ভিত্তি আশা করা যায় না, পাওয়াও যায়নি।

রবীন্দ্রনাথের পুরাণ-নির্ভর শেষ নাট্যকাব্য 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ'। মহাভারতের সর্বাপেক্ষা জীবন্ত, দ্বন্দ্বমুখর চরিত্রকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে কোন পৌরাণিক নাট্যকার নাটক লেখেননি। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের কর্ণ-কুন্তী সংবাদ প্রকাশিত হবার পর অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ণার্জুন, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ নরনারায়ণ এবং কেদারলাল রায় কুন্তী-কর্ণ-কৃষ্ণা নাটকে কর্ণ চরিত্রকে নায়কের মর্যাদা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ দৈব-তাড়িত কর্ণ চরিত্রে যে অভিমানের অশ্রুপ্রপাত বইয়েছিলেন, পরবর্তী বাংলা নাটকে কর্ণ চরিত্র সৃষ্টিতে তাই কাজ করেছিল! দ্বিজেন্দ্রলালের পাষাণী নাটকে অহল্যার প্রতি শতানন্দের মর্মভেদী উক্তি রবীন্দ্রনাথের আক্ষরিক অনুকরণ। ব্যতিক্রম কেবল গিরিশচন্দ্র। গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডবগৌরব' নাটক ১৩০৬ এর ফাল্গুন মাসে প্রথম অভিনীত হয়। ঐ মাসেই রবীন্দ্রনাথের কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ রচিত হয়। পাণ্ডবগৌরব নাটকের তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে নদীতীরে কুন্তী ও কর্ণের মধ্যে যে কথোপকথন হয় তা দ্বন্দ্বহীন ঘটনার বিবরণ মাত্র। কুন্তীর প্রতি কর্ণের আশ্বাসবাণীতে কোন খেদ পর্যন্ত নেই :

> অবতার উপদেষ্টা মম,
> জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডবের আমি,
> উপস্থিত বিগ্রহে রক্ষিব জ্যেষ্ঠ সম…

রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যটিতে কুন্তী তাঁর কুমারী জীবনের লজ্জাকেই বুকে টেনে নিতে চেয়েছেন। অপরদিকে কর্ণের অভিমান-ক্ষুব্ধ হৃদয় একবার ব্যগ্রবাহু মেলে ধাবিত হয় জননীর দিকে :

> পুরাতন সত্যসম
> তব বাণী স্পর্শিতেছে মুগ্ধচিত্ত মম।

অস্ফুট শৈশবকাল যেন রে আমার,
যেন মোর জননীর গর্ভের আঁধার
আমারে ঘেরিছে আজি···।
কালি প্রাতে
আরম্ভ হইবে মহারণ। আজ রাতে
অর্জুন-জননী কণ্ঠে কেন শুনিলাম
আমার মাতার স্নেহস্বর ?

কুন্তীর শত প্রলোভনে, স্নেহের আকর্ষণেও কর্ণ যে সাড়া দিল না তার পিছনে জাগ্রত রয়েছে তাঁর অযাচিত জন্মরহস্য। মহাভারতের এই করুণতম চরিত্রটির মধ্যে যে নাট্যদ্বন্দ্ব সর্বাপেক্ষা ঘনীভূত ছিল তা রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন। তাই কুন্তীর প্রতি কর্ণের সংলাপেই নাট্যকার চরিত্রটির রক্তমুদ্রিত বেদনার শতদল উন্মোচন করলেন :

জয়ী হোক, রাজা হোক, পাণ্ডব সন্তান
আমি রব নিস্ফলের হতাশের দলে।
জন্মরাত্রে ফেলে গেছ মোরে ধরাতলে
নামহীন গৃহহীন—আজিও তেমনি
আমারে নির্মমচিত্তে তেয়াগো জননী
দীপ্তিহীন কীর্তিহীন পরাভব 'পরে।

পৌরাণিক নাটক রচনার সুবর্ণযুগে বসেই রবীন্দ্রনাথ পুরাণ-নির্ভর নাটক লিখেছেন। পুরাণ-নির্ভর নাটক ও পৌরাণিক নাটক এক শ্রেণীর নাট্যকর্ম নয়। পৌরাণিক নাটকে সিদ্ধরসের কোন হানি ঘটা চলবে না, যদিও পুরাণ-নির্ভর নাটকে সিদ্ধরস রক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, সিদ্ধরসের নিখুঁত অনুসরণে পৌরাণিক নাটক রচনার দিন শেষ হয়ে আসছে। তাঁর চিন্তা ভাবনা যে কত স্বচ্ছ ছিল তার প্রমাণ মেলে দ্বিজেন্দ্রলাল থেকে শুরু করে মন্মথ রায় পর্যন্ত নাট্যকারদের পৌরাণিক নাটক থেকে। রবীন্দ্রনাথের সময় থেকেই পুরাণ-নির্ভর নাটক এবং পৌরাণিক নাটকে নীতি-আদর্শ ও ভক্তির উচ্ছ্বাস কমে এসেছে, নাটকের দেহে রোমান্টিক আত্মা প্রাধান্য পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পুরাণ-নির্ভর নাটকেই এর সূচনা। অতি সাম্প্রতিক কালেও দেখছি, গিরিশচন্দ্রের ভাব, ভক্তি ও রীতি নিয়ে আর

পৌরাণিক নাটক রচনা সম্ভব হচ্ছেনা, তবে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল কিংবা মন্মথ রায়ের অনুসরণে পুরাণাশ্রয়ী নাটক রচনা চলছে।

বাংলা পৌরাণিক নাটকের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের পুরাণ-নির্ভরনাট্য-কাব্যগুলি সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ কম। তবে পৃথকভাবে রবীন্দ্রনাথের নাটকে পুরাণ-চেতনা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা হওয়া দরকার। সেই আলোচনা যে কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ বা পুরাণ-ধারণা সম্পর্কে জ্ঞানেরই সহায়ক হবে তাই নয়, বিংশ শতাব্দীর নব্যরীতি ও নব্য আদর্শের বাংলা পৌরাণিক নাটক বা পুরাণ-নির্ভর নাটকের মর্মকেন্দ্রে প্রবেশেরও সুযোগ করে দেবে বলে বিশ্বাস।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পৌরাণিক নাটকের রীতি ও গঠন ॥

পৌরাণিক কাহিনীর ভক্তিরস ও দেববিশ্বাস, অতিপ্রাকৃত ঘটনা এবং সংস্কারাগত ধর্মাদর্শ পৌরাণিক নাটকের গঠনকর্মে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। নাটকের গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষার নয়, কেননা নাটকের মধ্য দিয়ে একটি দীর্ঘকালীন ঘটনা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে প্রকাশ করতে হয়। নাটক দৃশ্যকাব্য বলেই নাট্যকারকে অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয়, দর্শকের রসানুভূতিতে ঘটনা-বিন্যাসের ত্রুটি আঘাত সৃষ্টি যেন না করে। ঐতিহাসিক নাটক, সামাজিক নাটক এবং প্রহসনে নাট্যকাহিনী গঠনে অসুবিধা জাগার অবকাশ কম কেননা এই শ্রেণীর নাট্যকারদের হাতে প্রাপ্ত উপকরণের মধ্যে নাটকীয় জটিলতা সৃষ্টির প্রভূত সুযোগ বর্তমান। পৌরাণিক নাটকে একদিকে যেমন সীমিত উপকরণ অন্যদিকে তেমনি উপকাহিনী-যোজনা এবং নূতন চরিত্রসৃষ্টির ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। সামাজিক নাটকে কাল-ঐক্য (Unity of Time) এবং স্থান-ঐক্য (Unity of Place) প্রায় সর্বত্র রক্ষিত,[১] ঐতিহাসিক নাটকে 'কালাতিক্রমণ' দোষ মাঝে মাঝে ঘটলেও নাটকের তীব্র গতিময় ঘটনা সেই ত্রুটিকে প্রায়শঃ চাপা দিয়ে দেয়। কিন্তু পৌরাণিক নাটকে এই ত্রুটি ঘটে এবং নাট্যকারের পক্ষে তা অস্বীকার করার পথ থাকে না। পুরাণ-কথিত কাহিনীর এই ত্রুটি এড়িয়ে গেলে আবার পৌরাণিক নাট্যাদর্শের বিচ্যুতি ঘটতে পারে।

বাংলা নাট্যরচনার উষালগ্নেই দেখি ইংরেজী এবং সংস্কৃত নাটকের অসংখ্য অনুবাদ। শুধুমাত্র অনুবাদকর্মেই নয়, মৌলিক নাট্যরচনাতেও এই

ঐক্যবিধি সম্পর্কে T. S. Elliot বলেছেন—I believe they (unities) will be found highly desirable for the drama of the future. ...The Unities do make for intensity.

—'Selected Essays', New York, 1932, P-58.

দুটি নাট্যধারা প্রভাব ফেলেছিল। বাঙালী নাট্যকারগণ পাশ্চাত্ত্য এবং প্রাচ্য নাটকের আঙ্গিককে সেদিন গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত হয়ে যে সকল নাট্যকার কলম ধরেছিলেন তাঁরা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য আঙ্গিকের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য রক্ষা করেছিলেন, কোন একটি শাখাকে প্রাধান্য দিয়ে অন্য শাখাকে নিশ্চিহ্ন করেননি। বাংলা পৌরাণিক নাটকের গঠন-সম্পর্কিত আলোচনার সময়ও তাই এই দুটি ধারারই পরিচয় স্মরণে রাখতে হয়। পৌরাণিক নাট্যকারগণ অঙ্ক-দৃশ্যসজ্জা, সংলাপ, দ্বন্দ্ব, গান ইত্যাদি প্রশ্নে সম্পূর্ণ নিজস্ব পথ অনুসরণ করেননি। অন্যান্য নাট্যধারার মত পৌরাণিক নাট্যধারাও নাট্যগঠনে পূর্বসূরীগণের নিকট ঋণী।

অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাগ ॥

নাটকের অঙ্কবিভাগের প্রয়োজনীয়তা সর্বপ্রথম এইজন্য, ঘটনার পৌর্বাপর্ব এবং কার্যকারণের যোগ একমাত্র অঙ্কবিভাগের দ্বারাই রক্ষিত হতে পারে। অঙ্কের পর অঙ্ক এগিয়ে যায় আর নাটকীয় কাহিনী দ্রুতি লাভ করে। নাটক যেহেতু কবিতা অথবা উপন্যাসের মত কল্পনার দ্যুতিবিলাস নয় তাই নাটকের কাহিনীকে অঙ্ক এবং দৃশ্যে পর পর সাজিয়ে ঘটনার ধারাকে পর্বে পর্বে ভাগ করতে হয়। নাট্যকারকে যেমন কাহিনীর অগ্রগতির জন্য অঙ্ক বিভাগ করতে হয়, তেমনই প্রতিটি অঙ্কের মধ্যে ঘটনা স্থাপনের জন্য আবার দৃশ্য (গর্ভাঙ্ক) বিভাগ করতে হয়।

সচরাচর নাটক পঞ্চাঙ্ক হওয়া উচিত বলেই মনে হয়। ভরত তাঁর 'নাট্যশাস্ত্রে' দেখিয়েছেন নাট্যকাহিনীর অগ্রগতি ঘটে পাঁচটি স্তরের মধ্য দিয়ে—প্রারম্ভ, প্রযত্ন, প্রাপ্তিসম্ভব, নিয়ত ফলপ্রাপ্তি এবং ফলযোগ। ইউরোপীয় নাটকেও Exposition, Rising action, climax, falling action এবং Catastrophe—এই পাঁচটি স্তরের মধ্যদিয়ে পঞ্চাঙ্ক সৃষ্টির রীতি অনুসৃত। গ্রীক ট্রাজেডিগুলি পঞ্চাঙ্ক রীতিকেই অনুসরণ করে কারণ গ্রীসের দীক্ষাবিধির অনুষ্ঠানটি পাঁচটি স্তরের মধ্যদিয়েই সম্পন্ন হত। নাট্যকার সেনেকার (খ্রীঃ পূঃ ৪-খ্রীঃ পর ৬৫) সময় থেকেই পঞ্চাঙ্ক বিভাগরীতি পাকাপাকিভাবে প্রথা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল।

বাংলা ভাষার অধিকাংশ নাট্যকার সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এমন সিদ্ধান্ত করা যায়। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে সূত্রধারের প্রবেশ ও

প্রস্থানের পর নাটকের মূল কাহিনীর সূচনার নির্দেশ একাধিক বাংলা পৌরাণিক নাটকে অনুসৃত হয়েছে। সামাজিক নাটকেও রামনারায়ণ এই নির্দেশ অনুসরণ করেছেন। তবে পঞ্চাঙ্ক রীতির কথা নাট্যশাস্ত্রে জোর দিয়ে বলা হয়নি—পাঁচটির কম বা বেশী অঙ্কও থাকতে পারে। এই বিষয়টি নির্ভর করে নাটকীয় ঘটনার 'সন্ধি'র উপর।

অঙ্কবিভাগের দিকে সংস্কৃত নাট্যকারদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিলনা। কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী' পঞ্চাঙ্ক নাটক, কিন্তু 'অভিজ্ঞান শকুন্তলমে' আছে সাতটি অঙ্ক। ভাসের 'প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধনারায়ণ' চার অঙ্কের নাটক কিন্তু 'স্বপ্নবাসবদত্তায়' ছটি অঙ্ক আছে। ভবভূতির 'মালতীমাধবে' দশটি অঙ্ক, 'মহাবীর চরিত' এবং 'উত্তর রামচরিতে' সাতটি করে অঙ্ক। শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' (দশটি অঙ্ক), ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' (ছ'টি অঙ্ক), শ্রীকৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' (ছ'টি অঙ্ক) এবং শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' (চার অঙ্ক) পঞ্চাঙ্ক রীতি-অনুসারী নয়। একমাত্র ক্ষেমীশ্বরের 'চণ্ডকৌশিক' পঞ্চাঙ্ক নাটক।

পাশ্চাত্ত্যে গ্রীক নাটকের অন্যতম স্তম্ভ এসকিলাসের প্রথম নাটকে (The suppliants) পঞ্চসন্ধি পরিকল্পনা দেখা যায় না। সফোক্লিসের নাটকে প্রলোগ, প্যারোড, এপিসোড এবং একসোডাস্-এর দ্বারা চারটি অঙ্ক-সদৃশ বিভাগ প্রথম দেখা যায়। সেনেকার নাটকেই প্রথম অঙ্ক-বিভাগ শুরু হয় এমন দাবী উঠলেও বলা যায় তাঁর পূর্বে অঙ্ক-পরিচ্ছন্ন নাটক ছিল। আলেকজান্দার-সমকালীন কমেডি রচয়িতা মিনান্দার পঞ্চাঙ্ক রীতি অনুসরণ করতেন।

ইংল্যাণ্ডে রেনেসাঁর সন্তান মার্লোর 'Dr Faustus' নাটকে অঙ্ক বিভাগ নেই, এই রীতি পরবর্তীকালে টমাস হার্ডি, বার্নার্ড শ' এবং গলসওয়ার্দির নাটকে দেখি। অঙ্কের পরিবর্তে দৃশ্যের পর দৃশ্য জুড়ে এঁদের নাট্যকাহিনী অগ্রসর হয়েছে। অন্যদিকে অনন্যপ্রতিভা সেক্সপীয়রের অঙ্ক এবং দৃশ্য বিভাগ রীতি সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী নাট্যকার পিয়েরি কর্ণেই (১৬০৬—৮৪) ও রাসিনের (১৮৩৯—৯৯) নাটকেও দেখি। এঁদের নাটকগুলি প্রধানত পঞ্চাঙ্ক রীতিতেই বিন্যস্ত।

ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বিশ্বজুড়ে নাটকীয় আঙ্গিক নিয়ে বহুমুখী গবেষণা চলতে থাকে। নরওয়ের নাট্যকার হেনরিক ইবসেন (১৮২৮—১৯০৬) যেমন

দশ অঙ্কের নাটক (Emperor and Galiban—১৮৭৩) লিখেছেন, তেমনি লিখেছেন একাঙ্ক (The Warrior's Barrow ১৮৫০-এ অভিনীত) নাটক। তিন, চার এবং পাঁচ অঙ্কের নাটকও তিনি লিখেছিলেন। সুইডেনের নাট্যকার আগষ্ট স্ট্রিণ্ডবার্গ (১৮৪৯—১৯১২) চমৎকার একাঙ্ক নাটক লিখেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পাশ্চাত্ত্য নাটকে অঙ্ক ও দৃশ্য পরিকল্পনায় নতুন নতুন দিক্‌নির্দেশ দেখা দিতে থাকে। অস্কারওয়াইল্ড (১৮৫৪-১৯০০) যেমন একাঙ্ক ট্রাজেডি ('Salome') লেখেন, তেমনি লেখেন দৃশ্যবিহীন চার অঙ্কের নাটক 'The Ideal Husband'। এর আগেই টমাস হার্ডি (১৮৪০-১৯১৮) লিখেছিলেন—১৯টি অঙ্ক এবং ১৩০টি দৃশ্যে বিভক্ত দুইখণ্ডে ধৃত 'The Dynasts' নামক মহানাটক।

বলা ভাল যে প্রত্যেক নাট্যকারই নাটকীয় কাহিনীর বিষয়বস্তুর উত্থান এবং পতনের প্রতি তাকিয়ে নাটকের অঙ্ক এবং দৃশ্যসজ্জা করে থাকেন। তাই একাঙ্ক থেকে শুরু করে পঞ্চাঙ্ক নাটক সাধারণতঃ দেখা যায়। বাংলা পৌরাণিক নাটকের অবয়ব গঠনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের এই রীতি প্রায়শঃ দেখা যায়। গিরিশচন্দ্রের 'রামের বনবাস' পঞ্চাঙ্ক নাটক, 'দক্ষযজ্ঞ' চতুরঙ্ক নাটক, 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' দ্ব্যঙ্ক নাটক, 'বৃষকেতু' একাঙ্ক নাটক, আবার 'লক্ষ্মণ-বর্জন' নাটকটি মাত্র ন'টি দৃশ্যে সম্পূর্ণ।

বাংলা যাত্রায় অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগের কোন প্রয়োজন যাত্রা রচয়িতাগণ অনুভব করতেন না। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর যাত্রাগুলিতে অঙ্ক ও দৃশ্যসজ্জা নেই। কৃষ্ণকমলের 'দিব্যোন্মাদ যাত্রা'র শুরুতে একটি গৌরচন্দ্রিকা ও একটি প্রস্তাবনা মাত্র আছে। গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রায় নাটকের মত অঙ্ক নির্দেশ রচয়িতা নিজে করেননি, তাঁর পালাগুলির সম্পাদক পাঁচকড়ি দে এই অঙ্ক-বিভাজন করেছেন। ব্রজমোহনের অনেকগুলি যাত্রায় নাটকের ন্যায় অঙ্ক, গর্ভাঙ্ক-বিন্যাস আছে, কিন্তু তাঁর রামাভিষেক, শতস্কন্ধ-রাবণবধ ইত্যাদি পালায় এই রীতি অনুপস্থিত। তাঁর যাত্রায় অঙ্ক ও দৃশ্যনির্দেশও সম্ভবত তাঁর যাত্রা-সংকলয়িতার ইচ্ছা-সঞ্জাত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদে যাত্রার ভিতরে গীতাভিনয়ের শিল্প-শৈলী অনুপ্রবিষ্ট হতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই মতিলাল রায়, ধনকৃষ্ণ সেন,

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুলকৃষ্ণ বসু, অঘোরনাথ কাব্যতীর্থ প্রমুখের যাত্রা-পালায় অঙ্ক, গর্ভাঙ্ক অথবা দৃশ্যবিভাগ ব্যবহৃত। কিন্তু এ কথা সত্য, নাটকের মত যাত্রায় জীবন-দ্বন্দ্ব তত তীব্র নয়। নাটকে ঘটনার ফাঁকে ফাঁকে যে 'সন্ধি' থাকে তার চিহ্নিতকরণের জন্য অঙ্ক-দৃশ্য বিভাগ থাকা চাই—এই 'সন্ধি' যাত্রার কাহিনীতে থাকে না। সেইজন্যই যাত্রায় অঙ্ক এবং দৃশ্য বিভাজনের প্রয়োজনীয়তা কম।

বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক 'ভদ্রার্জুন' লিখতে গিয়ে নাট্যকার তারাচরণ ভূমিকায় লিখেছিলেন—"··সংস্কৃত নাটক প্রথমতঃ অঙ্কে বিভক্ত, যাহাকে ইংরাজি ভাষায় (Act) এক্ট কহে, কিন্তু প্রত্যেক (Act) এক্ট যেরূপ Scene সিনে বিভক্ত আছে, সংস্কৃত নাটক তাদৃশ নহে, তন্নিমিত্ত Scene শব্দের পরিবর্তে সংযোগস্থল ব্যবহার করা গেল। যে স্থান ঘটিত ক্রিয়াদি নাটকে ব্যক্ত হয়, তাহাকেই (Scene) কহে।'······প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য নাট্যাঙ্গিকে সুপণ্ডিত তারাচরণ দৃশ্যের পর দৃশ্য ব্যবহারের মধ্যদিয়ে মহাভারতীয় কাহিনীর গভীরে গতি সঞ্চারে সফল হয়েছিলেন। দৃশ্যগুলির সংক্ষিপ্ততা নাটকের উৎকর্ষ বাড়িয়েছিল। 'মনে হয়, তারাচরণ নাটকখানি অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই লিখিয়াছিলেন; কারণ, ব্যবহারতঃ অভিনয়ের অনুপ-যোগী কোন দৃশ্যেরই তিনি ইহাতে সমাবেশ করেন নাই। সেইজন্যই মনে হয়, একান্ত প্রয়োজনীয় যুদ্ধ দৃশ্যগুলিও ইহাতে পরিত্যক্ত হইয়াছে।' [২] অবশ্য নাটকটির কোন অভিনয়ের সংবাদ এতাবৎ পাওয়া যায়নি।

তারাচরণের নাটকে যেমন 'Scene' শব্দের পরিবর্তে 'সংযোগস্থল' ব্যবহৃত, জে. সি. গুপ্তও তেমনি তাঁর 'কীর্তিবিলাস' নাটকে 'Scene' এর পরিবর্তে 'অভিনয়' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। হরচন্দ্র ঘোষ তাঁর নাটকে 'Scene' এর নামকরণ করেছেন—অঙ্গ। যেমন প্রথম অঙ্ক, প্রথম অঙ্গ; প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় অঙ্গ ইত্যাদি। মধুসূদন কিন্তু 'শর্মিষ্ঠা' রচনার সময়ই পাশ্চাত্ত্য নাটকের অনুসরণে অঙ্ক এবং গর্ভাঙ্ক বিভাগ করেছেন। [৩] রামনারায়ণ তাঁর

২. আশুতোষ ভট্টাচার্য: বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস: ১ম খণ্ড, ১৯৬০, পৃঃ ৯৪

৩ 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে প্রথম অংকে দুটি গর্ভাংক, দ্বিতীয় অংকে তিনটি গর্ভাংক, তৃতীয় অংকে তিনটি গর্ভাংক, চতুর্থ অংকে তিনটি গর্ভাংক এবং পঞ্চম অংকে দু'টি গর্ভাংক আছে। 'পদ্মাবতী'ও পঞ্চাঙ্ক নাটক। প্রথম অংকে কোন গর্ভাংক নেই, অন্য অংকগুলিতে তিনটির বেশী গর্ভাংক নেই। পাশ্চাত্ত্য নাটকের ঘনপিনদ্ধ অবয়ব রীতি মধুসূদনের নাটকে রক্ষিত।

'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকে এইভাবে ঘটনাসজ্জা না করলেও পরবর্তী নাটক 'নবনাটকে' একই রীতি মেনে নিয়েছেন। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কেবলমাত্র পৌরাণিক নাটকেই নয়, প্রারম্ভ যুগের সামাজিক নাটকেও নান্দী ও সূত্রধার রীতি, প্রস্তাবনা ইত্যাদি রক্ষিত। গীতাভিনয়ে পঞ্চাঙ্ক রীতিকে মনোমোহন অনুসরণ করেছিলেন। সংস্কৃত নাটকের আদর্শে তিনি 'প্রণয় পরীক্ষা' (১৮৬৯) নামক সামাজিক নাটকেও 'প্রস্তাবনা' যুক্ত করে নট ও নটীর মধ্যস্থতায় নাট্য-কাহিনীর সূচনা করেছেন।

গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকে আঙ্গিককে কখনই প্রাধান্য দেননি। তাঁর 'সীতার বিবাহ' তিন অঙ্কের নাটক, মোট গর্ভাঙ্ক সংখ্যা কুড়ি। একটি 'সূচনা' দৃশ্যও আছে। 'দক্ষযজ্ঞ' চতুরঙ্ক নাটক, মোট গর্ভাংক সংখ্যা বারো। তৃতীয় অঙ্কে একটির বেশী গর্ভাঙ্ক নেই। 'পাণ্ডবগৌরব' পঞ্চাংক নাটক, মোট গর্ভাংক সংখ্যা তিরিশ। নাটকের শেষে 'পট-পরিবর্তন' নামে একটি ক্রোড অংক যুক্ত করা হয়েছে। গিরিশচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল অংকের পর অংক সাজিয়ে নাটকীয় কাহিনীস্থলে দ্রুতি সঞ্চার করা। সেক্ষেত্রে তিনি প্রায়শঃ সফল।

'জনা' নাটকের কাহিনী মোট পাঁচটি অংকে ও একটি ক্রোড়-অংকে ভাগ করা হয়েছে। মোট ২৫টি গর্ভাঙ্কে কাহিনীর আনুপূর্বিক বিন্যাস ঘটানো হয়েছে। এই নাটকের অংক ও গর্ভাঙ্ক বিভাজনটি আলোচনা করলে বোঝা যাবে গিরিশচন্দ্রের আঙ্গিক কৌশল কতখানি নিপুণ—

১ম অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক: রাজবাটীর কক্ষ—নীলধ্বজ, অগ্নি, জনা, স্বাহা, প্রবীর ও বিদূষক এই দৃশ্যে উপস্থিত। এই গর্ভাংকে চরিত্রগণের মনে এবং দর্শকের মনেও এই বিশ্বাস দেখা দিয়েছে যে 'নররূপী নারায়ণে'র দর্শন অবিলম্বে ঘটবে এবং সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। বিদূষকের কৃষ্ণভক্তিও এই গর্ভাঙ্কেই প্রকাশিত।

১ম অঙ্ক ২য় গর্ভাংক: উদ্যান—মদনমঞ্জরী, বসন্তকুমারী ও সখীগণের গানে নাটকের আসন্ন বেদনারঙীন ভবিষ্যতই যেন ফুটে বেরিয়েছে। মদনমঞ্জরীর অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ছেড়ে দেওয়ার ব্যাকুল অনুরোধ শুনে প্রবীর প্রেমিকার মনে সাহস দেয়—'ধনু-করে ক্ষত্রিয় সমরে নাহি ডরে। / যাও প্রিয়ে, মাতার সদন,/পিতৃ সন্নিধানে/যাই আমি দিতে

সমাচার।' এই গর্ভাংকটি যদি প্রথম গর্ভাংকের সঙ্গে যুক্ত হত তা হলে স্থানগত ঐক্য আরও ভাল হত।

১ম অঙ্ক ৩য় গর্ভাংক : পাণ্ডব-শিবির—এই সংক্ষিপ্ত দৃশ্যের মূল উদ্দেশ্য হল প্রবীরের পরাজয়ের জন্য অর্জুনের শিবের সম্মতি যে অবশ্যই প্রয়োজন, তা জানানো। পাণ্ডব শিবিরে প্রবীর কর্তৃক অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ধরার সংবাদে যে প্রতিক্রিয়া জেগেছে তা কেবলমাত্র কৃষ্ণ-অর্জুনের সংক্ষিপ্ত উক্তি প্রত্যুক্তিতে তেমন সুস্পষ্ট হয়নি।

১ম অঙ্ক ৪র্থ গর্ভাংক : জনার কক্ষ—এই দৃশ্যেই নাটকের মূল দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটেছে জনার প্রতিজ্ঞায়। নীলধ্বজ ও জনার উক্তি প্রত্যুক্তিতে কৃষ্ণ-ভক্তি ও কৃষ্ণবিদ্বেষ তীব্র হতে পেরেছে। এই দৃশ্যে বিদুষকের উপস্থিতি কৃষ্ণভক্তির পাত্রকে পূর্ণ করেছে।

১ম অঙ্ক ৫ম গর্ভাংক : কৈলাশ-পর্বত-উপত্যকা—এই দৃশ্যে নাটকের পরিণতিটি প্রকাশিত হয়ে পড়ায় নাটকের কৌতূহল (Surprise) রস স্তিমিত হয়ে গেল। শিবভক্ত প্রবীরের শক্তিহরণ এবং মৃত্যুর ভবিষ্যৎ ছবি পাঠক-দর্শক যেন এই দৃশ্যেই দেখতে পেলেন। পৌরাণিক ভাবই নাট্যকারকে এই দৃশ্যটি যোজনায় উদ্‌বেজিত করেছে। প্রকৃতপক্ষে নাটকের চরমোৎকণ্ঠা সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই জাতীয় দৃশ্য প্রতিবন্ধকতার কাজ করে।

২য় অংক ১ম গর্ভাংক : জনার পূজাগৃহ—জনার গঙ্গাবন্দনার পর স্বাহা ও মদনমঞ্জরীর প্রবেশ। জনাকে যুদ্ধবন্ধের অনুরোধ জানিয়ে ব্যর্থ হওয়ার পর উভয়ে পাণ্ডব শিবিরে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করে।

২য় অংক ২য় গর্ভাংক : প্রান্তর মধ্যে বটবৃক্ষ— দু'জন গঙ্গারক্ষকের কথোপকথনের সাহায্যে নাট্যকার গুরু ঘটনার মধ্যে আপাতঃ হাস্যরস প্রবাহের সুযোগ নিয়েছেন। বিদূষকেরও ঘোড়া চুরির উদ্দেশ্যে উপস্থিতি এই হাসির তরঙ্গে জোর দিয়েছে।

২য় অঙ্ক ৩য় গর্ভাঙ্ক : দুর্গাভ্যন্তর—মন্ত্রী, সেনাপতি, সেনানায়ক ও সেনাগণের যুদ্ধ-বিরোধিতার সময় জনার প্রবেশ এবং ধিক্কার। অতঃপর তাঁর উদ্দীপণাপূর্ণ উক্তি—"বাঁধ বুক, সাজ শীঘ্র, আসন্ন সমর, / বীরদম্ভে

বিমুখ পাণ্ডবে।' ইত্যাদি শুনে তাদের সম্মতি। জনা চলে যান পুত্র প্রবীরকে রণসাজে সাজাতে।

২য় অঙ্ক ৪র্থ গর্ভাঙ্ক: শিবিরের পথ—এই দৃশ্যে ভিখারিণীবেশী স্বাহা ও মদনমঞ্জরী শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিজেদের পরিচয় লুকিয়ে রাখতে পারেনি—কৃষ্ণ স্পষ্টই তাদের জানিয়ে দেন অর্জুন এই যুদ্ধ থেকে ফিরে যাবেন না। কৃষ্ণ চরিত্রের একটি আনুপূর্বিক বর্ণনা এই দৃশ্যে আছে।

২য় অঙ্ক ৫ম গর্ভাঙ্ক: প্রবীরের শয়নকক্ষ—এই দৃশ্যে জনার পুত্রপ্রেম এবং মদনমঞ্জরীর পতিপ্রেম সুঅঙ্কিত। মদনমঞ্জরী প্রবীরকে রণসাজে সজ্জিত করে। দূতমুখে যুদ্ধ শুরুর সংবাদ পেয়ে প্রবীর যুদ্ধে যায়। এই দৃশ্যটি গতিমুখর—পারিবারিক রসে আর্দ্র।

২য় অঙ্ক ৬ষ্ঠ গর্ভাঙ্ক: রাজবাটীর নিকটস্থ উদ্যান—এই দৃশ্যে গঙ্গারক্ষক এবং বিদূষকের হাস্যকর উক্তি-প্রত্যুক্তির অংশই বেশি। তবে বিদূষকের মুখ দিয়ে নাট্যকাহিনীর ধারাবাহিকতা কিছুটা বজায় আছে।

২য় অঙ্ক ৭ম গর্ভাঙ্ক: রণস্থল—শ্রীকৃষ্ণ, ভীম, বৃষকেতু, অনুশাল্ব—সকলেই একবাক্যে বলেছেন প্রবীর অবধ্য। প্রবীরের প্রকৃত শক্তির পরিচয়ই এই দৃশ্যের একমাত্র বিষয়। শেষ সংলাপে কৃষ্ণ জানিয়েছেন—'কালি প্রাতে শিবের প্রসাদে / প্রবীর পড়িবে রণে অর্জুনের করে।'

২য় অঙ্ক ৮ম গর্ভাঙ্ক: রণক্ষেত্রের অপরপার্শ্ব—রণক্ষেত্রে প্রবীরের কানে ভেসে আসে এক সুমধুর যন্ত্রধ্বনি, বালক-বালিকাবেশে কাম ও রতির প্রবেশ। অতঃপর প্রবীরের মায়াকাননে প্রবেশ। এই দৃশ্যটির মাধুর্য মনে রাখার মত।

৩য় অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক: মায়াকানন—মোহাচ্ছন্ন প্রবীর এই দৃশ্যে মায়াযুবতীর হাতে শুধু নিজেকে অর্পণই করেনি, ধনুর্বাণও অর্পণ করেছে। ১ম অঙ্কের ৫ম গর্ভাঙ্কের ভবিষ্যৎবাণী আংশিক পূর্ণ হল। প্রবীরের পতন নিশ্চিত হল।

৩য় অঙ্ক ২য় গর্ভাঙ্ক: উদ্যানস্থ চন্দ্রাতপ—জনা, নীলধ্বজ, মদনমঞ্জরী, অগ্নি এবং বিদূষক এই দৃশ্যে উপস্থিত। এই দৃশ্যে কাহিনী একই স্থানে দাঁড়িয়ে আছে।

৩য় অঙ্ক ৩য় গর্ভাঙ্ক : এই দৃশ্যে কৃষ্ণমহিমা অপেক্ষা হরমহিমা প্রাধান্য লাভ করেছে। প্রবীরের অস্ত্রহীন হওয়ার সংবাদ শুনে কৃষ্ণ ভীমকে দ্রুত যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে বলেছেন, কারণ—'ভক্তি-ভাবে মাতৃ-মন্ত্র জপিলে প্রবীর, / শমনের অধিকার না রহিবে আর— / অসংশয় রাজপুত্র জিনিবে সমর।'

৩য় অঙ্ক ৪র্থ গর্ভাঙ্ক : প্রান্তর—মোহভঙ্গ হৃতসর্বস্ব প্রবীর সামনে তাকিয়ে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও বৃষকেতুকে দেখেছে। কৃষ্ণের ক্রূর চক্রান্তকে সে ধিক্কার দিয়েছে, ব্যঙ্গ করেছে—যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করেছে। অতঃ-পর উন্মাদিনী জনাকে আসতে দেখে কৃষ্ণসহ অর্জুন ও বৃষকেতুর পলায়ন। মদনমঞ্জরীর বিলাপ ও প্রবীরের পদতলে মৃত্যু। জনার নির্মম প্রতিজ্ঞা ও প্রস্থানের মধ্য দিয়ে কার্যত দৃশ্যটির যবনিকাপাত।

৪র্থ অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক : শিবির সম্মুখে—এই দৃশ্যে কৃষ্ণমুখে জনার ভবিষ্যৎ বর্ণিত হয়েছে। প্রবীরের মৃত্যুতে জাত গঙ্গার ক্রোধকে কৃষ্ণ, অর্জুন এবং বৃষকেতু তিন অংশে ভাগ করে নিয়েছেন। বৃষকেতুর আত্মত্যাগের ইচ্ছায় কৃষ্ণ খুশী।

৪র্থ অঙ্ক ২য় গর্ভাঙ্ক : বিদূষকের বাটীর সম্মুখ : বিদূষক, ব্রাহ্মণী এবং বৈদ্যের কথোপকথন নাটকে হাসির সঞ্চার করেছে।

৪র্থ অঙ্ক ৩য় গর্ভাঙ্ক : রাজবাটীর কক্ষ—নীলধ্বজ, মন্ত্রী, অগ্নি ও পারিষদগণ উপস্থিত। অর্জুনের উপস্থিতি এবং কৃষ্ণের আশু আগমন বার্তা জ্ঞাপন। নীলধ্বজ কর্তৃক মন্ত্রীকে নগরসজ্জার আদেশ দানে ক্রুদ্ধা জনার নীলধ্বজকে ধিক্কারই এই দৃশ্যের প্রধান বিষয়। জনার সেই একই প্রতিজ্ঞা—'যাই, রাজা, কাল বয়ে যায়, / প্রতিবিধিৎসার কাল বহে, / চলে জনা প্রতিবিধিৎসিতে।'

৪র্থ অঙ্ক ৪র্থ গর্ভাংক : রাজবাটীর সম্মুখস্থ পথ—শ্রীকৃষ্ণ ও নীলধ্বজের সাক্ষাৎ-বিষয়ক অতি সাধারণ দৃশ্য।

৪র্থ অঙ্ক ৫ম গর্ভাংক : প্রান্তর— জনার আত্মভাষণের মাঝে স্বাহার প্রবেশ। 'মা' সূচক সম্বোধন করায় স্বাহাকে জনার তিরস্কার। উন্মাদিনী জনার একটি ক্ষুদ্র রেখাচিত্র এখানে আঁকা হয়েছে।

৫ম অঙ্ক ১ম গর্ভাংক : প্রান্তর মধ্যস্থ শুষ্ক অশ্বত্থস্থল— দুইজন পাইকের কথোপকথন ও প্রস্থানের পর বিদূষক ও ব্রাহ্মণীর প্রবেশ। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী কৃষ্ণের সঙ্গে বিদূষকের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে নাট্যকার কৃষ্ণভক্তি প্রচার করেছেন। এই দৃশ্যে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি প্রদর্শন নাটকের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়।

৫ম অঙ্ক ২য় গর্ভাংক : রাজবাটীর কক্ষ—স্বাহাকে নিয়ে অগ্নি স্বধামে ফিরে যেতে চান। নীলধ্বজ সম্মতি দেন। কৃষ্ণদর্শনের আকাজ্ক্ষা তাঁর মিটেছে তবুও তিনি যে সুখী হতে পারেননি, দৃশ্যের শেষ সংলাপে তার পরিচয় আছে—'শান্তি দেহ সনাতন। শান্ত কর এ অশান্ত প্রাণ।'

৫ম অঙ্ক ৩য় দৃশ্য : বন-পথ—গঙ্গারক্ষকদ্বয় জনাকে গঙ্গার দিকে নিয়ে চলেছে। পাগলিনী জনা ভ্রাতা উল্মুকের প্রবোধে কান দেন না। গঙ্গার বুকে ঝাঁপ দিয়েই তাঁর তৃপ্তি। অর্জুনের প্রতি গঙ্গার অভিশাপ—'চামুণ্ডার খড়্গ যাও যাও মণিপুরে,—। করে এস অর্জুনের রক্ত পান!'

ক্রোড় অঙ্ক : কৈলাস—নিম্নে গঙ্গা প্রবাহিত—এই দৃশ্যে কৃষ্ণ কর্তৃক নীলধ্বজকে প্রবীর ও জনার মিলন দৃশ্য দেখাবার পর নীলধ্বজের অজ্ঞানতা দূর হল।

'জনা' নাটকের অঙ্ক এবং গর্ভাঙ্ক বিন্যাসের ক্ষেত্রে নাট্যকার সর্বক্ষেত্রে একটির সঙ্গে অন্যটির যোগ রাখতে পারেননি। এর ফলে নাটকের গতি বারংবার ব্যাহত হয়েছে। কয়েকটি গর্ভাঙ্ক স্বতন্ত্র হিসেবে না রেখে পূর্ববর্তী বা পরবর্তী গর্ভাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত করে দিলে এই ত্রুটির সুযোগ থাকত না। কয়েকটি গর্ভাঙ্ক পরিসরে অত্যন্ত ক্ষুদ্র হওয়ায় দর্শক-চিত্তকে তৃপ্তি দিতে পারে না। তা ছাড়া ঘটনার স্থান বারংবার পরিবর্তিত হওয়ায় কাহিনীর সঙ্গে সমভাব বজায় রাখা সম্ভব হয়নি।

এই স্থান-ঐক্য ত্রুটি গিরিশচন্দ্রের একাধিক পৌরাণিক অথবা পৌরাণিক সংস্কার-ধর্মী নাটকে আছে। প্রসঙ্গতঃ 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নাটকটির নাম করা যায়। বিল্বমঙ্গলের বাসগৃহ থেকে বৃন্দাবন পর্যন্ত এই নাটকের স্থান-ব্যাপ্তির বোধহয় প্রয়োজন ছিলনা। ১ম অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কের স্থান চিন্তামণির

গৃহের বহির্দ্বারের পথ আর ৫ম অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্ক বর্ণিত হয়েছে বৃন্দাবনের গোবর্ধন পর্বতের কাহিনী নিয়ে।

নাটকে কোন নির্দিষ্ট অঙ্ক-দৃশ্য বিন্যাসের রীতি গিরিশচন্দ্রের সম্ভবতঃ পছন্দ ছিলনা। এমনকি 'কমলে কামিনী' নাটকে বারংবার 'ক্রোড়-অঙ্ক' ব্যবহার পর্যন্ত করেছেন। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের পর 'শূন্যে চণ্ডী ও পদ্মা'কে নিয়ে একটি ক্রোড়-অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্কের পর 'শ্রীমন্ত ও নাবিকগণ'কে নিয়ে এবং 'শ্রীমন্ত ও কর্ণধার'কে নিয়ে পরপর দুটি 'ক্রোড়-অঙ্ক' যুক্ত হয়েছে। তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় ও চতুর্থ গর্ভাঙ্কের মাঝে 'রাজকুমারী ও ধাত্রী'কে অবলম্বন করে একটি ক্রোড়-অঙ্ক-যুক্ত। কিন্তু নাটকের শেষে কোন ক্রোড়-অঙ্ক নেই। 'সীতাহরণ' নাটকের পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃশ্যের মাঝখানে এবং অষ্টম ও নবম দৃশ্যের মাঝখানে 'ক্রোড-দৃশ্য' স্থাপনের কোন প্রয়োজনই ছিলনা, কেননা দৃশ্য দুটিতে দুটি ক্ষুদ্র গীত মাত্র ব্যবহৃত।

'ভীষ্ম' নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন ক্রোড়-অংক ব্যবহার করেন নি, তেমনই ক্ষীরোদপ্রসাদের ভীষ্ম নাটকে পঞ্চম অংকের সপ্তম দৃশ্যের পর ক্রোড়-অংকের ব্যবহার নেই—কেবল 'পট-পরিবর্তন' করা হয়েছে। গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডব-গৌরব' নাটক থেকে হয়ত এই ভঙ্গীটি ক্ষীরোদপ্রসাদ পেয়েছিলেন। সে যাই হোক, আঙ্গিকের দিক থেকে ক্ষীরোদপ্রসাদের উপর গিরিশচন্দ্রের আংশিক প্রভাব পড়লেও দ্বিজেন্দ্রলাল সেই প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন বলা যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদের 'ভীষ্ম' নাটকের অংক ও দৃশ্যসজ্জার তুলনা-মূলক আলোচনা করলে উভয়ের নিজস্বতা বোঝা যায়—

দ্বিজেন্দ্রলালের ভীষ্ম	ক্ষীরোদপ্রসাদের ভীষ্ম
... ...	প্রস্তাবনা-দৃশ্য
১ / ১ ব্যাসের আশ্রম উদ্যান	১ / ১ গঙ্গাগর্ভ
১ / ২ নর্মদার তীরে খেয়াঘাট	১ / ২ গঙ্গাতীরস্থ উপত্যকা
১ / ৩ দাশরাজের আবাসগৃহ	১ / ৩ রাজসভা
১ / ৪ হস্তিনার প্রাসাদকক্ষ	
১ / ৫ দাশরাজের আবাসগৃহ	
১ / ৬ হস্তিনার প্রাসাদকক্ষ	
১ / ৭ কাশীরাজের প্রমোদ উদ্যান	

দ্বিজেন্দ্রলালের ভীষ্ম		ক্ষীরোদপ্রসাদের ভীষ্ম	
২ / ১	শান্তনুর শয়নকক্ষ	২ / ১	উদ্যান
২ / ২	হস্তিনার রাজপ্রাসাদের একটি ক্ষুদ্র কক্ষের প্রাঙ্গন	২ / ২	কক্ষ
২ / ৩	হস্তিনার রাজ-অন্তঃপুরের প্রাসাদমঞ্চ	২ / ৩	স্বয়ম্বর-সভা
২ / ৪	গন্ধর্বরাজ চিত্রাঙ্গদের প্রমোদ-ভবন	২ / ৪	রাজ অন্তঃপুর
২ / ৫	ব্যাসের আশ্রম	২ / ৫	বনপথ
২ / ৬	কাশীরাজের বহিরুদ্যান	২ / ৬	পরশুরামের আশ্রম
২ / ৭	স্থান নির্দিষ্ট নয়	২ / ৭	স্থান নির্দিষ্ট নয়
৩ / ১	গঙ্গাতটে কাশীরাজের বহিরুদ্যান	৩ / ১	পরশুরামের আশ্রম-নিকটস্থ পথ
৩ / ২	কাশীরাজ-প্রাসাদ	৩ / ২	রণস্থল
৩ / ৩	কাশীতে স্বয়ম্বর-সভা	৩ / ৩	নদীতীর
৩ / ৪	হস্তিনার প্রাসাদকক্ষ	৩ / ৪	রাজ-অন্তঃপুর
৩ / ৫	শাল্বের প্রমোদ-ভবন	৩ / ৫	রণস্থল
৩ / ৬	হস্তিনার প্রাসাদ	...	...
৪ / ১	পরশুরামের গৃহ-প্রাঙ্গন	৪ / ১	স্থান অনির্দিষ্ট
৪ / ২	শয়নকক্ষ	৪ / ২	বিরাট-রাজসভা
৪ / ৩	হস্তিনার প্রাসাদ	৪ / ৩	ভীষ্মের কক্ষ
৪ / ৪	গঙ্গাতীর	৪ / ৪	পর্য্যাঙ্কে শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রিত
৪ / ৫	হস্তিনার প্রাসাদ- অন্তঃপুর	৪ / ৫	স্থান অনির্দিষ্ট
৪ / ৬	পর্বতপ্রান্তে শ্মশান		...
৫ / ১	কুরুসভা	৫ / ১	কুরুক্ষেত্র
৫ / ২	কৌরবরাজ-অন্তঃপুর	৫ / ২	কুরুক্ষেত্র
৫ / ৩	স্থান অনির্দিষ্ট	৫ / ৩	স্থান অনির্দিষ্ট
৫ / ৪	কুরুক্ষেত্র	৫ / ৪	স্থান অনির্দিষ্ট
৫ / ৫	রণক্ষেত্রপ্রান্তর	৫ / ৫	কৌরব শিবির
৫ / ৬	কৌরবের অন্তঃপুর	৫ / ৬	ভীষ্মের শিবির
৫ / ৭	সমরাঙ্গন	৫ / ৭	পাণ্ডব শিবির
৫ / ৮	কুরুক্ষেত্র		॥ পট-পরিবর্তন ॥

দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদ রচিত 'ভীষ্ম' নাটকের অঙ্ক-বিভাগ ও দৃশ্য-বিন্যাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে উভয় নাট্যকারের অঙ্ক-বিভাগের ক্ষেত্রে নৈকট্য থাকলেও, দৃশ্য-বিন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁরা নিজ নিজ মনোভঙ্গীতে বিশ্বাসী। উভয় নাট্যকারই দ্বিতীয় অংকে সমান দৃশ্যসংখ্যা ব্যবহার করেছেন কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের তুলনায় প্রথম অংকে চারটি, তৃতীয় অংকে একটি এবং চতুর্থ অংকে একটি দৃশ্য কম আছে। দ্বিজেন্দ্রলাল যুদ্ধস্থল এবং তার নিকটবর্তী দৃশ্যের স্থান-নির্দেশ করেছেন এইভাবে—কুরুক্ষেত্র, রণক্ষেত্র প্রান্ত, সমরাঙ্গন; আর ক্ষীরোদপ্রসাদের স্থান-নির্দেশ হল যথাক্রমে কুরুক্ষেত্র, রণস্থল; কৌরব শিবির, ভীষ্মের শিবির, পাণ্ডব শিবির। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে দু'টি দৃশ্যের (২/৭, ৫/৩) স্থান নির্দিষ্ট নয়। ক্ষীরোদপ্রসাদের এইরূপ দৃশ্যের সংখ্যা পাঁচটি (২/৭, ৪/১, ৪/৫, ৫/৩, ৫/৪)।

দ্বিজেন্দ্র-উত্তর বাংলা পৌরাণিক নাটকে গঠন রীতির দিক থেকে নতুন কোন পরীক্ষা হয় নি, কেবল মন্মথ রায়ের 'দেবাসুর' নাটকে প্রতিটি অংকে কেবলমাত্র একটি করে দৃশ্য উপস্থাপিত।

সংলাপ ॥

নাটকের ক্ষেত্রে সংলাপ সৃষ্টির দক্ষতা নাট্যকারের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় কারণ একটি নাটকের সামগ্রিক সাফল্যের পিছনে সংলাপের ভূমিকা কম নয়। নাটকীয় দ্বন্দ্ব এবং চরিত্রের উপর নির্ভর করে সংলাপ অগ্রসর হয় এবং ধীরে ধীরে দ্বন্দ্ব ও চরিত্রের সাফল্যের পিছনে তার শক্তি প্রয়োগ করে।[৪] ঊর্ধ্বমুখী দ্বন্দ্বই ভাল সংলাপের সৃষ্টিতে সাহায্য করে। অবশ্য নাটকে সংলাপের প্রাধান্য সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে সমালোচক Lajos Egri বলেছেন—"Do not overemphasize dialogue. Remember that it is the medium of the play, but not greater than whole."[৫]

৪. ....'good dialogue is the product of characters carefully chosen and permitted to grow dialectically, untill the slowly rising Conflict has proved the premise."
—Lajos Egri : "The Art of Dramatic writing", New york, 1963, Page—245,

৫. Ibid. P—244.

সাহিত্যের অন্যান্য শাখা, যথা উপন্যাস, কাব্য অথবা প্রবন্ধে সংলাপ কোন নিশ্চিত উপাদান নয়; ঔপন্যাসিক, কবি এবং প্রাবন্ধিক তাঁদের স্বাধীন গতিময় বর্ণনায় সবকিছু প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু নাটকই একমাত্র শিল্প-কর্ম যার প্রতিটি গতিপ্রকৃতিই নির্ভর করে সংলাপের উপর। উপন্যাস এবং কাব্যে যেমন ঔপন্যাসিক এবং কবি মুখর, নাটকে নাট্যকার তেমনি নীরব। নাটকে কাহিনীর অগ্রগতি, চরিত্রের বিকাশ এবং সূচনা থেকে পরিণতি পর্যন্ত দর্শক-পাঠকমনে ঔৎসুক্য সৃষ্টির পূর্ণ দায়িত্ব সংলাপের। সংলাপের উপর এই অপরিমেয় দায়িত্ব থাকে বলেই কাহিনী এবং চরিত্র সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সংলাপ রচনাতেও নাট্যকারকে দক্ষতা অর্জন করতে হয়।

সংলাপ সৃষ্টির সময় নাট্যকারকে কয়েকটি বিষয় সতর্করূপে মেনে চলতে হয়। প্রথমতঃ নাট্যকারকে লক্ষ্য রাখতে হয় একটি দৃশ্য থেকে পরবর্তী দৃশ্যে অগ্রসর-সময় সংলাপ যেন নাটকীয় ঔৎসুক্য বজায় রাখতে পারে। নাটকীয় সংলাপে কাহিনীর ভাবী পরিণতির ইঙ্গিত যদি আগেই প্রকাশিত হয়ে যায় তাহলে নাটকের কৌতূহল কমে যেতে বাধ্য। দ্বিতীয়তঃ ঔপন্যা-সিক ইচ্ছামত যত্রতত্র 'flash back' প্রক্রিয়ায় অতীত কাহিনী বর্ণনা করতে পারেন, কিন্তু নাটকে চলমান সংলাপের মধ্য দিয়েই অতীত, বর্তমান ও ভাবী ঘটনার মধ্যে সেতুবন্ধন করতে হয়। নাট্যকার অসতর্ক হলে সংলাপে সেই ফাঁক থেকে যায় এবং নাটকীয় ঘটনায় বিচ্ছিন্নতা আসে। তৃতীয়তঃ কাহি-নীর মত বক্তব্য বিষয়ের উপস্থাপনার ভঙ্গীতেও সংলাপে একটি সাধারণ ধর্ম অনুসৃত হওয়া উচিত। অপ্রয়োজনীয় এবং অবান্তর বিষয়কে বর্জন করে এবং পরস্পর বিষয়ের মধ্যে সঙ্গতি রেখে সংলাপ রচনা করতে হয়। চতুর্থতঃ সামাজিক নাটক, প্রহসন ইত্যাদিতে জীবন্ত বাস্তবের চিত্রণ হয় বলে এই জাতীয় নাটকে যেমন গদ্য সংলাপ কাম্য তেমন পৌরাণিক নাটকে পদ্যসংলাপ ব্যবহৃত হলেও তেমন আপত্তির কারণ থাকে না। ঐতিহাসিক নাটকেও পদ্য সংলাপ আসতে পারে কিন্তু এই পদ্য সংলাপে ভারসাম্যের প্রায়শঃ অভাব ঘটায় পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাটক 'কাব্যনাট্যে'র দিকে চলে যায়। নাটক কাব্য নয়, এই ধারণাটি সর্বত্র সজাগ থাকলে নাট্যের প্রয়োজনে ব্যবহৃত পদ্য সংলাপও ভাল সংলাপের জন্ম দিতে পারে। পৌরাণিক নাটকের আলোচনার সময়ও এই সূত্রগুলিকে অবশ্যই মনে রাখতে হয়।

বাংলা পৌরাণিক নাটকগুলির অধিকাংশই পুরোপুরি পন্থ-সংলাপ, অথবা গন্থ-পন্থ মিশ্রিত সংলাপে রচিত। অন্ততঃ এই বিষয়ে যাত্রার প্রভাব আংশিকভাবে পৌরাণিক নাটকের উপর পড়েছে। কৃষ্ণকমলের রচনায় গন্থ সংলাপ প্রায় নেই, গোবিন্দ অধিকারী সংলাপে গন্থভাষা ব্যবহার করলেও অতি-দীর্ঘ সংলাপ দর্শক-পাঠকের মনে বিরক্তি জাগিয়ে তোলে। তবে যাত্রার মধ্যে পন্থ থেকে গন্থ সংলাপে পৌঁছুবার যে ক্রমবিকাশটি দেখা যায় বাংলা পৌরাণিক নাটকে সেই ক্রমবিকাশ নেই।

বাংলা পৌরাণিক নাটকে পন্থ সংলাপের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের 'গৈরিশছন্দ'কে অনেকেই প্রধান মাপকাঠি হিসাবে ধরেন। একথা সত্য গিরিশচন্দ্রই পন্থ সংলাপের ক্ষেত্রে যুগান্তর এনেছিলেন এবং সমকালীন বহু নাট্যকার তাঁর প্রচলিত ছন্দের উপর নির্ভর করেই নাট্য-সংলাপ রচনা করেছিলেন। কিন্তু 'গৈরিশছন্দে'র জন্মের পিছনে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দাশ্রয়ী নাট্যসংলাপের প্রভাব কম নয়। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য যথার্থই লিখেছেন : "পয়ারের অনুরূপ বহিরঙ্গ দান করিয়া অমিত্রাক্ষর রচনা ব্যতীতও তিনি অন্য এক রীতির অমিত্রাক্ষর ইহাতে রচনা করিয়াছিলেন ; তাহার বিশেষত্ব এই যে, তাহাতে যতি স্থানে চরণ-ছেদ হইত, পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রায় ইহারই অনুরূপ ছন্দ তাঁহার নাটকে ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং তাহাই 'গৈরিশ ছন্দ' নামে পরিচিত হইয়াছে।"[৬] মধুসূদন বিশ্বাস করতেন......'no real improvement in the Bengali drama could be expected untill Blank verse was introduced into it.' তিনি পৌরাণিক নাটক সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছিলেন এমন কথা দৃঢ়ভাবে বলা না গেলেও তাঁর পৌরাণিক নাটক 'পদ্মাবতী'তেই যে এই ভাষা কেবলমাত্র আংশিক ব্যবহৃত তা বলা যায়। 'পদ্মাবতী' রচনার এক বছর পরে একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন—'I am of opinion that our drama should be in Blank Verse and not in prose, but the innovation must be brought about by degrees.'[৭] কিন্তু পরবর্তী নাটক সমূহে মধুসূদন এই কাব্য সংলাপ ব্যব-

৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস : ১ম খণ্ড, ১৯৬০, পৃঃ ১৭৩.

৭. রাজনারায়ণ বসুকে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে লেখা পত্র।

হার না করার কারণ বিশ্লেষণ করেছেন 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের 'মঙ্গলাচরণ' অংশে। তিনি লিখেছেন : 'এ কাব্যেও আমি সঙ্গীত ব্যতীত পদ্যরচনা পরিত্যাগ করিয়াছি। অমিত্রাক্ষর পদ্যই নাটকের উপযুক্ত পদ্য ; কিন্তু অমিত্রাক্ষর পদ্য এখনও এদেশে এতদুর পর্যন্ত প্রচলিত হয় নাই, যে তাহা সাহসপূর্বক নাটকের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন করিতে পারি।'………পদ্য সংলাপের প্রতি যে তৎকালীন জনসাধারণের একান্ত আকর্ষণ ছিল না তার পরিচয় তারাচরণ শীকদার, যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত এবং হরচন্দ্র ঘোষের নাটক। তাঁরা সংলাপের ক্ষেত্রে পদ্য ও গদ্য ভাষার মধ্যে কোনটিকে গ্রহণ করবেন বুঝতে না পেরে একই নাটকে উভয় ভাষা ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এর ফলে তারাচরণের পদ্য সংলাপে পয়ার এবং ত্রিপদী সংলাপে দীর্ঘ আকর্ষণহীন বিকাশ দেখি, তেমনি সাধু গদ্য ভাষায় রচিত সংলাপে আড়ষ্টতা চোখে পড়ে। তাঁর 'ভদ্রার্জ্জুন' নাটকের পদ্য ও গদ্য সংলাপের দুটি উদ্ধৃতি দিলে এই মন্তব্যের সমর্থন মিলবে।—

পদ্য সংলাপ :

দেবকী। তুমি ত' হে সংসারের কিছুই জান না।
বসুদেব। সংসার করিতে হয় কিরূপে বল না॥
দেবকী। দুই সন্ধ্যা চতুর্ব্বিধ রসেতে ভোজন।
রজনীতে অপরূপ শয্যায় শয়ন॥
ইহাই করিলে যে সংসার করা হয়।
মনেতে জানিও ভাল কিছু তাহা নয়॥
বসুদেব। তোমার মনের কথা বল স্পষ্ট করি।
ও কথা বলিতে আমি শক্তি নাহি ধরি॥……… ইত্যাদি

[দ্বিতীয় অঙ্ক : প্রথম সংযোগস্থল]

গদ্য সংলাপ :

অর্জ্জুন। (সুভদ্রাকে দেখিয়া) অয়ি সত্যভামে, কাদম্বিনী অবর্তমানেও কন্দর্পদর্পহারিণী জনগণপ্রাণঘাতিনী এই সৌদামিনী আমার হৃদয়ে কেন পতিতা হইল ? কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তুমি এই চপলার সঙ্গিনী হইয়াও স্থিরতর আছ।

[তৃতীয় অংক : অষ্টম সংযোগস্থল]

পদ্য সংলাপের প্রতি তৎকালীন শিক্ষিত সমাজের ঔদাসীন্যের জন্য হরচন্দ্র ঘোষ তাঁর পৌরাণিক নাটক 'কৌরব বিয়োগে' (১৮৫৮) 'অতি স্বল্পাংশ মাত্র' পদ্য সংলাপ এবং বহুলাংশ গদ্য সংলাপ ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু তাঁর গদ্যসংলাপও তারাচরণের মতই আড়ষ্ট এবং রসহীন। এই নাটক রচনার সময় বাংলা গদ্যভাষায় যে চলৎশক্তি এসেছিল হরচন্দ্র সেই রীতি গ্রহণ না করে সংস্কৃতবহুল পণ্ডিতী গদ্যে সংলাপ লিখেছিলেন। নাটকটির চতুর্থ অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণ, দ্রৌপদী ও ভীমের কথোপকথনের একটি অংশ এখানে উদ্ধার করা যাক্। —

শ্রীকৃষ্ণ। হে পাঞ্চালসুতে, বিলাপ সম্বরণ কর। কর্ম্মবশতঃ এই কর্ম্মভূমিতে লোকের ভূয়ঃ ভূয়ঃ জন্ম ও মৃত্যু হইতেছে, এবং জন্মিলেই মরণের নিশ্চয়তা আছে, কেবল ক্ষীণবুদ্ধি জনেরাই ইহার কালাকাল বিবেচনা করিয়া শোকগ্রস্ত হয়েন। ··· অতএব ইতরের ন্যায় ঈদৃশ-বিলাপপর হওয়া জ্ঞানবতীর কর্তব্য নহে।

দ্রৌপদী। দেব, সংহত সৈন্যাদির শোণিতে শিবির মগ্ন, আর অশ্বত্থামার নৈষ্ঠুর্যও অনির্ব্বচনীয়। আমি ইহা কিমতে সহ্য করিব।

ভীম। প্রিয়ে, কোন উপায়ের দ্বারা তোমার বর্তমান শোক ও দুঃখের সমতা হইতে পারে তাহা আমাকে কহ।

বলাবাহুল্য গদ্যসংলাপের এই আড়ষ্টতা এবং রসহীনতা থেকেই মধুসূদন পৌরাণিক নাটককে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। 'পদ্মাবতী' নাটকে তিনি প্রবহমান ছন্দনির্ভর সংলাপের পরিচয় রেখেছেন—

(শচী ও মুরজার প্রবেশ)

কলি। (প্রকাশে) দেবি, আশীর্ব্বাদ করি।
শচী। প্রণাম। হে দেববর! কি করেছ, বল?
কলি। পালিনু তোমার আজ্ঞা যতনে, ইন্দ্রাণী!
বিদায় করহ এবে যাই অন্তঃপুরে।
শচী। (ব্যগ্রভাবে) কোথায় রেখেছ তারে?
কলি। এই ঘোর বনে
সখী সহ আনি তারে রেখেছি, মহিষি। ·········

মধুসূদন তাঁর অসম্পূর্ণ 'সুভদ্রা' নাটকটি অমিত্রাক্ষর ছন্দাশ্রয়ী সংলাপে আগাগোড়া লিখবেন বলে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাটকটি জনসাধারণের প্রিয় হবে না মনে ক'রে মধ্যপথেই থেমে যান। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় যদি নাটকটি অভিনয়কালে ব্যর্থ হবে এরূপ অভিমত প্রকাশ না করতেন তাহলে গিরিশচন্দ্রের পূর্বেই পুরোপুরি পদ্যসংলাপ-আশ্রয়ী নাটক হয়ত রচিত হতে পারত।

মধুসূদনের এই ছন্দরীতি যাত্রাপালা রচয়িতা ব্রজমোহন রায়ের একাধিক-পালায় অনুসৃত। 'দানববিজয়' এবং 'তারকাসুর বধ' পালায় মাঝে মাঝে তিনি ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেছেন। 'দানববিজয়' পালাটির বিশেষত্ব এব পদ্যসংলাপে—

ভয় নাই, কি ভয় বাছানি—
এখনি বধিব দৈত্যে
এখনি ঐ দৈত্য সেনাগণে
উড়াইব বায়ু অস্ত্রে
কিন্তু হায় হায়! দেখ দেখ
ওই দেখ পশ্চাতে আবার
আসিতেছে, কাতারে কাতারে দৈত্যসেনা।

[৪/৩]

গিরিশচন্দ্রের 'রাবণবধে'র পূবে রাজকৃষ্ণ রায়ের 'হরধনুর্ভঙ্গ' নাটকটি বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়, যদিও দু'টি নাটক একই বছরে (১৮৮১) রচিত হয়েছিল। ভাঙা-অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'হরধনুর্ভঙ্গ' নাটকটি সম্পর্কে বক্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে রাজকৃষ্ণ মধুসূদনের ঋণ স্বীকার করেছেন। তিনি ভূমিকায় লিখেছেন—'এ দেশের কবিবর ৺মাইকেল মধুসূদন দত্তই প্রথমে বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাহির করেন। ··· তাহার পূর্বে বঙ্গদেশের কোন স্থলেই বাঙ্গালা অমিত্রাক্ষর ছন্দের কথাবার্তায় কোন নাটক অভিনীত হয় নাই।' রাজকৃষ্ণের এই উক্তি থেকেই বোঝা যায় তাঁর নাটকের এই ভাঙা-অমিত্রাক্ষর-ধর্মী সংলাপ একান্তই মধুসূদন-প্রভাবিত। 'তারক সংহার' নাটকটি রচনার সময় রাজকৃষ্ণ পূর্ববর্তী নাটকের 'পদ্য-পংক্তি ছন্দ' পরিত্যাগ করেন এবং নাটকটি আগাগোড়া গদ্য-সংলাপের মাধ্যমে রূপ দেন। প্রহসন রচনায় ক্ষেত্রেও তিনি মধুসূদনের ছন্দের অনুকরণে অসার্থক হয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্রের

প্রতিভা রাজকৃষ্ণের নাট্যপ্রতিভায় অনুপস্থিত—তাই 'হরধনুর্ভঙ্গ' নাটকের পদ্য-সংলাপে নাটকীয় রস প্রবাহিত হতে পারেনি। পৌরাণিক নাটক রচনায় তাঁর যে কোন নিজস্ব সংলাপ সৃষ্টির শক্তি ছিল না, তার প্রমান তাঁর নানা ছন্দে নাটক রচনা। কখনও ভাঙা অমিত্রাক্ষরে, কখনও আদ্যোপান্ত গদ্যে, কখনও পুরানো ত্রিপদী ও পয়ারের মিশ্রণে ('প্রহ্লাদ মহিমা') আবার কখনও গৈরিশ ছন্দে ('দুর্বাসার পারণ') সংলাপ ব্যবহারের ফলে রাজকৃষ্ণের একটি নির্দ্দিষ্ট সংলাপ-আদর্শ গড়ে উঠতে পারেনি।

গিরিশচন্দ্র তাঁর পৌরাণিক এবং রোমান্টিক নাটকে এক বিশেষ ছন্দাশ্রয়ী সংলাপ ব্যবহার করেছেন, যা 'গৈরিশ ছন্দ' হিসাবে প্রচলিত। গিরিশচন্দ্র মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' নাটকের অমিত্রাক্ষর ছন্দের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র নাট্যরূপ দানের সময় গিরিশচন্দ্র ঐ ছন্দের 'যতি' রক্ষণের প্রতি সচেষ্ট ছিলেন ('পাষাণে বাঁধিয়া প্রাণ / সে যতিরে বলিদান / নাহি দিব হই হব নিন্দার ভাজন')। নিন্দা দুরে থাক, এই সংলাপ ব্যবহারে তিনি দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকে এই পদ্য সংলাপ যেমন প্রভাব ফেলেছিল, তেমনি কালী-প্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' গ্রন্থের 'রথ' অংশের প্রারম্ভে মুদ্রিত ক'টি ছত্রও তাঁকে 'গৈরিশ ছন্দ' সৃষ্টিতে প্রেরণা যুগিয়েছিল।

'গৈরিশছন্দ' সৃষ্টির সময় গিরিশচন্দ্রের বিশেষ লক্ষ্য ছিল অর্থযতি এবং প্রবহমানতা রক্ষা। এ ছাড়া তিনি প্রয়োজনে যতিস্থানে বিরামচিহ্ন ব্যবহার করে মধুসূদনকে আংশিক অতিক্রম করে গিয়েছেন। অবশ্য গিরিশচন্দ্রের পদ্য সংলাপে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রাণধর্মটি সর্বত্র বজায় নেই। গিরিশচন্দ্র অনুভব করেছিলেন 'ছন্দে-কথা নাটকের উপযোগী'। সেজন্যই পদ্য-সংলাপের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল বেশী। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় 'গৈরিশছন্দে' রচিত সংলাপে তৎকালীন অশিক্ষিত এবং অল্পশিক্ষিত অভি-নেতা-অভিনেত্রীদের যেমন বিশেষ সুবিধা হয়েছিল, তেমনি নাট্যদর্শকদের নাটক বোঝার পক্ষেও তা সহায়ক হয়েছিল।

পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে 'গৈরিশ ছন্দে'র একটি বিশেষ মূল্য আছে। পৌরাণিক নাটকে যে আধিদৈবিক, কাল্পনিক জগতের রেখাচিত্র অঙ্কিত তার প্রকাশের ভাব পদ্য-সংলাপের দ্বারাই রোপিত করা সম্ভব। এই কারণেই

পৌরাণিক নাটকে সঙ্গীতের ব্যবহারও বেশী। 'গৈরিশ ছন্দে' উচ্ছ্বাস থাকলেও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় এই ছন্দে রচিত সংলাপে হৃদয়াবেগের যথার্থ প্রকাশ ঘটেছিল। 'পাণ্ডবগৌরব' নাটকে এই সংলাপ ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশে বিশেষভাবে সহায়ক—

শ্রীকৃষ্ণ। দেখ দেখ মধ্যম পাণ্ডব,
চিরদিন ভীমসেন স্নেহ করে মোরে!
মম সহ দ্বন্দ্ব কভু করে?
ব্যঙ্গ তুমি বোঝনি সাত্যকি?
দেবগণে সমাচার দেছ অকারণে!
[ভীমের প্রবেশ]
এস ভাই, এস বৃকোদর!
দণ্ডীরে এনেছ সঙ্গে লয়ে?

ভীম। না জানি কি গুরু অপরাধে,
বহু লজ্জা দিয়েছ শ্রীহরি!
ত্রিভুবন অযশ তখন গাহিবে,—
দুর্যোধন সহায় হইলে।
অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে হয় সাধ।......ইত্যাদি

(৩/৫)

এই সংলাপের মধ্যে ভীম চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব সুন্দর ভাবে ফুটেছে।

'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নাটকের আংশিক পদ্য-সংলাপ নাট্যকারের প্রতিভার সাক্ষী। গভীর তত্ত্বদর্শন নাট্যকার সরল ভাষায় প্রকাশ করেছেন—

শিষ্য। প্রভু,
শিষ্য তব—গুরু তুমি,
এত কি গৌরব তার?

সোমগিরি। কেবা গুরু? কেবা শিষ্য কার?
শিব-রাম গুরু-শিষ্য দোঁহে দোঁহাকার
জগদ্গুরু সেই সনাতন!

শিষ্য। তবে কিবা গুরু-শিষ্য ভাব?

সোম। এ সংসার সন্দেহ আগার ;
বিভু নহে ইন্দ্রিয় গোচর—
ঈশ্বর লইয়া
তর্ক যুক্তি করে অনুমান
যত করে স্থির,
সন্দেহ-তিমির ততই আচ্ছন্ন করে। .....

[৩/৩]

যাত্রা-কথকতা এবং ঢপ-কীর্তনের ঢঙে বাক্যের মধ্যে অন্ত্যানুপ্রাস ও মিল ব্যবহারের রীতি গিরিশচন্দ্র কোথাও কোথাও নিয়েছেন। 'জনা' নাটকের বিদূষকের সংলাপ এই জাতীয়— "আর কি মন্ত্রণা ? / যদি ভালই চাও, / ঘোড়া নিয়ে ফিরিয়ে দাও / ··· একে সকাল থেকে হরি হরি, / তাতে রাজ-কার্যে নারী / তার উপর বেজায় বাকোঁয়াড়া স্থুত / কিছু না কিছু ভূত / আসছে নিশ্চয়। / মন্ত্রণা করে কি হবে বল ? / যা হয় একটা করে ফেল / হরি হে ! / তোমার মহিমা তুমিই নিয়ে থেক, / অন্তিম কালে দেখ / আর রাজবাড়ীতে ছুটো মণ্ডার পথ রেখো।" (১/৪)

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকে ইতস্ততঃ যে গদ্য-সংলাপের পরিচয় আছে তা সজীব নয়। প্রথম পর্যায়ের পৌরাণিক নাটকগুলিতে ভদ্র এবং ভদ্রেতর চরিত্রের মুখে পদ্য-সংলাপ ব্যবহার করলেও পরবর্তীকালের পৌরাণিক নাটকে অপ্রধান চরিত্রের মুখে গিরিশচন্দ্র মাঝে মাঝে গদ্য-সংলাপ প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু বাংলা গদ্যভাষার কথ্যরীতির সঙ্গে তাঁর কোন মানস-সম্পর্ক গড়ে না ওঠায় তাঁর পৌরাণিক নাটকে ব্যবহৃত গদ্য-সংলাপ সার্থক হতে পারেনি। গদ্য-সংলাপে অবশ্য গিরিশচন্দ্র চলিত-ভাষারই ব্যবহার করেছেন। 'পাণ্ডব-গৌরব' নাটকের কঞ্চুকীর একটি উক্তি উদ্ধার করলেই বোঝা যাবে চলিতভাষার ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের দক্ষতা কতখানি :

কঞ্চুকী। হ্যাঁ দেখ্, তুই অনেকবার জিজ্ঞাসা কচ্চিস্ বটে, সে কেমন ? আমিও মনে করি তোরে বলি, কিন্তু বল্‌তে পারি না। তার যেই মুখ মনে পড়ে, আর সব গুলিয়ে যায়,—আমি কে ভুলে যাই ! কোথায় আছি ভুলে যাই ! সে কেমন হয়ে যায়। আমি কি তোর জন্যে উপরোধ করেছিলেম, আমি আপনার রাজার জন্যে বলেছিলুম।'....... ..

[৩/৪]

পৌরাণিক নাটকে ব্যবহৃত পদ্য-সংলাপে গিরিশচন্দ্র সার্থক-শিল্পী। তিনি নিজেই বলতেন—"Dramatic dialogue মানে কথাগুলি এমনভাবে গাঁথা থাকবে যে প্রত্যেক কথাই action indicate করবে। তাতে এক বা একাধিক চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলবে।" এর জন্যই পৌরাণিক এবং ভক্তিমূলক নাটকের ক্ষেত্রে তিনি মধুসূদনের সেই স্মরণীয় মন্তব্য—'Our dramas should be in verse and not in prose'—গ্রহণ করেছিলেন। নাটকের কাহিনীর মধ্যে যদি গতি থাকে এবং চরিত্রের মধ্যে যদি আবেগ থাকে তাহলে পদ্যও সংলাপে মুখর হতে পারে। ৮ দুটি উদ্ধৃতির সাহায্যে বোঝা যাবে গিরিশচন্দ্রের পদ্যসংলাপ নাটকের কাহিনী ও চরিত্রকে কতখানি প্রাণদান করেছে :

ঝর ঝর বারিধারা
বজ্র অগ্নি নাচ চারিদিকে ;
প্রলয় পবন বহ বৈশ্বানর-শ্বাস,
চূর্ণ কর সুমেরু-শিখর,
উথল সাগর, ধরা যাও রসাতলে,
রাম হেন স্বামী মম বাম,—
রে লক্ষ্মণ ! রে লক্ষ্মণ ! রে লক্ষ্মণ !

['সীতার বনবাস' : সীতার উক্তি, ২/২]

অথবা

নিদ্রে ! কেন এস রে নয়নে—
প্রাণধনে হেরি ভাল করে,
বাসনা কি পূরে,
যত দেখি তত বাড়ে সাধ,
বক্ষে ধরি অভয়চরণ
তবু ভয় না হয় বারণ,

৮. "If the plot moves, if the characters are involved in movement, passion or action as they ought to be, the verse is 'ipso facto' part of the structure, of the movement, of the excitement ; it is, as belonging to the dramatic speech, a form of action."
—Ronald Peacock : The Art of Drama, London, 1960, P. 224

কেন মন হও উচাটন ?
আরে রে নয়ন ! দেখ রূপ সাধ মিটাইয়ে।

['নিমাই সন্ন্যাস', বিষ্ণুপ্রিয়ার উক্তি, ১/৩]

যে বছর গিরিশচন্দ্রের প্রথম পৌরাণিক নাটক 'রাবণবধ' বার হয়, সেই বছরই মনোমোহন বসুর চতুর্থ পৌরাণিক নাটক 'পার্থ পরাজয়ে'র প্রকাশ। গিরিশচন্দ্র দেখালেন পদ্যছন্দের মধ্য দিয়ে পুরাণের রস অক্ষুণ্ণ থাকে আর মনোমোহন দেখলেন গম্ভীর গদ্য সংলাপের ভিতর দিয়ে পুরাণের প্রকৃত রস প্রকাশ করা সম্ভব। তৎসম শব্দকে তিনি চলিত ভাষার আলোকে সুন্দরভাবে বিচ্ছুরিত করলেন—

বভ্রুবাহন। তবে আর বচনের পরিচয় কেন ? বাণমুখেই পরিচিত হব। এখন পরিচয় নয়—সেই বাণাগ্নিতে খাণ্ডবদাহনের গৌরবাগ্নি আজ নিষ্প্রভ, সুভদ্রাহরণের দর্প আজ চূর্ণীকৃত ; মৎস্য লক্ষ্যভেদ আর লক্ষ ভূপালের জয়জনিত গর্ব আজ খর্ব ; উত্তর গোগৃহের অদ্ভুত কীর্তি আজ বিপর্যস্ত ; কুরুক্ষেত্রের সমরে ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-ঘাতকের অহংকার আজ বিদূরিত ; অক্ষয়তূণকে আজ শূন্য ; বিজয়গাণ্ডীবকে আজ ছিন্ন, অগ্নিদত্ত কপিধ্বজকে তুলার ন্যায় উড্ডীয়মান—অধিক কি পাণ্ডু গৌরবাভিমান আজ সম্পূর্ণ নির্বাণ করে অর্জুন-ঔরসে আমার জন্ম কিনা ত্রিলোক সমক্ষে ভালরূপে দেখাব।

[৩/১]

গিরিশচন্দ্রের মত দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যসাফল্যও পদ্য-সংলাপে। তাঁর পুরাণ-নির্ভর নাট্যত্রয়ীর তিনি নাম দিয়েছেন 'নাট্যকাব্য'। গদ্য সংলাপের ব্যবহারের সময় দ্বিজেন্দ্রলালের কবিত্ব চাপা থাকেনি—তাঁর ঐতিহাসিক এবং সামাজিক নাটকগুলির গদ্য-সংলাপ কবিত্ব ও সংগীতময়তায় মুখর।

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর তিনটি পৌরাণিক নাটক পাষাণী, সীতা এবং ভীষ্মতে যে ছন্দনির্ভর সংলাপ ব্যবহার করেছিলেন তার সঙ্গে মধুসূদনের অথবা

গিরিশচন্দ্রের ছন্দের কোনই মিল নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল মধুসূদনের নাটকে অমিত্রাক্ষর ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে যে মন্তব্যটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, মধুসূদনের উক্তি সেরূপ নয়। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত সংলাপের প্রতি মধুসূদন-সমকালীন জনগণের অনীহার কথাই মধুসূদন বলেছিলেন। যাইহোক গিরিশচন্দ্র প্রবর্তিত ভাঙা অমিত্রাক্ষর সংলাপ দর্শকরা খুশীমনে গ্রহণ করেছিলেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্যে যতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি যতটা সতর্ক ছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল ততটা ছিলেননা।

নাটক যেহেতু কাব্য নয় তাই নাট্যকারকে সতর্ক থাকতেই হয়, পদ্য সংলাপে যেন কবিত্বের ভারসাম্যচ্যুতি না ঘটে এবং নাটকীয় রসমূলে সংলাপ যেন প্রাধান্যের কুঠারাঘাত না করে। 'পাষাণী' এবং 'ভীষ্ম' নাটকে পদ্য সংলাপের মাঝে মাঝে গদ্য সংলাপ ব্যবহৃত হওয়ায় এই ভারসাম্য কিছুটা রক্ষিত, কিন্তু 'সীতা' নাটকটি আদ্যন্ত পদ্য সংলাপে রচিত হওয়ায় কবিত্ব প্রধান স্থান গ্রহণ করেছে। 'সীতা' নাটকের সংলাপে কাব্যগুণ যত বেশী, নাট্যগুণ ততটা নেই। যেমন—

উর্মিলা। ········ 'স্তব্ধ সরযূ-প্রবাহে
রবির কনকরশ্মি ঘুমাইছে আসি।
হস্তে দীপ, আরক্তিম মুখে মৃদুহাসি,
আসিছে আনত নেত্রে ধূসর বসনে,
অর্ধাবগুণ্ঠনবতী সন্ধ্যা সঙ্গোপনে
ধীর পদক্ষেপে, এ বিশ্ব-মন্দিরে।

[১/২]

মিত্রাক্ষর সংলাপের এই ব্যর্থতা আরও তীব্র হয়েছে অন্ত্যানুপ্রাস সৃষ্টিতে। অথচ অনুরাগ থাকলে যে অমিত্রাক্ষর কাব্যসংলাপ দ্বিজেন্দ্রলাল ভালই লিখতে পারতেন তার পরিচয় মেলে 'পাষাণী' নাটকে অহল্যার একটি উক্তিতে—

অহল্যা। সুদূর তটিনী বহে ঘন তরুচ্ছায়ে
অর্ধাবগুণ্ঠনবতী, ক্ষিপ্র পদক্ষেপে
বন্ধুর কান্তার দিয়া।············
··················সবার উপরে

এক গাঢ় নীলাকাশ নিস্পন্দ, নির্মল,
সদ্যমেঘমুক্তনত চুম্বিত ধরার
সুখস্মিত বিম্বাধর—রক্তিম লজ্জায়।

[২/২]

কাব্যসংলাপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল তখনই সার্থক যখন তিনি কোন চরিত্রের উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ প্রকাশ করেন। 'পাষাণী'র চেয়ে 'ভীষ্ম' নাটকে এ ক্ষেত্রে তিনি বেশী সফল। প্রসঙ্গতঃ ভীষ্মের অম্বার প্রতি একটি উক্তি উদ্ধার করা যায়—

ভীষ্ম । এ ত তুমি নহ। দেখিতেছি
কোন এক উন্মাদিনী সুন্দরী রমণী।
আরক্তিম শুভ্রবর্ণ পূর্ণ গণ্ড দুটি
কামনা মদিরপানে। চক্ষুর জ্বালায়
জ্বলিছে নিরয়বহ্নি। বিম্ব ওষ্ঠ দুটি
সগরল হাস্যরসে—লালসা-শিথিল।

[৩/৬]

মধুসূদন থেকে শুরু করে গিরিশচন্দ্র পর্যন্ত নাট্যকারের সংলাপ আলোচনায় দেখা গেছে নাটকে পদ্য সংলাপ ব্যবহার করতে হলে অমিত্রাক্ষর ছন্দের উপর নির্ভর করাই সঙ্গত। পাশ্চাত্ত্য নাট্য-সমালোচক নিকল এই অভিমতের প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানিয়েছেন।[১] দ্বিজেন্দ্রলালের সমকালীন এবং পরবর্তী পৌরাণিক নাট্যকারগণ কাব্য সংলাপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই সত্যটি মেনে চলেছিলেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল কাব্যসংলাপ সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর রোমান্টিক কবিপ্রতিভার উপর প্রাণমন সমর্পণ করায় তাঁর পৌরাণিক 'নাট্যকাব্যে'র সংলাপে ভাবাবেগ নাট্যাবেগের চেয়ে বেশী প্রশ্রয় পেয়েছে।

১. "In blank verse we hear the language of ordinary life rarefied and made more exalted. In choice between it and rimed verse, therefore we may unhesitatingly decide for the former"......

—Allardyce Nicoll : The theory of Drama, London, 1937, P-140

দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁদের পৌরাণিক নাটকে যে কাব্য-সংলাপ ব্যবহার করেছেন তা গৈরিশছন্দের প্রতিরূপ মাত্র। অপরেশচন্দ্রের 'কর্ণার্জুন' নাটকে শকুনির স্বগতোক্তি স্মরণীয় :

আজো মনে পড়ে,
হস্তিনার রাজ কারাগারে
বন্দী-পিতা গান্ধার-ঈশ্বর,
সহ শত ভাই মোরা।
জরা জীর্ণ দেহভারে
মৃত্যু দিল মুক্তি একে একে,
আমি শুধু রহিলাম প্রাণে
পিতৃ-সত্যে আবদ্ধ শকুনি
কুরুকুল ধ্বংস-ব্রত উদ্‌যাপন হেতু।

গৈরিশ ছন্দের নিখুঁত অনুসরণ দেখা যায় ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নরনারায়ণ' নাটকে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কর্ণের উক্তি সংযত, কিন্তু দ্বন্দ্বজর্জর :

প্রতিযোদ্ধা জ্ঞানে
এতকাল যার বধে
নিশিদিন করিয়াছি উপায়-কল্পনা,—
অদৃষ্টের তীব্র পরিহাস,
আজ সে আমার কৃষ্ণ কনিষ্ঠ সোদর।
দূর হতে যারে দেখে প্রমত্ত কামনা
ছুটিবে বাঁধিতে বক্ষে মুগ্ধ আলিঙ্গনে,
হে প্রিয়, হে প্রিয়তম,—
এক হস্ত বক্ষে দিয়া,
অন্য বাহু প্রসারিয়া,
বিঁধিতে হইবে মোরে মর্মহীন শরে
প্রাণাধিক সেই ধনঞ্জয়ে। [২/৪]

উভয় নাট্যকারই তাঁদের পৌরাণিক নাটকে গদ্য-সংলাপ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু পদ্য-সংলাপের শক্তিকে স্পর্শ করা সম্ভব হয়নি।

বাংলা পৌরাণিক নাটকের সংলাপ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে স্বগতোক্তি সম্পর্কে কিছু কথা বলতেই হয়। সংস্কৃত এবং ইংরেজী নাটকে স্বগতোক্তির যথেষ্ট ব্যবহার আছে। ইংরেজী নাটকে, বিশেষতঃ সেক্সপীয়রের নাটকে চরিত্র স্বগতোক্তির মাধ্যমে তার জীবনের অনুভূতি এবং মানসিক দ্বন্দ্বকে কেবলমাত্র দর্শকের কাছে প্রকাশ করে। সংস্কৃত নাটকে চরিত্রের মুখে উচ্চারিত স্বগতোক্তিতে কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশিত নয়। ইংরেজী নাটকের স্বগতোক্তিতে যেখানে কোন চরিত্রের অন্তর-মথিত চিন্তাভাবনার স্ফুরণ ঘটে, সেখানে সংস্কৃত নাটকের স্বগতোক্তিতে চরিত্রের নৈর্ব্যক্তিক ভাব-ভাবনার প্রতিফলন ঘটে। বাংলা পৌরাণিক নাট্যকারগণ এই উভয় নাট্যধারার স্বগতোক্তিকেই গ্রহণ করেছেন বলা যায়।

মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' এবং 'পদ্মাবতী' নাটকে Shakespeare-এর রীতি আংশিক অনুসৃত হলেও 'শর্মিষ্ঠা'য় দৈত্য, দেবিকা, শুক্রাচার্য, কপিল, রাজা, মন্ত্রী, বিদূষক, শর্মিষ্ঠা প্রভৃতি চরিত্রের মুখে অনাবশ্যক স্বগতোক্তি ক্লান্তিকর। 'পদ্মাবতী' নাটকেও রাজা ইন্দ্রনীল, নারদ, বিদূষক, রতি, কঞ্চুকী, কলি, পদ্মাবতী, শচী ইত্যাদি চরিত্রের বারংবার স্বগতোক্তিতে এই ত্রুটি লক্ষণীয়।

অপরদিকে গিরিশচন্দ্র তাঁর অন্যান্য একাধিক নাটকের মত 'নল-দময়ন্তী' নাটকে নলের স্বগতোক্তিতে তাঁর দোলাচল চিত্তের সুন্দর পরিচয় রেখেছেন—

এও কি কলির ছল ?
ছল—নিশ্চয় এ ছল !
প্রণয়িণী সে আমার,
সে ত' নয় দ্বিচারিণী।
বুঝি এতদিন বেঁচে নাই ;
আমা বিনে সে রহিতে নারে।

তবু নলের মনে রয়েছে সংশয়—

দময়ন্তী পুনঃ স্বয়ম্বরা ?
জানিলাম—তবে ধরায় রমণী নাই ;
ধর্ম্মপত্নী, জীবনসঙ্গিনী,
পতিপ্রাণা নারী নাই !
এইবার সৃষ্টিলোপ হবে ,
সে আমার প্রাণের প্রতিমা—

সে আমায় ভুলে গেছে?
এ কথায় নল না প্রত্যয় করে। [৪/১]

আধুনিক নাটকে স্বগতোক্তির স্থান অত্যন্ত কম। দ্বিজেন্দ্রলালের 'নূর-জাহান' নাটকেই প্রথম স্বগতোক্তির অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, পূর্বের নাটকগুলিতে তিনি এই রীতি অনুসরণ করেছিলেন। ঐতিহাসিক নাটকের তুলনায় তাঁর পৌরাণিক নাটকে স্বগতোক্তি ব্যবহার কম।

দ্বিজেন্দ্র পরবর্তী বাংলা নাটকে স্বগতোক্তি ব্যবহার উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে এসেছে। নাটকে স্বগতোক্তির বর্জনের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে হাডসন যথার্থ'ই লিখেছেন—"The criticism of our own day is, however, distinctly against its use, at any rate in realistic drama; it is now held to be not only a convention, but a clumsy convention, and one, strictly speaking, non-dramatic; a chief aim of the dramatist, it is asserted, should be to avoid it; whilst its appearance is deemed sufficient to stamp any new play as 'old-fashioned' in its style of workmanship." [১০] কেবলমাত্র বাস্তবধর্মী নাটকেই নয়, পৌরাণিক নাটকেও স্বগতোক্তি নাটকীয়তা সৃষ্টির মূলে আঘাত করে। দ্বিজেন্দ্র-পর পৌরাণিক নাট্যকারগণ এ জন্যই স্বগতোক্তি ব্যবহারে সংযত হয়েছিলেন।

১০. William Henry Hudson: An introduction to the study of Literature, London, 1963, P. 197

নবম পরিচ্ছেদ

পৌরাণিক নাটকে গান ॥

নাটক রচনার বহু পূর্ব থেকেই সঙ্গীত তার রূপমাধুরী নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। যে যুগে সভ্যতার সামান্যমাত্র বিকাশ হয়নি, আদিম মানুষ যখন প্রকৃতির বুকে ঘর বেঁধে আরণ্যক জীবনের সুখানুভব করত—সেই বিস্মৃতপ্রায় অতীতের বুকেই সঙ্গীতের জন্ম। এমনকি যখন কথার প্রয়োগ পর্যন্ত অভাবিত ছিল তখনও মানুষ সুরের গভীরে অনুভূতির দ্যোতনায় বিস্ময়ভরা পুলকে কম্পিত হয়েছে। সুরের অনুভূতিতেই যে সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনার সম্পূর্ণ না হলেও আংশিক প্রকাশ সম্ভব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।[১] ধীরে ধীরে সুরের সংগে কথার উদ্বাহ-বন্ধন সুসম্পন্ন হয়েছে, সঙ্গীতের সম্ভাবনা সফল হয়েছে। আরও পরবর্তীকালে সঙ্গীতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নৃত্য।

হার্বার্ট স্পেন্সার তাঁর "The origin and function of music" নামক প্রবন্ধের এক জায়গায় সুন্দর করে বলেছেন যে, মানুষের মনোভাব গাঢ়তম ও তীব্রতমরূপে প্রকাশ করবার জন্যই সংগীতের উৎপত্তি। তাঁর মতে সঙ্গীত হল নিজের উত্তেজনা প্রকাশ এবং অপরকে উত্তেজিত করার সূক্ষ্মতম মাধ্যম।

---

১. "Most discussions about the music of poetry seem to assume tacitly that the music lies in the language This is an error. The music lies in the voice, with language—considered as a spoken phenomenon—providing certain conditions within which the voice, operates. It is essential to emphasize the fact that the voice being the natural organ of feeling, has its own purely auditory expressiveness."

—Peacock, Ronald : The Art of Drama, London, 1960, PP. 121-22.

সঙ্গীত শ্রোতার দৃষ্টির সামনে একটি মায়ালোকের পর্দা তুলে ধরে এবং সমস্ত হৃদয়ের কোণে অনির্বচনীয় আনন্দের বার্তা বয়ে আনে। স্পেন্সারের এই প্রবন্ধটি আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা' নামক রচনায় লিখেছেন :

> স্পেন্সারের মতকে আর এক পা লইয়া গেলেই বুঝায় যে, এমন একদিন আসিতেছে, যখন আমরা সঙ্গীতেই কথাবার্তা কহিব। সভ্যতার যখন এতদূর উন্নতি হইবে যে, আমাদের হৃদয়ের অঙ্গহীন, রুগ্ন, মলিন বৃত্তিগুলিকে সশঙ্কিতভাবে আর ঢাকিয়া বেড়াইতে হইবে না, তাহারা পরিপূর্ণ সুস্থ ও সুমার্জিত হইয়া উঠিবে, যখন সমবেদনার এতদূর বৃদ্ধি হইবে যে পরস্পরের নিকট আমাদের হৃদয়ের অনুভাবসকল অসঙ্কোচে ও আনন্দে প্রকাশ করিব, তখন অনুভাব প্রকাশের চর্চা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিবে, তখন সংগীতই আমাদের অনুভাব প্রকাশের ভাষা হইয়া দাঁড়াইবে।[২]

সঙ্গীতের জন্মের ইতিহাস এবং অগ্রগতি আলোচনা করলে দেখা যায় আদিম স্তরে সুরই ছিল সংগীতের একমাত্র অবলম্বন, পরবর্তী স্তরে সঙ্গীত কাব্যমূল্য অর্জন করে। সুরের সঙ্গে কথার মিলনে যে গাথা-গীতের আবির্ভাব ঘটেছিল তার সাঙ্গীতিক মূল্য যেমন ছিল অপরিসীম সংগে সংগে কাব্যমূল্যও কম ছিলনা। সুরের সর্বাপেক্ষা বড় গুণ হল এই যে, মানবমনের অন্তরতম কেন্দ্রে তার সহজ-অনুপ্রবেশ সম্ভব। সুর এবং কথার সম্মিলনের সংগে সংগে তাই সংগীতের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হল। কাব্যসঙ্গীতের সুরধারা নাটকেও তার অনুপ্রবেশকে সম্ভব করল। নাট্য সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা আলোচনা করলে দেখা যায় যে প্রকৃতপক্ষে সমবেত সঙ্গীত বা কোরাস বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিচ্ছন্ন নাট্যসঙ্গীতে পরিণত হয়েছে।

কেবলমাত্র দর্শকদের মনে আনন্দসৃষ্টির জন্যই নাটকে সংগীতের ব্যবহার করা হয় না, নাট্যকাহিনীর স্বার্থেও সঙ্গীতের ব্যবহার কখনও কখনও প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেয়। নাটকের উৎপত্তির কালে সঙ্গীতই ছিল প্রধান

২. রবীন্দ্র রচনাবলী। জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ১৪শ খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৬৮, পৃঃ ৮৮৪-৮৮৫

অবলম্বন, কিন্তু নাটকের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংগীতের প্রভাব ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এসেছে এবং সেই শূন্যস্থান পূরণ করেছে সংলাপ। সংলাপের প্রাধান্যের সংগে সংগে সংগীতের প্রভাব শুধু কমেইনি, কোন কোন নাটকের ক্ষেত্রে সঙ্গীত অবাঞ্ছনীয় রূপে পরিগণিত হয়েছে।

যাত্রা, গীতাভিনয় এবং পৌরাণিক নাটকে সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট স্থান থাকলেও সামাজিক নাটক এবং প্রহসনে সঙ্গীতের ভূমিকা প্রায় উপেক্ষণীয়। তবে গান থাকলেই নাটক মেলোড্রামায় পর্যবসিত হওয়ার সম্ভাবনা এমন অভিমত ঠিক নয়। নাট্যকারকে স্থান-কাল এবং পাত্র বিচার করে গান ব্যবহার করতে হয়। এই বিচারে কোন ফাঁক থাকলে নাটকে সঙ্গীত ব্যবহারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। সঙ্গীত এবং নাটক—দু'টি স্বতন্ত্র শিল্পকর্ম। নাট্যরচনার পূর্বেই সঙ্গীতের জন্ম হয়েছিল। পরবর্তী যুগে নাট্যকার তাঁর প্রয়োজনে নাটকের মধ্যে সঙ্গীতের স্থাপনা করেন। প্রকৃতপক্ষে সঙ্গীতকে আশ্রয় করেই নাটকের জন্ম।

হোমারের গ্রীসে যে সঙ্গীতের বীজ রোপিত হয় তাই পরবর্তীকালে ডিথ্যাইর‍্যাম্ব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গ্রীক নাটকে রূপান্তরিত হয়। গ্রীক কোরাসের নায়ক থেসপিস্-ই প্রথম সঙ্গীতের সঙ্গে সংলাপ যুক্ত করে নাটকের সংলাপ সৃষ্টি করেন। ইংল্যাণ্ডের মাটিতেও (চতুর্দশ-পঞ্চাদশ শতাব্দীতে) খ্রীষ্টজীবনকে অবলম্বন করে আগে গান এবং পরে নাটক এসেছিল। গ্রীক ট্রাজেডিতে নায়করা দেবতার বেদীকে ঘিরে প্রথম নৃত্য-গীত করত। এই কোরাস গান ধীরে ধীরে বিশ্লিষ্ট হয়ে সংলাপে পরিণত হল। কোরাস নাটকের অঙ্গ হিসাবেই গৃহীত হল।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাটকের অন্যতম উপাদান হিসেবে সঙ্গীতের আলোচনা আছে। এই প্রসঙ্গে তিনি গীত, বাদ্য এবং নৃত্যকে একসঙ্গে আলোচনা করেছেন। আলোচনা সূত্রে তিনি বহির্গীত, দেবতার বন্দনাগীত, নান্দী এবং সূত্রধারের প্রবেশ ও গীতের কথা উল্লেখ করেছেন। নাটকের প্রস্তাবনায়, কোন অঙ্কের শেষে, রস থেকে রসান্তরে উপনীত হওয়ার সময় ধ্রুবা-গীত ব্যবহৃত হত। এই ধ্রুবাগীতের ভাষা ছিল শূরসেনী।[৩] ভরতের নাট্যশাস্ত্রে

৩. 'ভাষা তু শূরসেনী স্যাৎ ধ্রুবাণাং সম্প্রয়োজয়েৎ'—নাট্যশাস্ত্র, ৩২ অধ্যায়।

বর্ণিত ধ্রুবা-গান সংস্কৃত নাটকে প্রায় নেই-ই। ভরত-নির্দিষ্ট চৌষট্টি রকমের ধ্রুবা-গান (যেগুলি নেপথ্যে গীত) সংস্কৃত নাটকে পাত্র-পাত্রীর মুখের গানে এবং সংলাপের প্রাধান্যে বর্জিত হয়েছিল।

সংস্কৃত নাটকে সাধারণতঃ 'নান্দী' গীতির ব্যবহার দেখা যায়। তবে ভরত-নির্দেশিত ঋতু-বিষয়ক গান নান্দীতে সর্বত্র গীত নয়। কালিদাসের এবং ভাসের পুরাণ-নির্ভর দুটি নাটক যথাক্রমে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' এবং 'প্রতিমা' নাটকে গ্রীষ্ম ও শরৎ ঋতু-বিষয়ক নান্দীগীত থাকলেও, অন্যান্য সংস্কৃত নাট্যকারদের নাটকে নান্দীর পর ঋতু-বিষয়ক গান কদাচিৎ চোখে পড়ে। যাই হোক, সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত গান একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করত। ক্ল্যাসিকাল যুগের গানই পরবর্তীকালে আঞ্চলিক গীতে রূপান্তরিত হয়।

সংস্কৃত নাটকে যেমন গান প্রায় অপরিহার্য অঙ্গ ছিল, পাশ্চাত্ত্য নাটকে তা ছিল না। অপেরা বা লঘু নাটক ছাড়া পাশ্চাত্ত্য নাটকে গান ব্যবহারের প্রয়োজন নাট্যকারগণ তেমন অনুভব করেননি। সে দেশের নাটকে বাস্তব জীবন-সমস্যাই প্রধান, গানের রসমাধুরীর চেয়ে সংলাপের তীব্রতাই যে জীবন-কথাকে অধিক প্রকাশ করতে পারে। সেক্সপীয়র তাঁর নাটকে চরিত্রের বিকাশের জন্য এবং ঘটনার দ্বন্দ্বময়তাকে মুখর করবার জন্য গান ব্যবহার করেছেন। এলিজাবেথীয় যুগের পর নাটক থেকে সংগীত একেবারে বাদ যায়নি সত্য কিন্তু সংস্কৃত বা বাংলা নাটকের মত গানের স্রোত সেখানে দুর্বার নয়।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাটক সংগীতময়। ভাবাবেগ সঙ্গীতের মুখ্য অবলম্বন,—চিরভাবপ্রবণ বাঙালীর চিত্তমুকুরে সংগীতের আসনটি সর্বদাই উচ্চে। পাশ্চাত্ত্য নাটকে এবং সংস্কৃত নাটকে যেমন সংগীতের মধ্য দিয়ে নাটকের জন্ম ঘটেছে তেমনই বাংলা নাটকেরও জন্ম সংগীতের সিঁড়ি বেয়ে। জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, নাটগীত, ঝুমুর, ধামালি, কথকতা ইত্যাদি লোক-নাটগীত, পাঁচালী, কবিগান এবং যাত্রা বাঙালীর কয়েক শতাব্দীর সংগীতপ্রিয়তার ধারাবাহিক ইতিহাস। বাংলা নাটক যদিও পাঁচালী, কবিগান অথবা যাত্রা থেকে উদ্ভূত হয়নি কিন্তু এগুলির গীতরস বাংলা নাটকের মর্মকোষে সঞ্চারিত হয়েছিল। রামলীলা পাঁচালী,

কৃষ্ণলীলা পাঁচালী, মহাভারত পাঁচালী, রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক কবিগান এবং রামযাত্রা, মনসাযাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা ইত্যাদি কাহিনী ও রসের দিক থেকে বাংলা পৌরাণিক নাটকগুলির উপর তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি সত্য কিন্তু এগুলির সংগীত-প্রাধান্যকে বাংলা পৌরাণিক নাট্যকারগণ সরাসরি অস্বীকার করতে পারেননি।

অষ্টদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বাংলা পৌরাণিক নাটক রচনার সূচনা কাল পর্যন্ত যাত্রা রচনায় মোটামুটি গতি এসেছিল। যাত্রার সংগীত গীতাভিনয়ের মধ্য দিয়ে আংশিক শোধিত হয়ে বাংলা পৌরাণিক নাটকে অনুপ্রবেশ করেছিল।

বাংলাদেশের জলবায়ুতে কৃষ্ণযাত্রা একাকার হয়ে গিয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে কৃষ্ণযাত্রায় নৃত্য-গীত অত্যন্ত তরল হয়ে গিয়েছিল। শিশুরাম, পরমানন্দ অধিকারী, প্রেমচাঁদ প্রমুখরা যাত্রায় সংগীত ব্যবহারে সতর্ক হয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে গোপাল উড়ের যাত্রার মালিনী নৃত্য, খেমটা নাচ ইত্যাদি রুচিহীন নৃত্য-গীতকে সেকালে শিক্ষিত দর্শক সমাজ গ্রহণ করতে পারেননি। গোবিন্দ অধিকারী যাত্রায় রুচিসম্মত সংগীত প্রয়োগ করলেন। তাঁর 'মুক্তলতাবলী' যাত্রায় সঙ্গীত এবং সংলাপ পাশাপাশি এগিয়েছে—

বড়াই। ওগো সুবল মুক্তির জন্য ভাবনা কিগো?····· কানাই যে মুক্তিফল মোক্ষফল নিয়ে খেলে গো।

গীত

ওহে সুবল কি দেখাও তুচ্ছ মুক্তাফল।
যার মুক্ত ফল, তারই মুক্ত ফল, কথা নয় বিফল॥

সুবল। ওগো বড়াই মা, মুক্ত ত' আর গাছের ফল নয় বাছা, যে যার মুক্তফল তার মুক্তফল হবে? মুক্ত যে দুর্মূল্য গো।

বড়াই। ওগো সুবল বলি শোন,—

গীতাংশ

বৃক্ষে যেমন ফলে গো ফল,
তেমন দেহ-বৃক্ষে কর্মফল,

বদ্ধ নরে পায় কি ফল,
কখন সেই মুক্তফল॥

সুবল। এ সব ফল কোথা ফলে গো?

গীতাংশ
বড়াই।
মুক্তিফল মোক্ষফল
মুক্তফল মুক্ত ফল,
এ সকল ফল সুফল,
কল্পবৃক্ষে ফলে এ ফল॥…

কৃষ্ণকমলও গোবিন্দ অধিকারীর মত অতি গভীর ভাবকে সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতেন।

মতিলাল রায় এবং ব্রজমোহন রায় দু'টি স্বতন্ত্র ধারায় যাত্রা-সংগীতকে পরিমার্জিত করে নিয়েছিলেন। আগে কীর্তনে পাত্র-পাত্রীর সংলাপ প্রায় ছিলই না, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের যাত্রায় সংলাপের প্রাধান্যে গান অনেক কমে গেল। মতিলাল তাঁর যাত্রা-পালায় জুড়ি গানকে জনপ্রিয় করে তুললেন। বালক ও ছেলের দলের গান যুক্ত হল। জুড়ি গান গাইত আট-দশ জন, বালক দলের গায়ক সংখ্যা ছিল পঁচিশ-ত্রিশ জন। প্রস্তাবনার পূর্বে জুড়ি গান থাকত। গানের কথা আর যন্ত্রের সুর একাকার হয়ে দর্শকমনে ইন্দ্রজাল রচনা করত। মতিলাল ও ব্রজমোহনের সংগীত বাংলা পৌরাণিক নাটকে গভীর প্রভাব ফেলে। পরবর্তীকালে চারণ কবি মুকুন্দদাসের যাত্রায় জুড়ি গানের প্রচলন না থাকলেও সেবকদলের গান, ছাত্রীদের গান ইত্যাদি জুড়ি গানের বিকল্পরূপে কাজ করেছিল।

মনোমোহন বসু যাত্রা এবং নাটকের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে গীতাভিনয় লিখেছিলেন। যাত্রাশৈলীকে নাটকের আঙ্গিকের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বও তিনি নিয়েছিলেন। যাত্রার নেপথ্য-গীতি, সংলাপের ফাঁকে ফাঁকে গান ব্যবহার তাঁর গীতাভিনয়েও উপস্থিত। মনোমোহন নেপথ্য-গীতি ব্যবহারের মধ্যদিয়ে সুখ-দুঃখের প্রকাশে সার্থক হয়েছেন। রামাভিষেক নাটকের একটি গানের অংশবিশেষ—

(খট্—কাওয়ালি)
হায় কি হইল, এই মনে ছিল
ওরে বিধি তোমারো?

কি দোষ পাইলে, সমূলে নাশিলে
আশালতা আমারো ॥
পলকে প্রলয় হেন জ্ঞান হয়
নাহি হেরিলে যারে
কেমনে সে ধনে পাঠায়ে বনে
রব ভবনে আরো।
কে আর যতনে, মধুর বচনে
ডাকিবে বলে মা মা
তাপিত হৃদয় হইবে শীতল
মুখ হেরে কাহারো ॥······

[৪/১]

এখানে নেপথ্য গানে রামের আসন্ন বনবাস-জনিত ব্যথার কথা ভেবে কৌশল্যার তীব্র দুঃখ ঝরে পড়েছে। পরবর্তী দৃশ্যে নগরবাসীদের রামের বনগমনদৃশ্য অবলোকনের বর্ণনা একটি নেপথ্য গানে ব্যক্ত।

নাটকে একশ্রেণীর চরিত্র থাকে যারা সংসার-অনাসক্ত, বৈরাগী। এই চরিত্রগুলি গান গেয়ে নাটকের অন্যান্য চরিত্রের জড়তা ও বিহ্বলতা ঘোচাতে চেষ্টা করে। যাত্রার বিবেক ও মহান্ত চরিত্র, মনোমোহনের শান্তি পাগলা থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী, ঠাকুর্দা প্রভৃতি চরিত্র এই ভূমিকা পালন করেছে। লঘু কথাশ্রয়ী গানে মনোমোহনের শান্তি পাগলা গভীর তত্ত্বকথা প্রকাশ করে। গিরিশচন্দ্রের অধিকাংশ পৌরাণিক নাটকে একশ্রেণীর চরিত্রের মুখে এই জাতীয় গান ব্যবহৃত হয়েছে।

মনোমোহনের পুরাণাশ্রয়ী নাটক রামাভিষেকে গান আছে দশটি, সতী নাটকে গান আছ এগারটি এবং হরিশ্চন্দ্র নাটকে গান আছে আটটি। পার্থ পরাজয়ে উনত্রিশটি গান ব্যবহৃত হওয়ায় নাট্যধর্ম ক্ষুণ্ণ হয়েছে। মনোমোহনের নাটকে সমাপ্তি-সঙ্গীত এবং ভদ্রেতর চরিত্রের মুখে হাসির গানও ব্যবহৃত।

মনোমোহনের সঙ্গীত-রীতি তাঁর সমকালীন এবং উত্তরকালের গীতাভিনয়-নাটক রচয়িতাদের প্রভাবিত করেছিল। রাজকৃষ্ণ রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়, ব্রজমোহন রায়, অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ, ক্ষীরোদ-প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখের নাটকে মনোমোহনের গীতরীতির অনুসরণ

চোখে পড়ে। তিনি চেয়েছিলেন সঙ্গীতপ্রিয় বাঙালীর নাটকেও গান থাকুক, অতীত সঙ্গীতধারাকে যেন সে বিস্মৃত না হয়। সতী নাটকের ভূমিকায় তাই তিনি লিখেছিলেন: —"অতএব চরিত্রগত স্বভাবের সমর্থনপূর্বক বাঙ্গালা নাটকে সৎ সংগীতের বাহুল্য যতই থাকিবে, ততই লোকের প্রীতির কারণ হইবে সন্দেহ নাই। নাটকের অন্যান্য অঙ্গে কল্পনা ও বিচারশক্তি যেমন আবশ্যক, গীতি অংশেও তদপেক্ষা ন্যূন হওয়া উচিৎ নহে।"

সূচনাকাল থেকেই বাংলা নাটক ইংরেজী এবং সংস্কৃত নাটকের আঙ্গিক দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। ইংরেজী নাটকের আদর্শে প্রথম মৌলিক নাটক রচনা করতে গিয়ে তারাচরণ শীকদার যাত্রার গীত সম্পর্কে কড়া মন্তব্য করেন। 'ভদ্রার্জুনে' তিনি গান রেখেছেন মাত্র তিনটি। একটি নারদের মুখে হরিগুণ-গান (জয় যদুকুল তিলক দৈত্য অরে / হের মহিহীন পামরে মর্ত্যোপরে। ...... ইত্যাদি) এবং মদ্যপায়ীর মুখে দু'টি গান। নৃত্যগীতসহ মদ্যপায়ী গেয়েছে—

ঐ আস্‌তেছে অর্জুন।
আমি মদের জন্য হব খুন॥
যখন অর্জুন আসবে কাছে
তার কাছে ভিক্ষা-চাব,
সে আমায় যা ভিক্ষা দেবে
তাই দিয়ে মদ কিনে খাব।
ঐ আস্‌তেছে অর্জুন॥

এই গানটির দ্বারা নাট্যের বা কাব্যের কোন প্রয়োজন সাধিত হয়নি; এ ছাড়া "রাগমিশ্রণের মধ্যেও স্বৈরাচারের নিদর্শন স্পষ্ট।"[৪] যাত্রা-সঙ্গীতকে বিদ্রূপ করলেও পুরাণের ভাবগম্ভীর পরিবেশে এই শ্রেণীর গান যোজনা করে তিনি যাত্রা-প্রেমিকদেরই খুশী করতে চেয়েছিলেন।

তারাচরণের ন্যায় হরচন্দ্র ঘোষেরও ইংরেজী নাটকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। তাঁর একটিমাত্র পৌরাণিক নাটক 'কৌরব বিয়োগ'-এ একটিও গান নেই। কৌরব বিয়োগ রচনার বছরই লেখা কালীপ্রসন্ন সিংহের পৌরাণিক নাটক 'সাবিত্রী-সত্যবান' 'বিস্তর গীত সংযোজিত' হয়ে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়।

৪. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ: 'নাট্যসংগীতের রূপায়ণ', কলিকাতা, ১৯৬৬, পৃ: ৪৮

রামনারায়ণ তর্করত্নের তিনটি পৌরাণিক নাটকের মধ্যে 'রুক্মিণীহরণে' ৫ গান আছে সাতটি, কংসবধে চারটি। 'ধর্মবিজয়ে'র সঙ্গীত উল্লেখযোগ্য নয়। রুক্মিণীহরণ নাটকে লবঙ্গলতার কণ্ঠে একাধিক প্রেমসঙ্গীত ব্যবহার করে নাট্যিক মূল্য বাড়াবার চেষ্টা আছে।

বাংলা নাটকে প্রথম নাট্যসঙ্গীতের সূচনা মধুসূদনের উৎসাহেই সম্ভব হয়। মধুসূদন তাঁর বাল্য, কৈশোরে নূতন যাত্রার জনপ্রিয়তা দেখেছিলেন, ইংরেজী এবং সংস্কৃত নাট্যসঙ্গীতের সঙ্গেও তিনি যৌবনে পরিচিত হয়েছিলেন। পূর্ববর্তী নাট্যকারদের মত তিনিও যাত্রার সামগ্রিক ত্রুটি দেখেছিলেন, তাঁর নাটকে যাত্রাগানের প্রভাব পড়েছিল বলা যায়না। সংস্কৃত এবং ইংরেজী নাটকের মত মধুসূদনের নাটকে ঋতু সঙ্গীত, নেপথ্য সঙ্গীত, প্রস্তাবনা সঙ্গীত এবং সমাপ্তি সঙ্গীত ব্যবহৃত হয়েছে। গম্ভীর এবং লঘু—উভয় পরিবেশের উপরই তিনি সুন্দর গান লিখেছিলেন।

মধুসূদনের পৌরাণিক নাটক শর্মিষ্ঠায় গান আছে চারটি, পুরাণ-ধর্মী নাটক পদ্মাবতীতে গান আছে আটটি। শর্মিষ্ঠায় নেপথ্য সঙ্গীত আছে দু'টি, পদ্মাবতীতে সমাপ্তি-গীতটি ছাড়া আর সাতটি গানই নেপথ্য-গীতি। রাজা যযাতির প্রতি শর্মিষ্ঠার প্রেমানুরাগের চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে শর্মিষ্ঠার গাওয়া একটি নেপথ্য সঙ্গীতে—

[রাগিণী সোহিনী বাহার—তাল আড়া]

আমি ভাবি যার ভাবে, সে ত' তা ভাবে না।
পরে প্রাণ দিয়ে পরে, হলো কি লাঞ্ছনা।
করিয়ে সুখের সাধ, এ কি বিষাদ ঘটনা ;
বিষম বিবাদী নিধি, প্রেমনিধি মিলিলো না।
ভাব লাভ আশা করে, মিছে পরেরি ভাবনা।
খেদে আছি ম্রিয়মাণ, বুঝি প্রাণ রহিল না ॥

'পদ্মাবতী' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কে স্বপ্ন এবং চিত্রদর্শনে ইন্দ্রনীলের প্রতি আসক্তা পদ্মাবতীর অনুরাগের প্রকাশও ঘটেছে নেপথ্য সঙ্গীতে—

---

৫. "ইহার জন্য যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর গ্রন্থকারকে ৫০, টাকা পুরস্কার দেন এবং বহুবার স্বভবনে ইহার অভিনয়ের আয়োজন করেন।"

—সুশীল কুমার দে : নানা নিবন্ধ, কলিকাতা, ১৯৫৪, পৃঃ ২২১

[খাম্বাজ—মধ্যমান]

কেন হেরেছিলাম তারে।
বিষম প্রেমের জ্বালা বুঝি ঘটিল আমারে ॥
সহজে অবোধ মন, না জানে প্রেম কেমন,
সাধে হয় পরাধীন, নিশিদিন ভাবে পরে।……—

ঘটনা এগিয়ে চলেছে ; পদ্মাবতীর অদর্শনে কাতর ইন্দ্রনীলের প্রতি ভেসে এসেছে সান্ত্বনা-সূচক নেপথ্য সঙ্গীত (৪ / ৩)।

গিরিশচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ রায় প্রমুখ পৌরাণিক নাট্যকারগণ যেরূপ যাত্রার সঙ্গীতময়তায় আচ্ছন্ন হয়েছিলেন, মধুসূদন তা হননি। তাঁর নাটকে সঙ্গীতের ব্যবহার সংযত, সঙ্গত—রোমান্টিক আবেদনে শিহরিত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সঙ্গীতজ্ঞ নাট্যকার ছিলেন, কিন্তু তিনি কোন পৌরাণিক নাটক না লেখায় পৌরাণিক নাট্যসঙ্গীতের কোন পরিচয় তিনি রেখে যেতে পারেননি।

সংগীতের ব্যবহারে ভারসাম্যের অভাব যে নাটকের উপাদান থাকা সত্ত্বেও নাটককে গীতাভিনয়ের দিকে টেনে নিয়ে যায় তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রাজকৃষ্ণ রায় রচিত পৌরাণিক নাটকগুলি। রাজকৃষ্ণ ছিলেন কবি, তিনিই প্রথম 'কৌতুক নাট্যগীতি' রচনার দাবী করেছিলেন [দ্রঃ ভূমিকা চতুরালী (কৌতুক নাট্যগীতি), ১৮৯০]। মনোমোহনের দ্বারা প্রত্যক্ষ-প্রভাবিত রাজকৃষ্ণের একাধিক নাটক পড়লে মনে হয় পুরাণের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার মাঝে মাঝে কিছু গান যোজনাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। একাধিক চরিত্রের মুখে একান্ত অকারণে গান বসিয়ে তিনি পৌরাণিক নাটকের কাঠামোকে ক্ষুণ্ণ করেছিলেন।

মধুসূদনের পৌরাণিক নাটকে যেমন প্রেমসংগীতের প্রাধান্য, রাজকৃষ্ণের পৌরাণিক নাটকে তেমনই ভক্তিসংগীতের তরল প্লাবন। সকল ভক্তিসঙ্গীতই সার্থক নাট্যসঙ্গীত হবে এমন কোন কথা নেই। কিন্তু রাজকৃষ্ণের নাটকে দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্যই গান যোজিত হত বলে তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলিতে অপ্সরাদের গান (অনলে বিজলী ও নরমেধ যজ্ঞ), প্রজাগণের গান (ভীষ্মের শরশয্যা) থেকে শুরু করে রমণীগণের গান (রামের বনবাস) পর্যন্ত ব্যবহৃত। বাংলা পৌরাণিক নাটকগুলিতে শিষ্যগণের গান, গন্ধর্ব

কন্যাগণের গান, সখীগণের গান, ঋষিকন্যাগণের গান, বৈতালিকের গান প্রায়শঃ ব্যবহৃত। রাজকৃষ্ণের নাটকেও এই জাতীয় গান যথারীতি আছে। যাত্রার পৌর্ণমাসীর গানের প্রতিধ্বনি শুনি প্রহ্লাদের কণ্ঠে—

পাষাণের ভার নয়রে গুরু,
পাপের ভারেই গুরু অতি।······ইত্যাদি
(প্রহ্লাদ চরিত্র)

ভাব ও আবেদনের দিক থেকে আকর্ষণীয় হলেও রাজকৃষ্ণের অধিকাংশ পৌরাণিক নাটকের গান অপ্রয়োজনীয়।

বাংলা নাটকে সঙ্গীতের অনুপ্রবেশ ঘটায় তৎকালীন নাট্য সমালোচকগণ তার তীব্র সমালোচনা করেন। গিরিশচন্দ্র তাঁদের উদ্দেশ্যে 'পৌরাণিক নাটক' প্রবন্ধে লিখেছিলেন—"আমাদের সমালোচকরা বাংলা নাটক হইতে গান পরিত্যাগ করিতে বলেন, বোঝেন না— অপর ভাষায় গানের নাটক-উপ-যোগী হৃদয়-ভাব ব্যক্ত করিবার শক্তির অভাব। সেই নিমিত্ত সে সকল ভাষার আদর্শ দিয়া বাংলা নাটকে গান থাকিলে বিরক্তি প্রকাশ করেন। তাঁহারা জানেন না যে, হিন্দু-সুর-রচয়িতার কতদুর হৃদয়-হারিণী প্রভাব।"···মূর্খ সমালোচকের কথা গিরিশচন্দ্র শোনেন নি। তিনি তাঁর পৌরাণিক নাটকে প্রচুর গান সংযোজন করেছেন, যার বেশ কিছু গানের উদ্দেশ্য হল দর্শকের মনোরঞ্জন করা। কিন্তু নাটকে গান প্রযুক্তির সময় আন্তরিকতা থাকায় তাঁর অনেক গান নাট্যমূল্য অর্জন করেছে। আদ্যোপান্ত গান দ্বারা গিরিশচন্দ্র অনেকগুলি গীতিনাট্য রচনা করলেও এই গীতিমুখরতায় তাঁর পৌরাণিক নাটকের গম্ভীর পরিবেশ ক্ষুণ্ণ হয় না। গিরিশচন্দ্রের সমকালে বাংলাদেশে যাত্রা, কবিগান এবং গীতাভিনয়ের যথেষ্ট সমাদর ছিল এবং সেই তরঙ্গ থেকে তিনি দূরে সরে থাকেননি। কিন্তু তাঁর নাট্যসংগীত সে জন্য রাজকৃষ্ণের মত প্রায়শঃ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় নি। এখানেই গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব।

গিরিশচন্দ্রের প্রথম পৌরাণিক নাটক রাবণবধ-এর দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে অপ্সরাগণ এবং প্রমথগণ, তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে যোগিনীগণ, ঐ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে পুনরায় যোগিনীগণ গান গেয়েছে। গন্ধর্বগণের গীতে শ্যামা-সঙ্গীতের ছাপ স্পষ্ট—

(টোরী ভৈরবী—আড়াঠেকা)

রাখ মা রাখ মা, রমা রণরঙ্গিনী
উমেশ হৃদয়-বাস, দিগবাস-অঙ্গিনী
বরদে বর দে শ্যামা,
বিপদকারিণী বামা
শুভদে শিবসঙ্গিনী, অশিব ভয়-ভঙ্গিনী ॥

(৩/৬)

পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যের যা কিছু মূল্য তা সৈন্যদলের গানে। এই গানটি একই সংগে রাম, সীতা এবং প্রকৃতির বন্দনা-গীতি—

(যোগিয়া—একতালা)

ফুলের সৌরভ ধায়, ফুল বরষিয়ে যায়,
ফুল-যান, ফুল্ল-প্রাণ, ফুলে বিমোহন।
জয় মা জানকী সতী, জয় জয় রঘুপতি,
জয় অগতির গতি ভুবন পাবন।

গিরিশচন্দ্র তাঁর পৌরাণিক নাটকের গানে তারাচরণ, হরচন্দ্র অথবা মধুসূদনের মত কোন নিয়ম মেনে চলার কথা বলেননি। পৌরাণিক নাটকে ভক্তি এবং বিশ্বাস যেমন বল্গাহীন তেমনই সঙ্গীতেরও গণ্ডী সীমাহীন। তাঁর কোন পৌরাণিক নাটকে গান আছে পাঁচটি আবার কোনটিতে আছে সাতাশটি। নাটকের ক্ষেত্রে পরিহার্য এমন সঙ্গীতকে যেমন তিনি নাটকে খুব বেশী স্থান দেননি তেমনই জনপ্রিয় সঙ্গীত রচনাতেও তিনি সতর্ক ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক এবং ধর্মাশ্রয়ী নাটকের বহু গান সেকালে লোকের মুখে মুখে শোনা যেত। 'কমলে কামিনী' নাটকে শ্রীমন্তের নিম্নোদ্ধৃত গানটি দর্শক-শ্রোতার মন আবিল করে রাখত—

[আলাহিয়া-খাম্বাজ—ঝাঁপতাল]

কেন ভোল, দুর্গা বল, দুর্গা বল মন আমার।
জীবনে মরণে মন চরণ ছেড় না মার ॥
বাসনা ছলনা করে, মায়া-মোহ রাখে ধরে,
তাতে ত' শমন-করে, পাবে না নিস্তার ॥
দুঃখ পেয়ে কর্মফলে, ডাক দুর্গা দুর্গা বলে,
অন্তিম মোহের ছলে, ভুলো না রে আর ॥

(৩/৬)

'চৈতন্যলীলা' নাটকটির সঙ্গীতের সার্থকতা সম্পর্কে অমৃতলাল বসু ও বিনোদিনী দাসীর স্মৃতিচারণ স্মরণীয়। 'বিল্বমঙ্গল' ঠাকুর নাটকের অন্যতম আবেদন হল সংগীত। "এই নাটকের প্রথম গানটি (১/১) এক সময় মুখে মুখে শোনা যেত এবং গানটির প্রথম লাইনটি প্রবাদ বাক্যের মত চালু হয়েছিল।"[৬] এই নাটকে পাগলিনী এবং ভিক্ষুকের কণ্ঠে ধৃত সংগীতগুলি নাটকের পক্ষে একান্ত উপযোগী। দ্বিতীয় অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে টহলদারদের প্রভাতী সংগীতটি বিল্বমঙ্গল চরিত্রের উপর গভীর ছায়া ফেলেছে—

(ভৈরব—কারফা)

কি ছার আর কেন মায়া, কাঞ্চন কায়া ত' রবে না।
দিন যাবে, দিন রবে না ত', কি হবে তোর তবে ?
আজ পোহালে কাল কি হবে, দিন পাবি তুই কবে···
আপন রতন বেছে নে চল, হরি বলে ডাকি।

গিরিশচন্দ্র তাঁর 'পৌরাণিক নাটক' প্রবন্ধে, হিন্দু সুর রচয়িতার নিজস্বতার কথা সপ্রশংসভাবে উল্লেখ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দু সংগীতের মধ্যে ইংরেজী সুর প্রবিষ্ট করেছিলেন বলে কম সমালোচিত হননি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সোনার কাঠি' নামক প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের সংগীত-রীতিকে সমর্থন জানিয়ে জোর দিয়ে বলেছেন—

> 'যদি দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দু-সংগীতে বিদেশী সোনার কাঠি ছুঁইয়ে থাকেন, তবে সরস্বতী নিশ্চয়ই তাঁকে আশীর্বাদ করবেন। হিন্দু-সংগীত বলে যদি কোন পদার্থ থাকে তবে সে আপনার জাত বাঁচিয়ে চলুক ; কারণ তার প্রাণ নেই, তার জাতই আছে। হিন্দু-সংগীতের ভয় নেই, সে বিদেশের সংস্রবে আপনাকে বড়ো করেই পাবে।'
>
> (বিচিত্র প্রবন্ধ)

দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যান্য নাট্যধারার মত পৌরাণিক নাট্য রচনাতেও এই নতুন দেশী-বিদেশী সংগীত রীতির এক অভিনব মিশ্রণ লক্ষণীয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের পৌরাণিক নাটকের গানগুলির সাঙ্গীতিক এবং কাব্যমূল্য ব্যতীত আর একটি মূল্য আছে, তা হল সংগীতের সাহায্যে নাটকীয় ঘটনার

৬. প্রভাতকুমার গোস্বামী : 'বাংলা নাটকের গান' কলিকাতা, ১৯৭১, পৃঃ ১৯৬

একটি পরিণতি দান। দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্বে একমাত্র গিরিশচন্দ্র ব্যতীত আর কোন পৌরাণিক নাট্যকারই এই নাট্যসংগীতের ধর্মটি অনুসরণ করেননি। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের চেয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের যে গুণটি বেশী ছিল তা হল তিনি স্বয়ং সুরকার। তাঁর সংগীতমনন প্রহসন এবং ঐতিহাসিক নাটকে সাফল্যের শীর্ষ স্পর্শ করলেও পৌরাণিক নাটকের গানগুলিও কম সার্থক নয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'পাষাণী'কে প্রকৃতপক্ষে পৌরাণিক নাট্যকাব্য বলাই ভাল। তিনি কবি-নাট্যকার—এই নাটকেও তাঁর রোমান্টিক কবি প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটেছে গানে। সূচনা দৃশ্যটিতে কোন গান না থাকলেও শেষ দৃশ্যটি আগাগোড়া অপ্সরাদের গানে রচিত। অপ্সরাদের অন্যান্য গান এবং রাজার গান (৩/৪) একান্তই দর্শকদের আনন্দবর্ধনের জন্য রচিত। ইন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে অহল্যার উন্মন হৃদয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে একটি গানে—

আজি মোর প্রাণ কি চায়।
জাগে এ হৃদয় আজি কি আকুল বাসনায়
আজি অধীর প্রাণে কেন প্রবোধ না মানে,
কোন অজানিত টানে, কার পানে ভেসে যায়।...

এই গানটির মধ্যে যেন মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটকের প্রেমসঙ্গীত অনুরণিত।

পাষাণী নাটকের চিরঞ্জীব চরিত্রটি সঙ্গীতের জন্যই যেন নাটকে উপস্থিত। মোট সাতটি গান এই চরিত্রটিকে কখনও তত্ত্বপ্রচারক আবার কখনও হাস্যপ্রবণ করেছে। পূর্ববর্তী পৌরাণিক নাট্যকারদের মত দ্বিজেন্দ্রলালও পাষাণী নাটকে যোগীগণ এবং তাপস-বালকগণের কণ্ঠে গান বসিয়েছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নাটকে কোন গান নেই। ভীষ্ম নাটকে ব্যবহৃত গানের অধিকাংশই নাট্যানুসারী ও সুপ্রযুক্ত। বিচিত্রবীর্যের দুই পত্নী অম্বালিকা এবং অম্বিকার চারটি গানই তাদের চরিত্রের চপলতা ও সজীবতার দ্যোতক। চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে গীত তাদের দ্বৈতসঙ্গীত নাটকের ভবিষ্যৎ ঘটনার নির্দেশ করেছে। পাষাণী নাটকের রাজার গানটি যেমন অবান্তর বলে নাট্যকার স্বয়ং ভূমিকায় গানটি বাদ দিতে বলেছিলেন, ভীষ্ম নাটকের কৃষ্ণের গানটি (৫/৩) বাদ দিতে বললেও তিনি কিছু ভুল করতেন না।

দ্বিজেন্দ্রলালের সমকালেই যাত্রায় অপেরা রীতি যুক্ত হতে থাকে। যাত্রা অপেরা পার্টি বা থিয়েট্রিকাল যাত্রা পার্টি হিসাবেই বেশী পরিচিত হতে থাকে। গিরিশচন্দ্র এবং অতুলকৃষ্ণের নাট্যসঙ্গীতে অপেরার প্রভাব মৃদু হলেও কিছু পরিমাণে ছিল। ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে যাত্রা ও অপেরা সঙ্গীত রীতি একই সঙ্গে মিশেছিল। এক্ষেত্রে তিনি গিরিশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ। গিরিশচন্দ্রের ন্যায় তিনিও নাটকে সখীগণ, দেববালাগণ, পুরনারীগণ, বৈতালিক প্রভৃতিদের সমবেত সঙ্গীত ব্যবহার করেছেন। সাবিত্রী এবং উলুপী নাটকে উভয় চরিত্রের কণ্ঠেই নাট্যকার দুঃখবিধুর গান রেখেছেন। তবে গীতিনাট্যগুলিতে ক্ষীরোদপ্রসাদের সঙ্গীত প্রতিভা সাফল্যের যে শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছে, পৌরাণিক নাটকের পক্ষে সেই স্থান দখল করা সম্ভব হয়নি।

অতঃপর বাংলা পৌরাণিক নাটক লিখতে গিয়ে অনেক নাট্যকারই পূর্ববর্তী নাট্যকারদের সঙ্গীতানুরাগকে অস্বীকার করতে পারেননি। গিরিশঅনুসারী পৌরাণিক নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং গীতিনাটকের মত পৌরাণিক নাটকেও যথেষ্ট গান যুক্ত করেছেন।

নাট্যকার যোগেশ চৌধুরী এবং মন্মথ রায়ের নাটকে গীতের আধিক্য লক্ষ্য করবার মত। যোগেশ চৌধুরীর পৌরাণিক নাটক সীতায় বন্দীর গান, বনলক্ষ্মীদের গান আছে। 'রাবণ' এবং 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নাটকে গানের আধিক্য ঘটেছে। তাঁর বিষ্ণুপ্রিয়া নাটকের গানে যেমন সুরারোপ করেছিলেন অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে, তেমনই মন্মথ রায়ের কারাগার নাটকে গীত রচনা করেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম।

বাংলা পৌরাণিক নাটকে গান ব্যবহারের ক্ষেত্রে সকল নাট্যকারই মোটামুটি একটি সিদ্ধরীতি অনুসরণ করে চলেছেন। ফলে অধিকাংশ পৌরাণিক নাটকই হয়ে পড়েছে গীতিমন্থর। দ্বিজেন্দ্রলাল এই পথ থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন ভারতীয় সঙ্গীতের সংগে পাশ্চাত্ত্য সংগীতের একটি মিশ্রণ ঘটিয়ে। অথচ তাঁর নিজের লেখা পৌরাণিক নাটকেও গান ব্যবহার সর্বত্র যথাযথ নয়। আসলে পৌরাণিক কাহিনীর ভক্তিরস এবং পুরাণ-প্রিয় দর্শকচিত্তকে কোন নাট্যকারই উপেক্ষা করতে পারেননি। একমাত্র মধুসূদনই এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম।

পৌরাণিক নাট্যসঙ্গীতের বাতাবরণে সমকালীন সমাজ এবং রাজনৈতিক জীবনের প্রতিফলন সাধারণ ঘটনা না হলেও এরূপ কয়েকটি গান পাওয়া যায় যেগুলির ভিতর সমকালীন পরাধীনতার জ্বালার মর্মন্তুদ চিত্র উদ্ঘাটিত। এই গানগুলি নিঃসন্দেহে পৌরাণিক নাটকের ঔচিত্যে আঘাত করেছে—কিন্তু তৎকালীন জাতীয় জীবনের অগ্নিগর্ভ পরিবেশে এরূপ ঘটা অস্বাভাবিক নয়।

মনোমোহন বসুর 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকে হিন্দুমেলার (প্রতিষ্ঠা ১৮৬৭) অন্যতম উদ্যোক্তা মনোমোহন একটি গানের সাহায্যে সেকালের ভারতবর্ষের পরাধীনতার তৈলচিত্র অঙ্কন করেছেন।······

দিনের দিন সবে দীন ভারত হ'য়ে পরাধীন।
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ,
অনশনে তনু ক্ষীণ।
যে সাহস বীর্য নাই আর্যভূমে,
পূর্ব গর্ব সর্ব খর্ব হল ক্রমে,
চন্দ্র-সূর্য বংশ অগৌরবে ভ্রমে
লজ্জা-রাহু-মুখে লীন।······

শস্যশ্যামল ভারতের,—

তাঁতি-কর্মকার, করে হাহাকার;
সূতা, জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার
দেশী বস্ত্র, অস্ত্র বিকায় না আর,
হলো কি দেশের দুর্দ্দিন।······
সুচ্-সুতা পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে
দিয়াশলাই-কাটি, তাও আসে পোতে,
প্রদীপ জ্বালিতে, খেতে, শুতে, যেতে
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন।

বাংলা পৌরাণিক নাটকে পাশ্চাত্যের কোরাস-রীতি যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। গ্রীক কোরাসে একজন গায়কের গানের উত্তর দিত যৌথ-গায়কদল। পরবর্তীকালে কোরাসে একদল গায়ক-অভিনেতা নেপথ্যের ঘটনার বিবরণ দিত গানে—এরা নাটকের পূর্ববর্তী দৃশ্যের সঙ্গে পরবর্তী দৃশ্যের ঘটনার সংযোগ করত গানে। ইউরিপিডিসের কোরাস নাট্যকাহিনীর সংগে

সম্পর্ক হারিয়ে বসত, কিন্তু সফোক্লিসের কোরাস নাটকের ভবিষ্যৎ ঘটনার আভাস দর্শকদের দিত। এইভাবে কোরাস হয়ে উঠল একটি নাট্যচরিত্র। [১]

বাংলা পৌরাণিক নাটকে কোরাসের ভূমিকা কখনও নাটকের প্রয়োজনে; আবার কখনও নাটকে তাদের কোন ভূমিকাই থাকে না। অনেক সময়ই তারা এরিষ্টটল-উক্ত বিরামগীতি (Interlude) গেয়েছেন মাত্র। এই যৌথ সঙ্গীত ব্যবহার প্রায় সকল বাংলা পৌরাণিক নাটকে আছে।

বাংলা পৌরাণিক নাট্যকারগণ সঙ্গীত রচনার সময় বহু রাগ-তালের আশ্রয় গ্রহণ করতেন। তার ভিতর দিয়ে সঙ্গীতের উপর তাঁদের অনুরাগ এবং সঙ্গীত সম্পর্কে তাঁদের অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হয়েছে। এই নানা রাগ-রাগিণী ও তাল ব্যবহারের একটি ক্ষুদ্র পরিচয় দিলেই তাঁদের সঙ্গীত প্রবণতার পরিচয়টি সম্পর্কে ধারণা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে যায়—

মধুসূদন ॥ রাগিণী বাহার—তাল জলদ—তেতালা;
রাগিণী সোহিনী বাহার—তাল আড়া;
রাগিণী ঝিঁঝোটি—তাল মধ্যমান।
খাম্বাজ—মধ্যমান।
পরজ কালাংড়া—একতাল।
খাম্বাজ—যৎ
......ইত্যাদি

মনোমোহন ॥ খট্—কাওয়ালি।
গৌড় সারং—ঢিমা তেতালা।
খট্—ঢিমা তেতালা।
ইমন কল্যাণ—চৌতাল।
......ইত্যাদি

রাজকৃষ্ণ ॥ বসন্ত—চৌতাল

"The chorus too should be regarded as one of the actors; it should be an integral part of the whole and share in the action, in the manner not of Euripides but of Sophocles."

—*Aristotle's Poetics* (translated by S.H. Butcher), U.S.A, 1951, P. 69.

গিরিশচন্দ্র ।। ঝিঁঝিট—আড়াখেমটা।
বাঁড়োয়া মিশ্র—একতাল।
ধানি মিশ্র—একতাল।
বেহাগ—যৎ।
টোড়ী—ঢিমে তেতালা।
পাহাড়ী পিলু—খেমটা।
পঞ্চম—তেওরা।
ইমন কল্যাণ—ঝাঁপতাল।
দেশ—কার্‌ফা।
সারংগ—তেওরা।
বেহাগ—চৌতাল। ···ইত্যাদি

দ্বিজেন্দ্রলাল ।। ইমন কল্যাণ—দাদরা।
মিশ্র দেশ—একতাল।
ভৈরবী রাগ—ত্রিতাল।
···ইত্যাদি।

কথা এবং সুরের সার্থক মিলন ঘটিয়ে পৌরাণিক নাটকে সুন্দর গান লিখেছেন গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল। ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রকে অস্বীকার করে নয় বরং তাকে আত্মস্থ করে জনরুচির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে উভয় নাট্যকার গান রচনা করেছিলেন বলেই তাঁদের নাট্যচরিত্রের মুখের গান দর্শকদের মুখে প্রসারিত হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রোত্তর বাংলা পৌরাণিক নাটকের সঙ্গীতে রাগ-রাগিণী এবং তালের সূক্ষ্ম কারুকার্য অন্তর্হিত হয়েছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে নাট্যসঙ্গীতের জায়গায় নাট্যসংলাপ একান্ত মুখ্য হয়ে উঠেছিল বলেই মার্গ সংগীতের ধাঁচে মনোরম নাট্যসংগীত রচনার উৎসাহে ভাঁটা পড়ে যায়।

দশম পরিচ্ছেদ

পৌরাণিক নাটকে চরিত্র ॥

সাহিত্যকর্মের বিভিন্ন ধারার গঠনশৈলীর তুলনায় নাট্যধারার গঠনশৈলী যথেষ্ট জটিল। ঔপন্যাসিক, কবি অথবা প্রাবন্ধিক তাঁদের বর্ণিত বিষয়কে নিজ মননের আলোকস্পর্শে বর্ণনা করে যান, কোন নির্দিষ্ট অবয়ব-রীতি অনুসরণ তাঁদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু নাটক রচনার সময় অঙ্ক-দৃশ্য-সজ্জা, সংগীত, সংলাপ এবং রসের প্রতিষ্ঠায় যেমন নাট্যকারকে সদা সচেতন থাকতে হয় তেমনই কাহিনী এবং চরিত্রকে দুটি সমান্তরাল রেখায় এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। নাটকের কাহিনী এবং চরিত্রই প্রাণ—নাট্যকার আমাদের মত সম্মুখ সারির দর্শকমাত্র। যে নাটকের কাহিনী যত বেশী জটিল এবং চরিত্রসমূহ যত বেশী দ্বন্দ্বদীর্ণ, সেই নাটক ততবেশী প্রাণবন্ত। নাট্যকাহিনীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়, চমৎকারিত্বে এবং আবেগে নাট্য-চরিত্র যতবেশী দোলায়িত হয়, উপন্যাস অথবা আখ্যানকাব্যে চরিত্রের বিকাশের সে সুযোগ থাকেনা। নিরবচ্ছিন্ন সংলাপের মধ্য দিয়ে চরিত্র ধীরে ধীরে তার মনের অন্দরমহলের দ্বারটি উন্মুক্ত করে দেয় এবং কখনও মহৎ, কখনও অসৎ কখনও বা ভাল-মন্দ মিশ্রিত চরিত্রের নাট্যপরিণতি দেখে দর্শক তৃপ্তির আনন্দ উপভোগ করে। এমনও দেখা যায় যে, নাট্যকার সুন্দর কাহিনী নির্বাচন করেছেন, গভীর নাট্যরসের জন্য সুন্দর সংলাপও ব্যবহার করেছেন কিন্তু চরিত্রের বিকাশ সমভাবে না হওয়ায় নাটকটি কাম্য পরিণতি থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। সুতরাং দেখা যায় নাটকে কাহিনীর যেমন স্থান, চরিত্রেরও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

কাহিনী এবং চরিত্র—নাটকে এই দু'টি মুখ্য উপাদানের ভিতর কোনটির স্থান উচ্চে এ নিয়ে পাশ্চাত্ত্য সমালোচক এবং নাট্যকারগণ নানা মত প্রকাশ করেছেন। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ নাটকের নায়কের স্বরূপ এবং লক্ষণ নির্দিষ্ট

করে দিলেও কাহিনী এবং চরিত্রের ভিতর কোনটির গুরুত্ব বেশী সে সম্পর্কে নিশ্চিত কোন অভিমত দেননি।

বাংলা পৌরাণিক নাটকগুলি সম্পর্কে প্রাথমিক বিচারে দেখা যায়, কাহিনীই এই নাটকগুলিতে নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে সক্রিয় এবং চরিত্রগুলি কাহিনীর আবর্তে পড়েই ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছে। সেজন্য এই শ্রেণীর নাটকে কি অতিমানব, কি ব্যক্তিচরিত্র—এর কোনটিরই একটি নিটোল নাট্য-চরিত্ররূপে বিবর্তন সম্ভব হয়নি। অবশ্য ঐতিহাসিক এবং সামাজিক নাটকের সম্পর্কে এই উক্তি সর্বত্র সম্ভব নয়।

নাট্যশাস্ত্রের বিদগ্ধ পণ্ডিত এ্যারিষ্টটল কাহিনীকেই নাটকের আত্মা বলেছেন। তাঁর মতে জীবনের কাহিনী নিয়েই নাটক হাজির হয় এবং সেইজীবনের আগাগোড়াই ঘটনাময়। জীবনেরই সূত্র ধরে আসে চরিত্র ("Character comes in a subsidiary to the actions.")। এ্যারিষ্টটল বলেছেন যে, একমাত্র সুচারু কাহিনীই ভাল ট্রাজেডির জন্ম দিতে পারে। তিনি আরও জোর দিয়ে বলেছেন যে, চরিত্রের অভাবে ভাল করুণ-রসাত্মক নাটক লেখা যায় কিন্তু করুণ-রসাত্মক কাহিনীর অনুপস্থিতিতে ভাল চরিত্রের সাহায্যেও ট্রাজেডির ঘনীভূত রসসৃষ্টি অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য হল—"Again if you string together a set of speeches, expressive of character and well finished in point of diction and thought you will not produce essential tragic effects nearly so well as with a play, which however, deficient in these respects, yes has a plot and artistically constructed incidents." গ্রীক ট্রাজেডি ও সেক্সপীয়রীয় নাটক থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত রচিত নাটকে ঘটনার স্থানটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রধান।

অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ নাট্যসমালোচক জন ড্রাইডেন এবং উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ সমালোচক হেনরি আর্থার জোনস্—এঁরা দুজনেই এ্যারিষ্টটলের মত থেকে দূরে সরে গিয়ে বলেছেন নাটকের প্রধান উপকরণ হল চরিত্র। নাটকে ঘটনার বর্ণনা আড়ম্বরের সংগে করা হল কিন্তু চরিত্রের প্রতি নাট্যকারের দৃষ্টি নেই—সেক্ষেত্রে নাটকটিতে অতিনাটকীয়তা সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। হাডসনও বলেছেন—

"Characterisation is the really fundamental and lasting element in the greatness of any dramatic work." ১

প্রকৃতপক্ষে নাট্যকাহিনীর রসের বিকাশ ঘটে কাহিনীর মধ্য দিয়ে এবং বক্তব্য অথবা ভাবের বিকাশ ঘটে চরিত্রের মধ্য দিয়ে। ঘটনাহীন চরিত্র যেমন নাটকে কোন সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারেনা তেমনই চরিত্র-হীন ঘটনাও প্রকৃত রসমোক্ষণে অসার্থক। সেক্সপীয়রের নাটকের প্রকৃত প্রাণবস্তু লুকিয়ে আছে অসাধারণ চরিত্রসৃষ্টির দক্ষতার উপর। জুলিয়াস সীজারের ঐতিহাসিক কাহিনীর অগ্রগমনের পাশাপাশি ব্রুটাস, ক্যাসিয়াস, ক্যালপুর্ণিয়া, অ্যাণ্টনি ইত্যাদি চরিত্রের নানা মানসিকতার চমৎকার বর্ণনাই নাটকটিকে উচ্চমূল্য দিয়েছে। হ্যামলেটের অন্তর্দ্বন্দ্ব, শাইলকের জিঘাংসা, ডেসডিমনার নিকষিত হেম প্রেম, ইয়াগোর চক্রান্ত নানা নাটকের কাহিনীকে জটিল ঘুর্ণির মুখে পৌছে দেয় এবং দর্শকের রসবোধ এক অনির্বচনীয় সুখস্বাদে ভরপুর হয়ে ওঠে। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে সার্থক নাটকের জন্য প্রয়োজন কাহিনী ও চরিত্রের ভিতর সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন।

নাট্যসাহিত্যের অন্যান্য শাখার চরিত্রগুলির সংগে তুলনায় পৌরাণিক নাটকের চরিত্রগুলি স্বতন্ত্র শ্রেণীর। ঐতিহাসিক নাট্যকার তাঁর 'Romantic imagination' অধিকারের সাহায্যে ঐতিহাসিক চরিত্রে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত কল্পনার তুলি টানতে পারেন। সেক্সপীয়র থেকে শুরু করে দ্বিজেন্দ্রলাল পর্যন্ত সকল পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য নাট্যকার ঐতিহাসিক নাটক রচনায় সেই অধিকারের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করায় তাঁদের সৃষ্ট ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি কেবলমাত্র ইতিহাসের চরিত্র হয়ে থাকেনি, নাটকের জীবন্ত চরিত্রের সত্যমূল্যও অর্জন করেছে। সামাজিক নাটক এবং প্রহসনে চরিত্রসৃষ্টির সময় নাট্যকার স্বেচ্ছাবিহার করে থাকেন। তাঁরা খুশীমত চরিত্রগুলিকে পোষাক-পরিচ্ছদ পরিয়ে দেন, ইচ্ছামত তাদের মুখে সংলাপ বসান—চরিত্রগুলির পরিণতিও নাট্যকারদের ইচ্ছাশক্তি-নিয়ন্ত্রিত। এক্ষেত্রে যদি অতিনাটকীয়তা সৃষ্টির কোন সুযোগ নাট্যকার না নেন তা হলে সমালোচকদের আর কিছুই বলার সুযোগ থাকে না।

১. **W. H. Hudson : An introduction to the study of Literature, London, 1963, P. 186.**

পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে সমালোচকরা চরিত্রসৃষ্টির সময় কল্পনার স্বাধীনতা-প্রয়োগে কোন সুযোগ দিতে রাজী নন। পৌরাণিক নাটকের চরিত্রগুলি একান্তই সিদ্ধ চরিত্র—কয়েক হাজার বছরের একনিষ্ঠ চর্চায় পুরাণের চরিত্রগুলি তাঁদের নির্দিষ্ট স্বভাব নিয়ে পুরাণপ্রিয় মানুষদের মনে জাগরূক। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, দ্রৌপদী অথবা রাবণ, বিভীষণ, সাবিত্রী, সত্যবান, নল, দময়ন্তী, শ্রীবৎস, চিন্তা, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, হরিশ্চন্দ্র—প্রভৃতি অজস্র চরিত্রের ভিতর যে চরিত্রটিকেই স্মরণ করা যাক না কেন সংগে সংগে রামায়ণ, মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণের পৃষ্ঠায় বর্ণিত এই চরিত্রগুলি তাঁদের সকল দোষ-গুণ নিয়ে আমাদের দৃষ্টির সামনে ভেসে ওঠেন। আজন্ম-লালিত আমাদের সংস্কার এ চরিত্রগুলির সিদ্ধ বৈশিষ্ট্যগুলির কোন বিচ্যুতি দেখলে তাই আহত হয়। মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যে পৌরাণিক চরিত্রের রূপান্তরণ উনবিংশ শতাব্দীর যুগন্ধর কবির সার্থক চিন্তার প্রতিফলন হলেও পুরাণের বিচারে 'মেঘনাদবধ' সার্থক মহাকাব্য হয়ে উঠতে পারেনি। পৌরাণিক নাট্যকারের ক্ষেত্রে তাই অত্যন্ত সতর্কতার সংগে চরিত্র সৃষ্টি করতে হয়।

পুরাণ এবং নাটকের জগৎ দুটি বিপরীত কোটিতে অবস্থিত। পুরাণ দেব বা দেবানুগৃহীত চরিত্রের ভক্তিপ্রণত স্বভাবকে অঙ্কিত করেছে। দেবচরিত্রে কোন দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব নেই কেননা তাঁদের কাঙ্ক্ষিত সকল বিষয়ই তাঁদের হাতের মুঠোয় থাকে। দেব চরিত্রে কোন দুঃখ যদি দেখাও দেয় তবে তা একান্তই সাময়িক—স্বর্গীয় জীবনে শেষ পর্যন্ত আনন্দ এবং সুখের নির্মল ঝরণা-ধারা প্রবাহিত হয়। পুরাণের চরিত্র—সে যতই ভাল অথবা মন্দ হোক না কেন—একান্তই ভক্তিবাদী, বিশ্বাস-প্রবণ। পুরাণের কোন চরিত্রই শেষ পর্যন্ত দ্বন্দ্বমুখর নয়, জীবন-যন্ত্রণায় কাতর নয়।

অপরদিকে নাটক উপহার দেয় রিক্ত এবং অসম্পূর্ণ চরিত্রকে, যে চরিত্র জীবনে অপ্রাপ্তি, দৈন্য এবং গ্লানির সঙ্গে সর্বশক্তি দিয়ে সংগ্রাম করে কখনও জয়ী হয়, কখনও পরাজয়ের সমুদ্র-আবর্তে ঘুরে মরে। এই চিরকালের চাঁদ সদাগরের দল জীবনের অতলস্পর্শ গভীরতার দিকে আমাদের নিয়ে যায়। পুরাণের মায়াকাজল চোখে দিয়ে নয়, বাস্তব জগতের দুঃখ-কষ্টের অনুভবশক্তি দিয়েই নাট্যদর্শকরা চরিত্রের গভীরে দৃষ্টিপাত করেন। পুরাণের চরিত্রের সঙ্গে নাটকের চরিত্রে এখানেই প্রকৃত দূরত্ব। বাংলা সাহিত্যে অজস্র পৌরাণিক

নাটক লেখা হয়েছে সত্য অথচ সেই তুলনায় তার সাফল্যের ভাণ্ডারটি যে অত্যন্ত দীন তার পিছনে আছে এই পৌরাণিক চরিত্রে নাট্যগুণের অভাব।

বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ পৌরাণিক নাটক এক অর্থে নায়কহীন। নায়কের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে আলংকারিক বিশ্বনাথ বলেছেন—'আলম্বনং নায়কাদি স্তমালম্ব্যরসোদ্গমাৎ……তত্র নায়ক'। এই নায়কই সমগ্র নাটকীয় কাহিনীর সূত্রধার। তিনিই ঘটনার ফল ভোগ করেন, কাহিনীর কেন্দ্রে অবস্থান করে অন্যান্য চরিত্র এবং কাহিনীর নিয়ন্ত্রণ করেন। সার্থক নায়ক চরিত্রে সেজন্যই যেমন স্বাভাবিক বিকাশ কাম্য, তেমনই কাম্য তাঁর চরিত্রে ব্যক্তিত্ব এবং জীবন-সংরাগের যথাযথ স্ফুরণ। বাংলা ঐতিহাসিক এবং সামাজিক নাটকে নায়ক চরিত্রের বিকাশ ততটা সম্ভব হয়নি।

পুরাণ-নির্ভর কাহিনীতে নায়ক চরিত্রের বিকাশের অসুবিধা হল এই যে, পুরাণের নায়ক মর্ত্যবাসী মানুষের মত সমস্যায় আকুল হলেও শেষ পর্যন্ত সব সমস্যারই সমাপ্তি ঘটে। দেব চরিত্রই হোক অথবা দেবানুগৃহীত চরিত্রই হোন—শেষ পর্যন্ত তাঁরা কেউই যন্ত্রণায় নীল হয়ে থাকেননি। গিরিশচন্দ্রের 'সীতার বনবাস' 'রামের বনবাস', 'সীতাহরণ' ইত্যাদি কোন নাটকেই রাম চরিত্রের প্রকৃত দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ হৃদয়ের ছবি ফোটেনি। সীতার বনবাস নাটকে তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে রামচরিত্রে যে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টির সুযোগ ছিল তা নাট্যকার গ্রহণ করতে পারেননি। একই গর্ভাঙ্কে সীতার হীন চরিত্র সম্পর্কে লক্ষ্মণের প্রতি রামের উক্তি—

সরল তোমার প্রাণ
জান না নারীর রীতি ভাই রে লক্ষ্মণ।……
মোহিনী মায়ার ছলে
আছিনু আচ্ছন্ন ভাই'
তেঁই সাপিনীরে হৃদে দিনু স্থান,
নিজ শির ভাঙ্গিনু চরণ-ঘায়।……

সীতার চরিত্রহীনতার প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেতের অব্যবহিত পরেই রামের স্বগতোক্তি পৌরাণিক রাম চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিরেখ হলেও নাটকের নায়ক চরিত্রের পক্ষে তা শোভন নয়। চতুর্থ অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে সীতার পাতাল-প্রবেশ। অতঃপর রাম চরিত্রে যে দ্বন্দ্ব ও মর্মভেদী হাহাকার প্রকাশের সুযোগ

ছিল তা রামের মুর্চ্ছার ফলে অপূর্ণ রয়ে গেল। পুরাণের আক্ষরিক অনুসরণ করার ফলে গিরিশচন্দ্রের নায়ক চরিত্রের এভাবেই সংকোচন ঘটেছে।

গিরিশচন্দ্রের তিনটি অতি জনপ্রিয় নাটক 'জনা', 'পাণ্ডব গৌরব' এবং 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' এক কথায় নায়কহীন। যদি ধরে নেওয়াও যায় যে জনাকে নাট্যকার স্ত্রী-ট্রাজেডি শ্রেণীর নাটক করতে চেয়েছিলেন বলেই কোন পুরুষ চরিত্রকে প্রধান করেননি তা হলেও শেষ নাটক দুটি সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে যায়। পাণ্ডবগৌরব এবং পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস নাটকের নায়ক সম্ভবতঃ দেবতা কৃষ্ণ—কারণ তাঁর প্রতি ভক্তি, বিশ্বাস ইত্যাদিকে আশ্রয় করেই এই নাটক দুটির অন্যান্য চরিত্র চলাফেরা করেছে। অথচ নাট্যকার পাণ্ডবগৌরব নাটকে কৃষ্ণ চরিত্রটিকে অচঞ্চল রেখেছেন। অশ্বিনী-হরণ এবং যুদ্ধপ্রস্তুতির সংবাদই মাত্র শোনা গিয়েছে কিন্তু এ দুটির সংঘটন না হওয়ায় কোন চরিত্রেরই বিকাশ হলনা। অথচ পাণ্ডবগৌরবে ভীম চরিত্রে নায়কোচিত শক্তি দেখা দিয়েছিল নাটকের একাধিক স্থানে। সুভদ্রাকে তিনি বলেছেন—

সযতনে রাখ দেবী, আশ্রিতে আবাসে
ধন্য ধন্য পাণ্ডব-কুলের তুমি নারী,
ধন্য তুমি যাদব-ঝিয়ারী !
যদ্যপি বিরোধ কভু কৃষ্ণ সনে হয়,
সম্ভব এ নয়,
রক্ষিব শরণাগতে প্রতিজ্ঞা আমার। ······

(২/১)

যুধিষ্ঠিরের আদেশ তিনি অস্বীকার করতে পারেন না সত্য কিন্তু হৃদয়ে তাঁর প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব—

রাজ আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি।
অসম্ভব সম্ভব সকলি ভবে—
যাবে ধনঞ্জয় কৌরব সভায়,
দীনভাবে যাচিতে আশ্রয়—
ত্রিভুবনে এ কথা কি প্রত্যয় করিত কভু ?
ঘৃণা হয় মনে ;—
কিন্তু রাজ আজ্ঞা ঠেলিব কেমনে ?

ধর্মরাজ অনুগামী আমি ;—
নহে এতদিন নহে কি দারুণ অপমান
হত পাশ-ক্রীড়া স্থলে কৌরব সংহার। ··

(২/৫)

তুলনামূলক বিচারে পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস নাটকে ভীম চরিত্রে নায়কোচিত দ্বন্দ্ব অনেক বেশী। কীচকবধের সঙ্গে সঙ্গে যদি নাটকের যবনিকা নেমে আসত তা হলে ভীম চরিত্রে নায়কের মর্যাদা প্রকাশের সুযোগ থাকত। কিন্তু যেহেতু নাটকটির নাম পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস তাই নাট্যকাহিনী আরও বিস্তৃত হয়েছে এবং সেই অংশে অর্জুন প্রাধান্য পেয়েছেন। ভীম এবং অর্জুন উভয় চরিত্র সমগতিতে অগ্রসর হওয়ায় এই নাটকটিতেও যথার্থ নায়ক চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটেনি।

শ্রীকৃষ্ণের মত আর একটি চরিত্র অধিকাংশ বাংলা পৌরাণিক নাটকে উপস্থিত, তিনি অর্জুন। আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে, অর্জুন চরিত্রটি কোন নাটকেই নায়কের গুণাবলী লাভ করতে পারেনি। তারাচরণের ভদ্রার্জুন, হরচন্দ্রের কৌরব বিয়োগ, গিরিশচন্দ্রের পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, ক্ষীরোদপ্রসাদের নর-নারায়ণ, অপরেশচন্দ্রের কর্ণার্জুন প্রভৃতি আরও অনেক নাটকেই অর্জুনের একটি বিশেষ ভূমিকা থাকলেও সেই ভূমিকা নাটকের নায়কের সক্রিয় ভূমিকা নয়। এর প্রধান কারণ হল অর্জুনের অধিকাংশ কর্মের পিছনে যে সর্বশক্তিমান কৃষ্ণের অদৃশ্য হস্ত সক্রিয় সে কথা নাট্যকারগণ জানিয়ে দিতে ভোলেননি।

মহাভারতে এবং বাংলা পৌরাণিক নাটকে সর্বাপেক্ষা জীবন্ত, দ্বন্দ্বমুখর চরিত্র হলেন কর্ণ। অপরেশচন্দ্র এবং ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে কর্ণ চরিত্রের উপর নাট্যকারদের সহানুভূতি পেসারিত হওয়ায় কর্ণ নাটক দুটির নায়ক হতে পেরেছেন। অপরেশচন্দ্রের কর্ণ নাটকের সূচনা থেকে পরিণতি পর্যন্ত দৈব-নিপীড়নে ক্ষতবিক্ষত—পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করেও তিনি শেষ পর্যন্ত পরাজিত। কর্ণার্জুন নাটকে অপরেশচন্দ্র নিয়তিকেই প্রাধান্য দিলেও কর্ণ চরিত্রের মানবিক দিকটি তাঁর দৃষ্টি থেকে সরে যায়নি। নাট্যসাহিত্যের জনৈক সমালোচক মন্তব্য করেছেন—

কর্ণার্জুনের কর্ণ শক্তিমান, বীরপুরুষ বটে, তাঁহার কার্যের মধ্যে দুর্যোধনের প্রতি বন্ধু-প্রীতি ভিন্ন অন্য কোন মহৎ উদ্দেশ্য

> নাই।...অপরেশচন্দ্রের কর্ণার্জুনের কর্ণের মৃত্যুতে একটি নির্মম নিয়তি-নির্যাতিত মহামানবের শোচনীয় মৃত্যু হইল বলিয়া দর্শক চোখের জল ফেলিবার অবকাশ পায়না।[২]

এই মন্তব্যের একস্থানে 'মহামানব' শব্দটি ব্যবহারের সঙ্গত কারণ কখনই বুঝে ওঠা যায়না। আসলে ট্রাজেডির নায়কের উদাত্ততা ট্রাজেডি রসের পথে বাধা হতে পারেনা। মহাভারতের কর্ণ চরিত্রে যে ট্রাজেডির উপাদান কম নেই এ কথা মহাভারতের পৃষ্ঠা খুলে দেখিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয়না। মহাভারতের কর্ণ চরিত্রে মানবিকতার স্পর্শসঞ্চরণের ক্ষেত্রে ক্ষীরোদপ্রসাদের কর্ণ চরিত্রের সাফল্য নির্দেশ করতে গিয়ে ঐ সমালোচক অপরেশচন্দ্রের কর্ণ চরিত্রকে 'অন্যায়ের সমর্থনকারী ..নীচচরিত্র ব্যক্তি'...[৩] আখ্যায় ভূষিত করে সমালোচকের নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালন থেকে দূরে সরে গিয়েছেন। এ কথা সত্য যে, ক্ষীরোদপ্রসাদের কর্ণ চরিত্রে নাট্যকার অনেকখানি দ্বন্দ্ব প্রয়োগ করতে পেরেছেন কিন্তু একথাও সত্য যে, ক্ষীরোদপ্রসাদের উপর গিরিশচন্দ্রের যথেষ্ট প্রভাব থাকায় কর্ণ চরিত্রে কৃষ্ণভক্তির যে প্রবাহ রয়েছে তাই নর-নারায়ণ নাটককে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর ট্রাজেডি-গৌরব থেকে বঞ্চিত করেছে। তবে এ কথা অনায়াসে বলা যায় যে, উপরোক্ত নাট্যকারদের হাতেই আমরা পৌরাণিক নাটকের নায়ক চরিত্রের আংশিক সম্মান পেয়েছি।

ভারতীয় পুরাণে রোমান্সের প্রস্রবণ বিভিন্ন কাহিনী ও চরিত্রের আশ্রয়ে কখনও কখনও যথেষ্ট রঙীন। বাঙালী যে চিররোমান্টিক তার পরিচয় মধ্যযুগের কাব্যসাহিত্য এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর কথাসাহিত্যে যথেষ্ট পাওয়া যায়। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর পৌরাণিক নাটকে একশ্রেণীর রোমান্টিক চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে যারা নাটকের দায়িত্ব সর্বত্র পালন না করেও দর্শকদের মন আকর্ষণ করতে পারত। এই রোমান্টিক চরিত্রগুলি মানবজীবনের কামনা-বাসনা, চাওয়া-পাওয়া, আশা-নিরাশায় কম্পিত জীবনের প্রতি এই চরিত্রগুলির ভালবাসা নিবিড়। অথচ প্রায়শঃই দেখা যায় নাট্যকারদের সহানুভূতির অভাবে এই চরিত্রগুলির পুরোপুরি বিকাশ হয়নি। হয়ত পৌরাণিক নাটকে ভক্তি, বিশ্বাস এবং সংযম তাঁদের চিন্তাধারায় বাধা সৃষ্টি করেছিল।

২। বৈদ্যনাথ শীল : বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা, কলিকাতা, ১৩৭৭, পৃঃ ৪৮৫

৩। তদেব, পৃঃ ৪৮৬

মধুসূদনের বিশিষ্ট নায়িকা শর্মিষ্ঠা। নাট্যকার তাঁর সমস্ত সহানুভূতি উজাড় করে এই চরিত্রটি এঁকেছেন। দুঃখের তপস্যায় শর্মিষ্ঠা সার্থক তপতী। রাজা যযাতির প্রতি শর্মিষ্ঠা যে নীরব প্রেমের অর্ঘ্য সাজিয়েছিলেন তার পূর্ণতা ঘটল শেষ পর্যন্ত —

শর্মিষ্ঠা ।। (স্বগত) হা হৃদয়, তোর মনোরথ এতদিনের পর কি সফল হবে ? (প্রকাশে) হে নরনাথ ! আপনি এ দাসীকে ক্ষমা করুন ! আমার প্রতি এ বাক্য বিড়ম্বনা মাত্র।

রাজা ।। প্রিয়ে, আমি সূর্যদেব ও দিগমণ্ডলকে সাক্ষী করে এই তোমার পাণিগ্রহণ করলেম, (হস্তধারণ) তুমি অদ্যাবধি আমার রাজ-মহিষী পদে অভিষিক্তা হলে।

(৩/৩)

এরপর একে একে গোপন বিবাহ, তিন পুত্রের জন্ম এবং শেষ পর্যন্ত শুক্রাচার্যের অভিশাপে যযাতির জরা। শর্মিষ্ঠা সব সহ্য করেছেন—পরিশেষে দুঃখের সাধনায় জয়ী হয়েছেন। দেবযানী প্রধানা মহিষী হলেও নাট্যকার এ জন্যই নাটকের নামকরণ করেছেন 'শর্মিষ্ঠা।' শর্মিষ্ঠার মধ্যে চিরন্তনী ভারতীয় নারীর আদর্শ যেমন প্রতিফলিত হয়েছে তেমনই মধুসূদনের কল্পনার সিংহভাগও চরিত্রটি আত্মসাৎ করে নিয়েছে।[৪]

বাংলা নাট্যসাহিত্যের দুটি উল্লেখযোগ্য রোমান্টিক চরিত্র হল ভীষ্ম ও অম্বা। দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদ—উভয় নাট্যকার মহাভারতের জ্ঞান-তাপস, জিতেন্দ্রিয় ভীষ্মকে কেন রূপতাপস করলেন এবং মানবজীবনের কামনা-বাসনার পরিচ্ছদ পরিয়ে নাটকে উপস্থিত করলেন এ প্রশ্ন মনে জাগে। বিংশ শতাব্দীর মানবতাবাদী চিন্তাধারা, কাম-জীবনের উপর ফ্রয়েডীয়

৪. 'শর্মিষ্ঠা চরিত্রটিতে এক প্রশান্ত কল্যাণময়ীর রূপ আত্মপ্রকাশ করেছে।… এ জাতীয় চরিত্র কল্পনা মধুসূদনের নিজস্ব। সংস্কৃত নাটকের কোমলপ্রাণ মুগ্ধা নায়িকার আদর্শটি এক্ষেত্রে অনুসৃত হলেও, চিত্তের সর্ব সংক্ষোভ সংহরণ করে প্রশান্তি অবলম্বন এবং পরম শত্রুসম্পর্কেও কল্যাণচিন্তা কবি স্বয়ং কল্পনা করে নিয়েছেন।…এই সর্বংসহা ভাবটি ভারতীয় নারীত্বের আদর্শরূপে বহু প্রাচীন কাল থেকেই পূজিত হয়ে আসছে।'
—ক্ষেত্র গুপ্ত : নাট্যকার মধুসূদন, কলিকাতা, ১৩৬৯, পৃঃ ৮১

মতাদর্শের প্রসার ইত্যাদি নাট্যকারদ্বয়ের চিন্তায় ছিল কিনা জানিনা তবে জানি ভীষ্ম চরিত্রের নব-মূল্যায়ণ তাঁরা করেছিলেন। উভয় নাট্যকারের নাটকে অঙ্কিত ভীষ্ম যেমন মহাভারতের পূর্ণাঙ্গ ভীষ্ম নন, তেমনি অম্বাও মহাভারতে বর্ণিত অম্বা নন।

তবে রোমান্টিক চরিত্রের বিচারে এই দু'টি চরিত্র অনবদ্য।

অবশ্য পৌরাণিক নাটকে এই শ্রেণীর চরিত্র যে পুরাণ-রস ক্ষুণ্ণ করে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অম্বা এবং সত্যবতী চরিত্রে মানবী ধর্ম আরোপ করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল ভীষ্ম এবং ব্যাসজননী চরিত্রে কলঙ্ক ছুঁইয়েছেন—তেমনই ক্ষীরোদপ্রসাদের অম্বা যথার্থ প্রেমের মাধুর্য নিয়ে সৌরভ ছড়াতে পারেননি। দুটি নাটকেই অম্বা প্রেমের ক্ষেত্রে দ্বিচারিণী—প্রকৃত প্রেমের অভাবে এই চরিত্রের সংলাপে যতই রোমান্সের সুর মর্মভেদী হোক না কেন, চরিত্রটি একনিষ্ঠ প্রেমিকা হিসাবে হাজির হতে পারেনি।

অবিমিশ্র ভক্তিবাদ পৌরাণিক নাট্যচরিত্রকে যে বারংবার বিকশিত হওয়ার পথে বাধা দিয়েছে বাংলা সাহিত্যে তার উদাহরণ প্রচুর। রাজকৃষ্ণ রায়ের এবং গিরিশচন্দ্রের প্রহ্লাদ, গিরিশচন্দ্রের নীলধ্বজ, দ্বিজেন্দ্রলালের ভীষ্ম এবং ক্ষীরোদপ্রসাদের পদ্মাবতীর ন্যায় আরও অনেক চরিত্র কৃষ্ণভক্তির রসে আর্দ্র হয়ে নাট্যচরিত্রের আদর্শ থেকে কিছুটা বিচ্যুত হয়েছেন। রাজকৃষ্ণের প্রহ্লাদ জন্ম থেকেই কৃষ্ণভক্ত বলে এ চরিত্রে কোন দ্বন্দ্ব নেই। গিরিশচন্দ্রও এই ত্রুটি থেকে মুক্ত নন। একান্ত ভক্ত চরিত্র যে কোন নাটকেরই মুখ্য চরিত্র হোক না কেন নাটকীয় চরিত্রের সজীবতা লাভ করতে পারেনা।

গিরিশচন্দ্রের জনা নাটকের নীলধ্বজ নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একান্ত কৃষ্ণভক্ত চরিত্র। নাটকের সূচনাতেই তিনি অগ্নির নিকট প্রার্থনা করেছেন—

কল্পতরু যদি তুমি দেব বৈশ্বানর,
দেহ বর,
যেন নটবর নবঘন-কায়
বাঁশরি—বয়ান ত্রিভঙ্গিম ঠাম
নর-রূপী নারায়ণে পাই-দরশন।

জনা এবং প্রবীর যাই চাননা কেন নীলধ্বজ স্পষ্ট বলেন—'জেনে শুনে করিব না নারায়ণে অরি।' তাঁর ধ্রুব লক্ষ্য হল—'কৃষ্ণের রাজীব পায় লইব আশ্রয়'। প্রবীরের যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু হল, জনা পুত্রশোকে উন্মাদিনী; কিন্তু নীলধ্বজের পিতৃ-সত্তা বা পতি-সত্তা বিচলিত হল না, তাঁর ভক্ত-সত্তা কৃষ্ণের আগমন সংবাদে উৎফুল্ল হয়ে উঠল—

যাও, মন্ত্রিবর
সত্বর প্রদান আজ্ঞা সাজাতে নগর।···
প্রজাগণে মহোৎসব করুক সকলে,
ঘরে ঘরে হয় যেন হরি-গুণগান।

(৪/৩)

অপার কৃষ্ণভক্তি যেমন গিরিশচন্দ্রের নীলধ্বজ চরিত্রটিকে ভাবের বাহন মাত্র করেছে এবং চরিত্রটিকে সজীব হয়ে উঠতে বাধা দিয়েছে তেমনই ক্ষীরোদ-প্রসাদের 'নর-নারায়ণ' নাটকের পদ্মাবতী চরিত্র সম্পর্কেও এই একই কথা বলা যায়। পদ্মাবতী স্বামীর ভবিষ্যৎ চিন্তা করে উৎকন্ঠিতা হন সত্য কিন্তু কর্ণের বিপদের মূল কারণ যে কৃষ্ণ! তাঁর প্রতি পদ্মাবতীর অসীম ভক্তি। এই দুটি বিরুদ্ধশক্তির আকর্ষণের ফলে পদ্মাবতী চরিত্রে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ফুটে ওঠার সুযোগ ছিল নাট্যকার তা গ্রহণ না করে কর্ণের মৃত্যুর পর পদ্মাবতীকে প্রায় কৃষ্ণযোগিনীতে পরিণত করেছেন। শত্রুসৈন্যের আনন্দ-উল্লাস শুনে যেখানে তাঁর ব্যথায় স্তম্ভিতা হওয়ার কথা সেখানে তিনি পুত্র বৃষকেতুকে বলেন—

ভয় কি—ভয় কি—পাণ্ডব-উল্লাস রঙ্গে
উল্লাসে উঠুক নেচে হৃদয় তোমার।
ওরে বৎস, পিতা তব ত্রি-জগত মাঝে
যেখানে যা ছিল তার, সমস্ত করিয়া
গেছে দান। অবশিষ্ট একমাত্র তুমি।
আমি তোরে আগে হ'তে করিয়াছি কৃষ্ণে
সমর্পণ। উঠুক উঠুক ধ্বনি। কার
জয়—কার পরাজয়? আয় দেখে আসি—
মৃত্যু যেথা জীবনে করিছে আলিঙ্গন।

(৪/২)

বাংলা পৌরাণিক নাটকে 'জনা' এবং 'নর-নারায়ণ' সর্বাঙ্গসুন্দর ট্রাজেডি হতে পারত যদি না নীলধ্বজ এবং পদ্মাবতী চরিত্রে সংশয়হীন কৃষ্ণভক্তি দুর্বার হত। এই অবিমিশ্র ভক্তিপ্রকাশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাট্যকারদের ইচ্ছা-নির্ভর। দ্বিজেন্দ্রলালের 'ভীষ্ম' নাটকের সমাপ্তি-দৃশ্যে সকল চরিত্রের প্রস্থানের পর অকস্মাৎ ভীষ্মের মুখ থেকে কৃষ্ণভক্তি ঝরে পড়েছে :

ভীষ্ম। আজ তুমি দেখা দাও হে করুণাময় !
জগতের গুরু কৃষ্ণ! পাপীর আশ্রয়।
পাপী আমি! নরাধম আমি। দেখা দাও।······
দেখা দাও, দেখা দাও, দয়াময় হরি।

(শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব) —

কৃষ্ণ। আমি আছি দেবব্রত ; কোন ভয় নাই।

অপরদিকে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'ভীষ্ম' নাটকের পরিণতি-দৃশ্যে ভীষ্মের উক্তির সুর সম্পূর্ণ আলাদা--কৃষ্ণের উক্তিও দ্বিজেন্দ্রলালের কৃষ্ণের উক্তির বিপরীত—

ভীষ্ম। পদতলে তুমি আবার কে হে? কোমল কর-পল্লবে আমার চরণ স্পর্শ করে সর্বশরীরে শীতলতা ঢেলে দিলে, সকল জ্বালা জুড়িয়ে দিলে, তুমি কে হে?

কৃষ্ণ। পিতামহ। সকলের সঙ্গে দেখা করলেন ; আমি কি অপরাধ করেছি যে, আমাকে দেখতে চাইলেন না?

প্রকৃতপক্ষে পৌরাণিক নাটকে চরিত্রের গভীরে ভক্তিবাদের প্রশ্রয় নাট্যকাররাই দিয়ে থাকেন। মূল কথা হল শ্রদ্ধা ও ভক্তির প্রকাশ – সে ভক্তি কৃষ্ণের প্রতি ভীষ্মেরই হোক অথবা সে শ্রদ্ধা ভীষ্মের প্রতি কৃষ্ণেরই হোক— সেটি বড় কথা নয়। এই ভক্তিরসের গতিটি ঈষৎ সংযত করলে পৌরাণিক নাট্যচরিত্রের অনেকাংশে বিশ্বাস্য ও সজীব হয়ে ওঠার সুযোগ থাকে।

শকার, বিট, চেট প্রভৃতি চরিত্রের মত বিদূষকও সংস্কৃত নাটকের একটি হাস্যোজ্জ্বল চরিত্র। বিদূষক সংস্কৃত নাটকে সর্বত্র ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব, কিন্তু অন্যান্য হাস্যরসাত্মক চরিত্র নীচকুলোদ্ভব। বিদূষক আরামপ্রিয়, লোভী, বামন এবং নায়কের প্রিয় বয়স্য। ভরতমুনি তাঁর 'নাট্যশাস্ত্রে' এবং বিশ্বনাথ তাঁর 'সাহিত্যদর্পণে' বিদূষক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এঁকেছেন। সাধারণতঃ বিদূষকের ভূমিকা হাস্যের হলেও সে কখনও কখনও বিচক্ষণতা এবং কর্তব্য-পরায়ণতায় নাটকে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান করে নেয়। এই বিদূষকই ভাসের

উদয়ন-কাহিনীমূলক নাটকে এবং শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী'তে বসন্তক রূপে, অশ্বঘোষের 'শারিপুত্তপ্রকরণ' নাটকে কৌমুদগন্ধ রূপে, কালিদাসের 'শকুন্তলা'য় মাধব্য এবং 'বিক্রমোর্বশী'তে মানবক রূপে ও শ্রীহর্ষের 'নাগানন্দে' আত্রেয় রূপে পরিচিত। বাংলা পৌরাণিক নাটকে বিদূষক চরিত্রের একটি বিশেষ পরিচয় রয়েছে। তবে যে কারণে ভবভূতি বিদূষককে কেবলমাত্র হাস্যাস্পদ চরিত্র রূপে অঙ্কনে অস্বীকৃত হয়েছেন এবং যে কারণে শূদ্রক 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে বিদূষক চরিত্রে বিশিষ্ট গুণ আরোপ করেছেন সেই কারণটি সম্পর্কে বাংলা পৌরাণিক নাট্যকারগণ প্রায়শঃ সচেতন থাকায় বাংলা সাহিত্যে বিদূষক চরিত্রটি একটি স্বতন্ত্র মূল্য অর্জন করেছে।

মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে বিদূষকের দ্বৈত ভূমিকা। নটীর প্রতি হাস্যরসের সংলাপ ছড়িয়ে সে বলে—

বিদূষক। হে সুন্দরি, তুমি অয়স্কান্ত মণি, আমি লৌহ। তুমি যেখানে যাবে, আমিও সেইখানে আছি। (হস্তধারণ) আহা, তোমার অধরে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ অমৃতভাণ্ড গোপন করে রেখেছেন। হে মনোমোহিনী, তুমি একটি চুম্ব দিয়ে আমাকে অমর কর। (২ / ২)

আবার সেই বিদূষকই প্রয়োজনে রাজাকে সুপরামর্শ দেয় :

বিদূষক। (ত্রস্ত হইয়া) মহারাজ। একি সর্বনাশের কথা ? যদ্যপি রাজ্ঞী ক্রোধবশে দৈত্যদেশেই প্রবেশ করেন, তবেই ত' সকল গেল। আপনি এ বিষয়ে কি উপায় করেছেন ?

রাজা। আর কি করব ? আমি জ্ঞানশূন্য ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি ভাই।

বিদূষক। কি সর্বনাশ ! মহারাজ, আর কি বিলম্ব করা উচিৎ ? চলুন, চলুন, অতি ত্বরায় পবন-বেগশালী অশ্বারূঢ়গণকে মহিষীর অন্বেষণে পাঠান যাক্‌গে। কি সর্বনাশ ! কি সর্বনাশ ! (৪ / ২)

মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা'র মত গিরিশচন্দ্রের 'জনা' নাটকেও বিদূষক চরিত্রটি দীর্ঘস্থান অধিকার করে আছে। 'জনা' নাটকের পূর্বেই 'নলদময়ন্তী' নাটকে গিরিশচন্দ্র বিদূষকের একটি বিশিষ্ট পরিচয় এঁকেছিলেন—সে কেবল লোভী নয়, সে প্রকৃত রাজভক্ত, নলের সুখ-দুঃখের চিরসাথী। এই বিদূষককে আমরা

মহাভারতে পাইনি, সংস্কৃত নাটকের বিদূষক অথবা ইংরেজী নাটকের ফলষ্টাফ ইত্যাদি চরিত্রের সঙ্গে সংযোগ না খুঁজে যদি দেশীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তা'হলে অনায়াসেই গিরিশচন্দ্রের বিদূষক চরিত্রের উৎস খুঁজে পাওয়া যায়। রামকৃষ্ণদেবের নানা কথামৃতও বিদূষক চরিত্রের মুখ থেকে উচ্চারিত। পরমহংস-জায়া সারদামণি গিরিশচন্দ্র-অভিনীত বিদূষক চরিত্র দেখে স্বামী সারদানন্দকে বলেছিলেন :

> যা দেখছি, তাতো ওরই চরিত্র। আমি ত' জানি ওর এরকমই বিশ্বাস ঠাকুরকে ডাকলেই ত্রাণ পাওয়া যায়। আবার বকেও। ৫

জনা নাটকের শুরুতে বিদূষক মুখে কৃষ্ণবিরোধী কথা বললেও তার আন্তরিক কৃষ্ণভক্তি অপ্রকাশিত থাকে নি—

> আরে দেবতা, ঐ যে তোমার খেলায় পড়ে বিশ বার হরি হরি বল্লুম, একবার নাম কল্লে ত'রে যায়। আমার উপায় হয়েছে, আমায় ভাবতে হবে না।
>
> (১/১)

নাটকের পরিণতিতে শ্রীকৃষ্ণ নিজে এসে বিদূষককে তার বাঞ্ছিত রূপ দেখিয়েছেন :

শ্রীকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণ, দেখ।

(কুঞ্জকাননে রাধাকৃষ্ণ মূর্তির আবির্ভাব)

বিদূষক। ওরে বামনি, দেখ্, দেখ্, দেখ্। এখন গোলকেই যাই আর বৈকুণ্ঠেই যাই, আর দুঃখ নাই।

উভয়ে। জয় রাধে, জয় রাধারঞ্জন।

এই বিদূষক চরিত্রই পাণ্ডবগৌরব নাটকে কঞ্চুকী চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। তবে সংস্কৃত নাটকে রাজ-প্রতিহারী কঞ্চুকী চরিত্রের প্রভাব তীব্র হওয়ায় বিদূষক চরিত্রের ভক্তিপ্রাণতা এই চরিত্রে সর্বত্র রক্ষিত নয়।

পৌরাণিক নাটকে এক শ্রেণীর চরিত্র দেখা যায় যাদের ভূমিকা যাত্রার বিবেক, মোহান্ত ইত্যাদি চরিত্রের ন্যায়। যাত্রার ঐ জাতীয় চরিত্রের কাজ ছিল কাহিনী এবং ঘটনার ভিতরকার জটিল গ্রন্থিকে উন্মোচিত করা, নাট্য-চরিত্রের সুপ্ত বাসনাগুলিকে ব্যাখ্যা করা। এই চরিত্রগুলির প্রধান আশ্রয়

৫. হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত : ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র, পৃঃ ৭৮

হল গান, কেননা গানের দ্বারাই চিত্তের সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব। মনোমোহন বসুর শাস্তি পাগলা, গিরিশচন্দ্রের পাগলিনী (বিল্বমঙ্গল ঠাকুর) ইত্যাদি একই গোত্রের চরিত্র। এ প্রসঙ্গে আর একটি চরিত্রের কথা মনে আসে, তিনি নারদ। পৌরাণিক নাটকে জটিলতা সৃষ্টি এবং সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাঁর দান উল্লেখযোগ্য। নারদের ধূর্ত অথচ কল্যাণময় স্বরূপ অনেক নাটকে আছে। বিদূষকের ন্যায় নারদেরও "Sense of humour" যথেষ্ট।

ট্রাজিক নাটকের ক্ষেত্রে একধরণের চরিত্রের উপস্থিতি প্রায়ই দেখা যায়—এই খল চরিত্রগুলি নাট্যকাহিনীকে যেমন জটিল করে তেমনই নায়কের জীবনে এক অপরিসীম দুঃখভোগের কারণ হয়। পৌরাণিক নাটকে এই খল চরিত্রের উপস্থিতি মাঝে মাঝে দেখা গেলেও শেষ পর্যন্ত নাটকের ভাব-মোক্ষণে (Cathersis) তাদের কোন সক্রিয় ভূমিকা থাকে না বলেই পৌরাণিক নাটকে সার্থক ভিলেন চরিত্রের পুরোপুরি পরিচয় পাওয়া যায় না। আর একটি কারণ হল পুরাণের দেব চরিত্রগুলি সাধারণতঃ এই চরিত্রের দায়িত্ব পালন করায় "Tragic flow" তেমন তীব্র হতে পারে না। কলি, শনি, শকুনি এমনকি দেবরাজ ইন্দ্রও কোন কোন নাটকে ভিলেনের দায়িত্ব পালন করেছেন।

মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' নাটকে কলি স্বয়ং তাঁর নিষ্ঠুর চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন :

কলি। (স্বগতঃ) আমি কলি,—
এ বিপুল বিশ্বে কে না কাঁপে
শুনিয়া আমার নাম? সতত কুপথে
গতি মোর। ....
ধর্মকর্ম সকলি সমান মোর কাছে।
পরের যাহাতে ঘটে বিপরীত তাতে
হিত মোর ; পরদুঃখে সদা আমি সুখী।......

(৪/১)

এ নাটকে আরও শক্তিসম্পন্ন ভিলেন চরিত্র শচী। শচী ঈর্ষাকাতরা, ক্রুর-স্বভাবা, প্রতিহিংসা-পরায়ণা। 'তাঁহার প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি নিরপরাধা পদ্মাবতীকে চরম দুঃখের সম্মুখীন করিতেও পশ্চাৎপদ নহেন—নাটকের খল চরিত্ররূপে শচীর চরিত্রটি সুপরিস্ফুট হইয়াছে।'৬

গিরিশচন্দ্রের 'নল-দময়ন্তী' নাটকের কলি চরিত্র নিঃসন্দেহে ভিলেন। সংস্কৃত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের অহংকার চরিত্রের মত সেও যেন বিরুদ্ধ-

৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬০, পৃঃ ১৭২

নিয়তি। ইন্দ্রনীলের জীবন নিয়ে যেমন পদ্মাবতীর কলি জুয়া খেলেছেন তেমনই নল-দময়ন্তীর কলি নলকে দুঃখে ভাসিয়ে অট্টহাস্যে ফেটে পড়েছেন, বলেছেন—

রাজ্য ধন যাবে—বিচ্ছেদ ঘটিবে—
তবু সঙ্গ না ছাড়িব।
আরে আরে যৌবন-উন্মত্তা বালা—
যার তরে দেবে কর হেলা—
পায়ে ঠেলে চলে যাবে তোরে।

শ্রীবৎস-চিন্তার পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে লেখা নাটকগুলিতে উপস্থিত শনি চরিত্র কলির সগোত্র। ভিন্নধর্মী হলেও ভারত-কথাশ্রয়ী পৌরাণিক নাটকগুলিতে শকুনি খল চরিত্ররূপেই উপস্থিত। শকুনির অন্তর এবং বাইরের দ্বৈত সত্তাই শেষ পর্যন্ত কৌরবদের পরাজয়কে নিশ্চিত করেছে। গিরিশচন্দ্র তাঁর 'পাণ্ডবগৌরব' নাটকে শকুনি চরিত্র ছুঁয়ে গিয়েছেন মাত্র, তাঁর চরিত্রের নিষ্ঠুর দিকটিকে তেমনভাবে উন্মোচিত করেননি। অপরেশচন্দ্রের 'কর্ণার্জুন' ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নরনারায়ণ' এবং মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'চক্রব্যূহ' নাটকে শকুনি জীবন্ত ভিলেন চরিত্র। শকুনির তীব্র অন্তর্দহনের পিছনে রয়েছে তাঁর পিতা এবং ঊনশত ভ্রাতার কৌরব-কারাগারে মৃত্যুর মর্মান্তিক কাহিনী। মুখে শকুনি যাই বলুন না কেন তাঁর প্রতিজ্ঞা হল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবদের চিতাশয্যা-নির্মাণ। অপরেশচন্দ্রের শকুনির স্বগতোক্তি—

কহ পিতা, কহ,
কত দিনে এই বজ্রে
কুরু-চূড়া পড়িবে খসিয়া?
কত দিনে ঋণ-মুক্ত হব আমি?
কত দিনে শত—বিনিময়ে শত,
শত—ভাই দুর্যোধন লুটাবে ধরায়?
কত দিনে শত—ক্ষুধিতের অন্ন-ঋণ
শোধিবে শকুনি একা!

অপরেশচন্দ্রের ক্রুর শকুনি চরিত্রের একটি ক্রমবিবর্তন আছে, নাট্যকাহিনীর পক্ষে তাঁর ভূমিকা অপরিহার্য। 'নর-নারায়ণ' নাটকে শকুনি চরিত্রে হাস্যরসের তরল প্রবাহ সঞ্চারিত হওয়ায় বেদনাবোধের সঙ্গে প্রতিশোধস্পৃহার সঠিক মিলন সম্ভব হয়নি।

পৌরাণিক নাটকে চরিত্র-সম্পর্কিত আলোচনায় স্ত্রী-নায়িকা সম্পর্কে আলোচনা না করলে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। পুরুষের জীবনেই কেবলমাত্র ভাঙাগড়ার খেলা চলে না, নারীর জীবনেও ব্যথা-বেদনার অনির্বাণ দাহ থাকে। গ্রীক ট্রাজেডির ভিতর দৃষ্টি মেললে দেখা যায় ইলেকট্রা, এণ্টিগোন, হেকুবা, মিডিয়া প্রভৃতি চরিত্র নাটকে পুরুষ চরিত্রের শক্তিহরণ করে 'শী-ট্রাজেডি'র (She-Tragedy) নায়িকার আসন অধিকার করেছে। ভারতীয় পুরাণে বীরাঙ্গনা অথবা কোমল-মধুর নায়িকার অভাব নেই। কোন নারী সমাজের অন্যায় কঠিন বন্ধন থেকে বার হয়ে এসেছেন, কোন নারী প্রেমের জন্য পরকীয়া হয়েছেন আবার কেউবা স্বামী-প্রেমে রজনীগন্ধার মত শুভ্র, ঊর্ধ্বমুখী। তবু বাংলা পৌরাণিক নাটকে শর্মিষ্ঠা, সতী, সাবিত্রী, অহল্যা, চিন্তা, দ্রৌপদী, গান্ধারী, দময়ন্তী ইত্যাদি কোন চরিত্রেই 'শী-ট্রাজেডি'র নায়িকার গৌরব প্রতিবিম্বিত হতে দেখি না। কেবলমাত্র জনা এর ব্যতিক্রম।

অথচ পুরাণে সতী, দ্রৌপদী অথবা গান্ধারী—এঁদের সকলের চরিত্রেই ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা ছিল। সতী তাঁর পিতা দক্ষের অপমান সহ্য করেন নি, দ্রৌপদী পঞ্চস্বামীর শক্তিহীনতায় তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন, গান্ধারী পুত্রদের অন্যায় যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন, কুন্তী কুমারী জীবনের লজ্জাকে নিজ পুত্রের সামনে বিবৃত করেছেন। অথচ মনোমোহন, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমুখ নাট্যকারগণ এই চরিত্রগুলির মানস-প্রবণতাকে কোন কোন স্থানে বিদ্যুৎ-ঝলসিত করলেও তাঁদের পুরুষ-সুলভ কাঠিন্যকে একটি বিবর্তনের বক্ররেখায় বিস্তৃত করতে পারেন নি। ট্রাজেডি সৃষ্টির প্রতি অনীহাই তাঁদের স্ত্রী চরিত্রগুলির বিকাশের পথে বড় বাধা।

পুরাণের নারী-সুলভ কুন্দপ্রতিম চরিত্র শর্মিষ্ঠা, সাবিত্রী, চিন্তা, দময়ন্তী, সীতা, পদ্মাবতী, উত্তরা, সুভদ্রা পৌরাণিক নাটকে উপস্থিত। এই চরিত্রগুলির নারীসুলভ কোমলতাই তাঁদের সার্থক ট্রাজিক নায়িকা হওয়ার পথে বাধা-স্বরূপ, এমন কথা বিশ্বাস করার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি নেই। "Women of tender structure" নিয়ে রাসিনের (Racine) মত অনেক নাট্যকারই ভাল দ্বন্দ্বমুখরা নায়িকা এঁকেছেন। এই সূত্রে প্রখ্যাত নাট্যবিদ্ নিকল বলেছেন:

> Racine explored a fresh realm by emphasizing his heroines. Nor was it the heroines of hard, almost masculine quality that most attracted his

attention.........the heroines he displayed were women of tender structure......Racine's spirit is essentially feminine.[১]

প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় বিশ্বাসই বাংলা পৌরাণিক নাটকে বীরাঙ্গনা নায়িকা সৃষ্টির মূলে বাধা দিয়েছে। মহিলা নাট্যকারের অভাব না থাকলে হয়ত বাংলা সাহিত্যে ভাল 'শী-ট্র্যাজেডি' পাওয়া যেত।

১. Nicoll, Alardyce ; World Drama, page 309

একাদশ পরিচ্ছেদ

বাংলা পৌরাণিক নাটকের ভবিষ্যৎ ॥

ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং মানবিক আবেদন-বিজড়িত পুরাণ-কাহিনী-গুলির চিরত্ব নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। প্রতিটি দেশের পুরাণ সেই দেশের জনসাধারণের রক্তকণিকায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একটি নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ সঞ্চারিত করে রাখে। ভারতবর্ষের দৈনন্দিন জীবনে ভারতীয় পুরাণগুলির প্রভাব প্রবল। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় পুরাণসমূহের অনুবাদ হয়েছে, ভারতীয় গৃহজীবনে পুরাণের শিক্ষা গৃহীত হয়েছে—পুরাণের প্রতি বিশ্বাস ভারতীয় জনজীবনে, এই আধুনিক সমাজ জীবনেও অপরিসীম। রামায়ণকার তাঁর গ্রন্থের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করে গিয়েছিলেন—

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে
তবদ্রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি ॥[1]

এই উক্তি অধিকাংশ পুরাণ সম্পর্কেই প্রযোজ্য। পুরাণের এই চিরত্বের কারণ নির্দেশ করে ভিণ্টারনিৎস লিখেছেন—"They afford us far greater insight into all aspects and phases of Hinduism—its mythology, its idol-worship, its theism and pantheism, its love of God, its philosophy and its superstitions, its festivals and ceremonies and its ethics than any other works."

পুরাণ যে কারণগুলির উপর নির্ভর করে জনচিত্তে স্থায়ী আসন পায় পৌরাণিক নাটকগুলিতে সেই বিষয়গুলি উপস্থিত থাকলেও তা চিরকালের সাহিত্য হতে পারে না। এর প্রথম কারণ হল পৌরাণিক নাটক এবং পুরাণ স্বতন্ত্র সৃষ্টি। পুরাণ-নির্ভর নাট্যকর্ম হলেও পৌরাণিক নাটক দৃশ্য-শিল্প; অন্যদিকে পুরাণ শ্রব্য অথবা পাঠ্য-রচনা। পৌরাণিক নাট্যকারকে প্রথমতঃ লক্ষ্য রাখতে হয় দর্শকের আবেগের উপর। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র 'সাহিত্য দর্পণ'-এর মতে 'দৃশ্য, তত্রাভিনেয়ম্'। অর্থাৎ দৃশ্যকাব্য বা নাটকের সার্থকতা তার অভিনয়ে। নাট্যকারকেও তাই এই অভিনয়ের সকল উপাদান এবং বিষয়ের উপর দৃষ্টি দিতে হয়। 'নাট্যকার যখন নাটক রচনা করতে বসেন তখন তাঁকে

১. বালকাণ্ড—২। ৩৬-৩৭

চিন্তা করে নিতে হয়, তিনি যে সব দর্শকের জন্য নাটক লিখছেন তাঁদের রুচি ও রসবোধ কিরূপ এবং যে রঙ্গমঞ্চের জন্য নাটক লিখতে হবে তাতে নাট্যপ্রয়োগ ও অভিনয়-কৌশলের সুযোগই বা কিরূপ ? সেজন্য যুগে যুগে দর্শকদের রুচি ও মানস-প্রকৃতি অনুযায়ী নাটকের ভাব ও আকৃতির পরিবর্তন হয়েছে এবং রঙ্গমঞ্চের রূপ ও রীতি অনুযায়ী নাটকের রূপ ও রীতিও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।'[২] সামাজিক নাট্যকার রামনারায়ণ, গিরিশচন্দ্র এবং তুলসী লাহিড়ীর নাটকের কাহিনী উপস্থাপন এবং রসের মধ্যে যে পার্থক্য তা অত্যন্ত স্বাভাবিক, কেননা এই ত্রয়ী নাট্যকার তিনটি স্বতন্ত্র যুগের মানুষ। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের পৌরাণিক নাটকের যেমন নৈকট্য খোঁজা ঠিক নয়, তেমনি দ্বিজেন্দ্রলালের পৌরাণিক নাটকের সঙ্গে মন্মথ রায়ের পৌরাণিক নাটকের মিল খোঁজাও অসঙ্গত। কেননা এঁদের নাট্যরচনার মধ্যে যথেষ্ট কালগত দূরত্ব। সমকালীন যুগ, সমকালীন অভিনেতা এবং সমকালীন দর্শকের মধ্যে সেতুবন্ধনই নাটকের দায়িত্ব—সে নাটক পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ইত্যাদি যে কোন কাহিনী-সঞ্জাত হোক না কেন।

নাটকের উপাদানগুলির মধ্যে প্রধান হল সংঘাত, উৎকণ্ঠা, শ্লেষ ইত্যাদি। সামাজিক এবং ঐতিহাসিক কাহিনীর মধ্যে এই উপাদানগুলির প্রয়োগ যত সহজসাধ্য, পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে এইগুলির প্রয়োগ তেমনই কষ্টসাধ্য। পুরাণের কাহিনী যেহেতু মুখ্যতঃ দেবনির্ভর তাই সেখানে সংঘাত, শ্লেষ এবং উৎকণ্ঠার একান্তই অভাব। কোন কোন পৌরাণিক কাহিনীতে এইগুলির আপাতক্ষীণ উপস্থিতি থাকলেও পরিণতিতে সব সমস্যার মধুর পরিণতি অবশ্যম্ভাবী। পৌরাণিক নাট্যকারকে এই অসুবিধায় পড়তে হয়। পুরাণের প্রাধান্য ঘটলে নাট্যরসাভাস ঘটে আবার নাটকীয় কৌশলের প্রাধান্য ঘটলে পুরাণের গৌরব ম্লান হয়ে যায়। পুরাণ এবং নাটকের অবস্থিতি যেন সম্পূর্ণ দুটি পৃথক দ্বীপে, উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যস্থাপন অত্যন্ত দুরূহ। গিরিশচন্দ্রের নাটকে ভক্তিভাব থাকায় পুরাণের আদর্শ অনুভূত হয় সত্য কিন্তু পৌরাণিক নাটকের চরমোৎকর্ষের পথে তা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তেমনই দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যধর্মের প্রতি গভীর দৃষ্টি থাকায় পুরাণের রস রক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। বাংলা সাহিত্যের এই দু'জন প্রধান নাট্যকারের মত অন্যান্য নাট্যকারের পৌরাণিক নাটকেও এই ভারসাম্যচ্যুতি ঘটেছে।

এ সত্ত্বেও বাংলা নাট্যসাহিত্যে পৌরাণিক নাটকের জয়রথ প্রায় পঁচাত্তর বছর অপ্রতিহত গতিতে এগিয়েছিল। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে বাঙালীর মানসিকতার সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই যদিও বাংলা দেশে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চিন্তার প্রসার ত্বরান্বিত হয়েছিল কিন্তু ধর্মপ্রাণ বাঙালী তার পুরাণকে কখনই ত্যাগ করেনি। কৃত্তিবাস-কাশীরামদাসের রচনা উনবিংশ শতাব্দীর জীবনবেদ বলা

২. অজিতকুমার ঘোষ : 'সাহিত্য-কোষ : নাটক' (আলোক রায় সম্পাদিত)

চলে। ইউরোপীয় নাটকের অনুবাদের পাশাপাশি পুরাণ এবং সংস্কৃত পুরাণাশ্রয়ী কাব্য-নাটকাদির অনুবাদ সমশক্তিতে সমান্তরাল রেখায় চলছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর রঙ্গমঞ্চে পৌরাণিক নাটকগুলির অভিনয় সর্বাপেক্ষা বেশী হয়েছিল, তথ্যগত বিচারে এমন উক্তি করা সম্ভব। সামাজিক নাটক এবং প্রহসন রচনা করলেও একমাত্র দীনবন্ধু ব্যতীত অন্যান্য নাট্যকারগণের পৌরাণিক এবং রামায়ণিক নাট্যরচনার প্রতিই আগ্রহ বেশী। ঊনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর মধ্যে যে সামান্যমাত্র কালগত ব্যবধান; পুরাণ রচনাকালের সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েক হাজার বছরের কালগত দুস্তর ব্যবধানের সঙ্গে তুলনায় তা অনুল্লেখ্য। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে মাত্র একটি শতাব্দীর ব্যবধানে পুরাণের প্রতি বাঙালীর বিশ্বাস এমন বিবর্তিত রূপ পরিগ্রহ করেছে যা অবিশ্বাস্য। সেই একই কারণে পৌরাণিক নাটকেরও বিস্ময়কর সমাপ্তি ঘটেছে। তবে পুরাণের আবেদনের চেয়ে পৌরাণিক নাটকের আবেদনের তীব্রতা বেশী ক্ষীণ হওয়ার পিছনে বহুমুখী কারণ আছে।

মধ্যযুগের বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রখর দেববিশ্বাস উচ্চতম আসন অলংকৃত করে আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় যে নবজাগরণের পালা-বদল দেখা দিল তাতে বাঙালী তার সুচিরকালের দেববিশ্বাসকে অস্বীকার করল না, স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে পরিশীলিত করল। রামমোহন-ঈশ্বরগুপ্ত-দেবেন্দ্রনাথ-ভূদেব-বঙ্কিমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র—এঁরা ধর্মের ক্ষেত্রে নানা পথের পথিক হলেও সনাতন ধর্মের সঙ্গে তাঁদের যোগ কোথাও বিচ্ছিন্ন হয়নি। প্রাচীন হিন্দু রক্ষণশীল ব্যক্তিদের সঙ্গে নব্যশিক্ষিত তরুণদের সংঘর্ষ হলেও পুরাণের কোন স্থানচ্যুতি ঘটেনি।৩ক ঊনবিংশ শতাব্দীতে অজস্র পৌরাণিক নাটক রচনার পিছনে যে কারণটি সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সেটি হল ব্রাহ্মধর্মের দ্রুত প্রচারের হাত থেকে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করা।৩খ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্রাহ্মধর্মের অপ্রতিহত গতির কাছে জরাতুর হিন্দুধর্ম একরকম নত হয়েই ছিল। ১৮৭২-এ কেশবচন্দ্র-দেবেন্দ্রনাথ বিরোধ প্রবল হয়ে উঠলে পুরাণ-ভ্রষ্ট বাঙালী আবার অতীত কাহিনীর স্মৃতিমন্থনে ব্যাকুল হল।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সূচনাতেই বাঙালী সমাজ এবং বাঙালীর চিন্তা-জগতের পট-পরিবর্তন ঘটল। স্বয়ং গিরিশচন্দ্র বিংশ শতাব্দীর প্রদোষ-মুহূর্তে দাঁড়িয়ে শতাব্দীর নাড়ী-স্পন্দন অনুভব করেছিলেন। এই শতাব্দী যে

৩ক. এ সম্পর্কে গ্রন্থের অন্যত্র দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে।

৩খ. ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই কৃত্তিবাসী রামায়ণের মুদ্রিত রূপ জনপ্রিয় হয়। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পুরাণ-নির্ভর সংস্কৃত নাটক 'বেণীসংহার,' 'চণ্ডকৌশিক', 'বিক্রমোর্ব্বশী', 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্', 'উত্তর রামচরিত', 'ধনঞ্জয় বিজয়' ইত্যাদি বাংলায় অনূদিত হয় এবং যথেষ্ট মঞ্চসাফল্য অর্জন করে।

রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক তথা সামাজিক যন্ত্রণায় নিরন্তর দগ্ধ হবে সে কথা তাঁর মনে স্পন্দিত হয়েছিল। তাই দেখি বিগত শতাব্দীর গিরিশচন্দ্রের যেখানে মুখ্য পরিচয় পৌরাণিক নাট্যকার রূপে, সেখানে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে তিনি প্রধানতঃ সামাজিক এবং ঐতিহাসিক নাট্যকার। ১৯০০ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে গিরিশচন্দ্র মোট ২১টি নাটক লিখেছিলেন—যার মধ্যে মাত্র ৪টি পৌরাণিক অথবা পুরাণাশ্রয়ী নাটক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা পৌরাণিক নাটকে এই সুরটিই চোখে পড়ে। বস্তুতপক্ষে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুটি দশকেই পৌরাণিক নাটকের শেষ ঘণ্টাধ্বনি শোনা গিয়েছিল।

উনিশ শো তিরিশের পর সমগ্র ভারতবর্ষের জনজীবনে স্বাধীনতার জন্য শেষ লড়াই শুরু হয়। আন্তর্জাতিক পরিবেশেও এই যুগ একান্তই অস্থিরতায় কাতর, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) আসন্ন মারণযজ্ঞের প্রস্তুতি তখন আকাশে বাতাসে। দেশীয় পরিবেশে নরমপন্থী, মধ্যপন্থী এবং চরমপন্থীগণের স্বাধীনতার জন্য শেষ সংগ্রাম তিরিশের দশকের একমাত্র লক্ষ্য। উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ছিল প্রস্তুতির প্রয়াস, বিংশ শতাব্দীতে সেই আন্দোলন একটি ধ্রুব লক্ষ্যে ধাবিত হল। ১৯০৪-০৫-এ বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে জাগরণ সূচিত হয়েছিল, তারই প্রাণস্রোত স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত হোমাগ্নির মত নিত্য বহ্নিমান।

কেবলমাত্র বাংলা সাহিত্যেই নয়, বিশ্বের কোন সাহিত্যেই স্বাধীনতার প্রাক্ মুহূর্তে পুরাণের শান্ত, সমাহিত দৈব-নির্ভর কাহিনী আশ্রয়ে নাটক রচনায় উৎসাহ দূরে থাক, নাট্যকারের উদাসীন চিত্তের মর্মকোষেও পুরাণ আর উপস্থিত থাকেনি। বাংলা নাট্যসাহিত্যেও এই দিকটি লক্ষ্য করা যায়। ১৯৩০-এর পূর্ব পর্যন্ত বাংলার নাট্যকারগণ পৌরাণিক নাটকের ক্ষীণ ধারাটি যাতে মুছে না যায় তার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নরনারায়ণ', যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'সীতা', অপরেশচন্দ্রের 'কর্ণার্জুন,' জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'রামচন্দ্র', মন্মথ রায়ের 'চাঁদ সদাগর' 'দেবাসুর' ইত্যাদি নাটক ১৯৩০ সালের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রদীপের শেষ শিখার সম্ভবতঃ এই সময়ই শেষ ঝলকানি। রাজনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যাকাতর বাঙালী দর্শক তখন 'জনা', 'পাণ্ডবগৌরব', 'ভীষ্ম' নাটক অপেক্ষা সমাজ-জীবনাশ্রয়ী অথবা অন্যস্বাদের নাট্যসুখে বেশী ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে যদিও বা দু'একটি পৌরাণিক নাটক লেখা হয়েছিল তার উদ্দেশ্য একান্তই ছিল পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ। সেই উদ্দেশ্য গিরিশচন্দ্রেরও ছিল। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক যেমন আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাকে রঙ্গমঞ্চের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল তার কণামাত্র গৌরবও বিংশ শতকের চল্লিশোত্তর পৌরাণিক নাটক দাবী করতে পারেনি। এর কারণ নাট্যকারের অক্ষমতা নয়, জনরুচির স্পষ্ট পরিবর্তন।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা যখন এল তখনি হল দেশবিভাগ। অতঃপর বাংলা পৌরাণিক নাটক সম্পূর্ণ বিদায় নিল। এর কারণ নির্দেশ করে নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসকার লিখেছেন—"পৌরাণিক বিষয়বস্তু মানবিকগুণপ্রধান না হইলে সাহিত্যে তাহা স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না; অর্থাৎ পুরাণ কেবল পুরাণ হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, মানুষকে ভিত্তি করিয়াই তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়। বাংলার বিগত শতাব্দীর পৌরাণিক নাটক প্রধানতঃ বিশ্বাস ও ভক্তিরসাশ্রিত ছিল, আজ জাতির মন হইতে বিশ্বাস ও ভক্তির ভাব দুর হইয়া গিয়া যুক্তিবাদের বিকাশ হইয়াছে। যুক্তিবাদের সম্মুখে পৌরাণিক আদর্শ টিঁকিয়া থাকিতে পাবে না, সেইজন্য আধুনিক যুগে পৌরাণিক নাটকের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না।' [৪]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং দেশবিভাগ একদিকে যেমন বাঙালীর অন্দরমহলে তার নিষ্ঠুর প্রভাব সঞ্চারিত করল সঙ্গে সঙ্গে বাংলা নাটকের শান্ত নিস্তরঙ্গ গতিপথকেও আমূল পরিবর্তিত করল। এই যুগের নাটকের কাহিনী নাগরিক সমাজের যন্ত্রণাদগ্ধ তলদেশ থেকে উঠে এসেছে, এই যুগের নায়ক গোষ্ঠীর অথবা শ্রেণীর প্রতিনিধি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমকালীন বাংলা দেশে ভুখা মানুষের মিছিল, লক্ষ লক্ষ লোকের অনাহারে মৃতকল্প এক মর্মান্তিক ইতিহাস। বিংশ শতাব্দীর মানুষ এ জন্য দৈবকে দায়ী করেনি, দেবতার কাছে কৃপাভিক্ষা করেনি, কেননা সে জানে এই মৃত্যুর চিতাশয্যার উপরই কিছু মুষ্টিমেয় মানুষ মুনাফার পাহাড় গড়ে তুলেছে।

একদিকে যুদ্ধের মাশুল স্বরূপ এই অনাহার এবং মৃত্যু অন্যদিকে এলো দেশবিভাগ। 'দেশবিভাগের ফলে আমাদের সমাজে যে অভাবিত দুর্যোগ নামিয়া আসিল তাহা আমাদের অভ্যস্ত ও শান্তিমগ্ন জীবনধারা সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত করিয়া দিল। পারিবারিক জীবনের লজ্জা, শালীনতা ধূলায় লুটাইয়া পড়িল। বিকৃত লালসা ও অশুভ অর্থলিপ্সা ফাঁদ পাতিল সর্বত্র। অভাবের সুড়ঙ্গপথে মনুষ্যত্ব আত্মহত্যা করিয়া বসিল।' [৫]

বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকের বাংলা নাটকের উপজীব্য বিষয় হল সমকালীন বাস্তব জীবন। অতি-আধুনিক বাংলা নাটকগুলির সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দু'টি দশকের বাংলা নাটকের মধ্যে যেন কোন সম্পর্কই নেই। উনবিংশ শতাব্দীতেও নাটক সমাজের সমস্যার কথা বলেছে, কিন্তু সেই সমস্যা যেন কোন একটিমাত্র পরিবারের সমস্যায় কেন্দ্রায়িত মাত্র। 'কুলীন কুলসর্বস্ব', 'প্রফুল্ল' ইত্যাদি নাটক ব্যক্তি-চরিত্রের প্রতিই আলোকপাত করেছে। কিন্তু অত্যাধুনিক বাংলা নাটকে ব্যক্তিজীবন নয়, গোষ্ঠীজীবনেরই প্রতিষ্ঠা। গণনাট্যের দ্রুত বিকাশে যে বাংলা

৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য: বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৯৬১

৫. অজিতকুমার ঘোষ: বাংলা নাটকের ইতিহাস, ১৩৬৮

নাটক রচিত হতে শুরু করল সে নাটকে পুরাণ এবং ইতিহাসের ঘটনা ও চরিত্রের পরিবর্তে উপস্থিত হল সম্পূর্ণ নুতন নাট্যধারা, যার নায়ক সমকালীন বিক্ষুব্ধ সমাজজাত। এই নাটকগুলির নায়ক-নায়িকা হরিশ্চন্দ্র, পঞ্চপাণ্ডব, দুর্যোধন, রুক্মিণী, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, সুভদ্রা অথবা কর্ণ নয়; এরা আমাদের একান্ত পরিচিত পরাণ মণ্ডল (জবানবন্দী—তুলসী লাহিড়ী) বিশ্বনাথ (মোকাবিলা—দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়), ধর্মদাস (দুঃখীর ইমান—তুলসী লাহিড়ী), পরী (নতুন ইহুদী—সলিল সেন), বিনু (অঙ্গার—উৎপল দত্ত)। আর সুদূর অমরাবতী অথবা নন্দনকানন নয়, কৈলাসপর্বত অথবা হস্তিনা-ইন্দ্রপ্রস্থ নয়, স্বাধীনোত্তর বাংলা নাটকের ঘটনাস্থান হয় বাংলা দেশের আমিন-পুর গ্রাম (নবান্ন), নয় কলকাতার কোন অনাথ আশ্রম (জীবন স্রোত) অথবা আসানসোলের মেলডন কোলিয়ারী (অঙ্গার)।

বাংলা নাটকের এই সন্ধিযুগে পৌরাণিক নাটক প্রায় বর্জিত এমন কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু ১৯৪০ থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে চরিত নাটকের যে ধারাটি কিছুটা সজীব তা গিরিশচন্দ্র থেকে ক্ষীরোদপ্রসাদ পর্যন্ত নাট্যকারদের রচিত চরিত নাটক অপেক্ষা কিছুটা স্বতন্ত্র হলেও নাটকগুলিতে 'ব্যক্তি' চরিত্রের যথাযথ উপস্থাপনা সম্ভব হয়নি। গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধচরিত', 'চৈতন্য-লীলা', 'শঙ্করাচার্য' অথবা ক্ষীরোদপ্রসাদের 'রামানুজ' চরিত্র-ভিত্তিক নাটক হলেও অলৌকিকতা এবং বিশ্বাসকে আশ্রয় করার ফলে তাঁদের জীবনী নাটকগুলিও পৌরাণিক নাটকের লক্ষণাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রাণপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায়, মধুসূদন দত্ত ইত্যাদি চরিত্রকে নিয়ে রচিত জীবনী নাটকগুলি পৌরাণিক লক্ষণাক্রান্ত হয়ে পড়েনি। এর পূর্বে রচিত চরিত নাটকগুলি পৌরাণিকতায় আচ্ছন্ন হওয়ার কারণ হল সেগুলি সাধারণ মানুষের জীবন চরিত নয়, ধর্মসাধনার বাইরে থেকে উঠে আসা কোন মানুষের কাহিনী নয়। অত্যাধুনিক বাংলা চরিত নাটকের এই 'ব্যক্তি' প্রাধান্যই তাকে পুরাণের অলৌকিকতা-মুক্ত করেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় বাংলা নাটকের যাত্রা শুরু হয়েছিল পৌরাণিক নাটকের মাধ্যমে, আর বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সূচনায় পৌরাণিক নাটক তার সমস্ত সৃষ্টিশক্তি প্রায় হারিয়ে বসল। 'বিশ্বরূপা' কর্তৃপক্ষ ১৯৫৭ সালে 'গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতা' কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণের জন্য যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছিলেন তাতে লেখা ছিল "পৌরাণিক, ঐতিহাসিক কিংবা সামাজিক মৌলিক বা অনুবাদিত বা উপন্যাসের নাট্যরূপে যাঁহারা যে কোন বিভাগে এক কিংবা একাধিক আঙ্গিকে পারদর্শিতা বা নূতনত্ব দেখাইতে পারিবেন, তাঁহাদের মধ্যে নির্বাচিত প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীকে নিম্নলিখিতভাবে পুরস্কৃত করা যাইবে।" প্রথম প্রতিযোগিতায় যে ১৩২টি নাটক অভিনীত হয়েছিল, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তার একটি মাত্র পৌরাণিক নাটক, ১২৯টি সামাজিক নাটক। এই ঘটনা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে পৌরাণিক নাটক

রচনার দিন শেষ হয়েছে। আরও একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তা হল,—"সাম্প্রতিক বাংলা নাটক বাঙ্গালীর প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গে যোগ স্থাপন করে নেওয়ার প্রয়াস পাচ্ছে। যে কল্পনা এবং ভাববিলাস এতদিন পর্যন্ত বাংলা নাটকের অগ্রগতির পথে বাধা দিয়ে এসেছে, তা দূর হয়ে গিয়ে আজ এক সুকঠিন বাস্তব জীবনবোধ বাংলা নাটকের উপজীব্য হয়েছে। প্রায় একশত বছর পর নাটক আজ তার পথ খুঁজে পেয়েছে। সুতরাং বাংলা নাট্যসাহিত্যের নবযুগের অরুণোদয় আসন্ন হয়ে এসেছে বলে মনে করা যেতে পারে।"[৬]

বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের নাট্যদর্শকদের কাছে পৌরাণিক নাটক যে পূর্ব-শতাব্দীর অবয়ব এবং রস নিয়ে উপস্থিত হতে পারেনি তার পিছনে বাঙালীর ধর্মীয় ভাবনার পরিবর্তনও কাজ করেছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার, যন্ত্রশিল্পের প্রতি গভীর আকর্ষণ, মানুষের পরস্পরের মধ্যে নানা শ্রেণীর উদ্ভবের ফলে অধ্যাত্মবাদ ধীরে ধীরে সংকুচিত হতে থাকে। পুরাণে এবং উনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ পৌরাণিক নাটকে পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে যে সকল অভিমত উচ্চারিত, আধুনিক যুগে সে সকল ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। বিংশ শতাব্দীর সমাজ এবং সাহিত্য এই পটভূমিকাতেই রচিত। নাট্যসাহিত্য যেহেতু সমাজের প্রবহমানতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য তাই বিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ নাটকেরই উপজীব্য রাজনীতি, সমাজচিত্র ও অর্থনীতি।

বিশ্ব নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে স্বীকার করতে হয় নাটকের বিবর্তন মোটামুটি তিনটি ধারায় সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম ধারায় সামাজিক অবস্থা উপেক্ষিত বলেই নাট্যকাহিনীর আশ্রয় দেবতার কীর্তি-কাহিনী। দ্বিতীয় ধারায় দেবতাশ্রিত মানুষই হল নায়ক, কেননা দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ সমাজজীবন সম্পর্কে এই ধারার নাট্যকারগণ অবহিত। তৃতীয় ধারায় রচিত নাটকে মানুষের কথা, যে মানুষ শ্রেণী-বিভাগ সম্পর্কে সচেতন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী। অধ্যাত্মবাদ যেরূপ ধীরে ধীরে বস্তুবাদে রূপান্তরিত হয়, ধর্মাশ্রয়ী পৌরাণিক নাটকও ক্রমশঃ বাস্তববাদী নাটকের কাছে আত্মসমর্পণ করে।[৭]

৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য : সাহিত্য-কোষ : নাটক (আলোক রায় সম্পাদিত)।

৭. "এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখা যায়—নাটকের ইতিহাস আসলে নাটকের দেবতাকেন্দ্রিকতার ক্রমহ্রাসের এবং মানবকেন্দ্রিকতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস। নাটকের এই এক কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে অভিসরণ সমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে কার্যকারণযোগে যুক্ত হয়ে আছে এবং আছে বলেই শিল্পকর্ম হিসাবে নাটকের অভ্যুদয় ঘটেছে মানবকেন্দ্রিকতার সূচনার সঙ্গে অর্থাৎ মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠা— ব্যক্তি-চেতনার বৃদ্ধির সঙ্গে।"— সাধনকুমার ভট্টাচার্য : নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা।

বাংলা নাটকের এক'শ বছরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে এই বিবর্তনটি যত স্পষ্ট, ইউরোপীয় নাট্যসাহিত্যের হাজার বছরের বিবর্তনে তা স্পষ্টতর। মধ্যযুগে ইউরোপে গীর্জায় ধর্মীয় পরিবেশে যে মিস্ট্রি, মিরাক্যল জাতীয় নাটকগুলি অভিনীত হত সেগুলির প্রধান লক্ষ্য ছিল সম্বদীক্ষিত খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীদের ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করা। একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই নাট্যাভিনয়ের গতি দ্রুত ছিল। এরপর দেবতাশ্রয়ী সাধু-সন্তদের অলৌকিক জীবন-কাহিনী নিয়ে নাটক রচিত ও অভিনীত হতে লাগল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই এই পরিবর্তনটি চোখে পড়ে। ষোড়শ শতাব্দীতে পৌঁছে নাটকে বাস্তবতা এবং লোকচরিত্রের প্রতিফলনের উপর নাট্যকারদের দৃষ্টি পড়ে। ফরাসী এবং ইতালী নাট্যসাহিত্যে যেমন, তেমনি স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশের নাট্যসাহিত্যেও ধর্মীয় নাটকের বিদায় এবং বাস্তবধর্মী নাটকের বিকাশ একই রীতিতে হয়েছিল। বাংলা নাট্যসাহিত্যের মাত্র একশ' বছরের ইতিহাসেও কিন্তু এই বিবর্তনটি সংঘটিত হয়েছে।

আধুনিক ও অত্যাধুনিক নাটকের অন্যতম প্রাণ হল 'Dramatic Suspense' বা নাটকীয় উৎকণ্ঠা। নাট্যকার এই আঙ্গিক কৌশলে যুগপৎ কাহিনীর অগ্রগতিতে দ্রুতি সঞ্চারিত করেন ও নাটকীয় চরিত্রকে একটি অনিশ্চিৎকর পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড় করান। একমাত্র পৌরাণিক নাটক ব্যতীত অন্যান্য সব শ্রেণীর নাটকেই দর্শকমনে উৎকণ্ঠা সৃষ্টির সুযোগ থাকে। পৌরাণিক নাটকে বাস্তবসম্মত উৎকণ্ঠা অবহেলিত হওয়ার কারণ হল পুরাণের সিদ্ধচরিত্র এবং ঘটনা দর্শকদের এতই জানা যে তার দ্বারা দর্শকের মনে উদ্বেগ, উত্তেজনা এবং অনিশ্চয়-উৎকণ্ঠা সঞ্চারের সুযোগ কম। আধুনিক যুগে পৌরাণিক নাটকের আবেদনের অভাবের এটিও একটি কারণ হতে পারে।

যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুরাণের যেমন নূতন ব্যাখ্যা চলতে থাকে তেমনই পৌরাণিক নাটকের রস এবং অবয়বেও বিবর্তন ঘটতে বাধ্য। Peacock দেশ-বিদেশের পৌরাণিক নাটকের এই আধুনিকীকরণের কথা বলতে গিয়ে সুন্দরভাবে বলেছেন—"It is a curious fact that Girandoux, who is looked on as the initiator on the French stage of the Modern tradition of Myth Drama, and who is also most often praised for his "poetic fantasy,' does not fall into line with the authors mentioned in this matter of dramatic style. From what was said in a previous section it will appear that Girandoux starts by borrowing a scheme from myth but converts it into fantasy which is nearer to Allegory than Myth. Girandoux neither revives nor recreates myths. He uses them."[৮] ইংরেজী নাটকে Eliot এবং ফরাসী নাটকে

৮. Peacock, Ronald : The Art of Drama, 1960

Cocteauও "...reinfuse into a mythical scheme the truth of particular human behaviour and circumstances, whilst allowing its archetypal power, stored up in the past, to reverberate through reality; and they envelop the whole with an imagery of feeling.'[৯]

বাংলা নাট্যসাহিত্যে এই নবপুরাণ পদ্ধতিটি আমরা রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথ পুরাণের ভক্তিবিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠার মূলসুরটি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। ধর্মপ্রাণ বাঙালী সমাজে বর্তমান যুগে ধর্মতত্ত্ব আর ভক্তিরসে দ্রব হয় না বলেই পৌরাণিক নাটকের আদর আর বিগত শতাব্দীর মত নেই। রবীন্দ্র-সমসাময়িক এবং রবীন্দ্রোত্তর বাংলা নাট্যকারগণ সমাজ জীবনের বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গে সনাতন ধর্মবোধের এই ব্যাপক পরিবর্তন সম্পর্কে যে সচেতন তার পরিচয় তিরিশের দশকের পর পৌরাণিক নাট্যকর্মে তাঁদের নীরবতা।

গিরিশচন্দ্র বাঙালী চিত্তে ধর্মপ্রবাহের চিরন্তনত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন। সেজন্য বাংলা পৌরাণিক নাটকের ভবিষ্যৎ জনপ্রিয়তা সম্পর্কে তাঁর মনে কোন দ্বিধা ছিল না। কিন্তু দেখা গেল বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই সেই ধর্ম-জোয়ার স্তিমিত হয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক নাটকের প্রচার গেল কমে। কলকাতার মঞ্চগুলির পাদপ্রদীপের আলো থেকে পৌরাণিক নাটক দ্রুত সরে যেতে লাগল। সমকালীন জীবন-যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত মানুষের মন থেকে ধর্মের প্রতি বিশ্বাস অপসৃত হতে থাকায় পৌরাণিক নাটকের আবেদনও কমতে থাকে।

ভাবীকালে বাংলা সাহিত্যে ও রঙ্গমঞ্চে পৌবাণিক নাটকের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে এমন দ্রুত মন্তব্য করা উচিত নয়। এই চূড়ান্ত বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগেও পুরাণের বিষয় নিয়ে কিছু কিছু ছায়াছবি নির্মিত হচ্ছে, নাটকও অভিনীত হচ্ছে। তবে একথাও ঠিক এগুলি আর 'পৌরাণিক নাটক' নয়, বরং বলা যায় 'পুরাণ-নির্ভর নাটক'। সিদ্ধরসের নিখুঁত অনুসারী পৌরাণিক নাটক রচনা আর সম্ভব নয়। পুরাণের পরিচ্ছদে সমকালই সেখানে প্রতিষ্ঠা পায়, যেমন পাচ্ছে লোহার ভীম, কুরুক্ষেত্র, মারীচ-সংবাদ, নরক গুলজার, শিবের অসাধ্যি ইত্যাদি নাটকে। উত্তরকালেও এমনই ভাবে আরও অসংখ্য পুরাণনির্ভর নাটক লেখা হতে পারে যার নায়ক-নায়িকা হয় অভিমন্যু, নয় মেঘনাদ কিংবা সীতা—অবশ্যই তাঁদের জীবন-সমস্যার সঙ্গে ভবিষ্যতের মানুষের সমস্যা মিলবেই। এইভাবেই জন্ম নেবে নতুন পৌরাণিক নাট্যধারা। সেই পৌরাণিক নাটক যে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের অবয়ব ও রস থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হবে তা বলাই বাহুল্য।

৯. Ibid.

॥ পরিশিষ্ট ॥

১৮৫২ সন থেকে ১৯৫২ সন পর্যন্ত প্রকাশিত বাংলা পৌরাণিক নাটকের তালিকা

তারাচরণ শীকদার : ভদ্রার্জুন, ১৮৫২
কালীপ্রসন্ন সিংহ : সাবিত্রী সত্যবান, ১৮৫৮
মধুসূদন দত্ত : শর্মিষ্ঠা
হরচন্দ্র ঘোষ : কৌরব বিয়োগ
উমাচরণ দে : নল-দময়ন্তী, ১৮৫৯
অভয়ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় : নল-দময়ন্তী
হরিশ্চন্দ্র মিত্র : জানকী, ১৮৬৩
দুর্গাদাস কর : স্বর্ণশৃঙ্খল
হরিশ্চন্দ্র মিত্র : জয়দ্রথ বধ, ১৮৬৪
অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় : শকুন্তলা ১৮৬৫
দ্বিজ তনয়া : উর্বশী, ১৮৬৬
পূর্ণচন্দ্র শর্মা : শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান
উমেশচন্দ্র মিত্র : সীতার বনবাস
হরিমোহন কর্মকার : জানকী-বিলাপ, ১৮৬৭
মনোমোহন বসু : রামাভিষেক
যাদবচন্দ্র বিদ্যারত্ন : কীচকবধ, ১৮৬৮
কালিদাস সান্যাল : নল-দময়ন্তী
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় : প্রভাস-মিলন, ১৮৭০
শ্রীশচন্দ্র রায়চৌধুরী : লক্ষ্মণ বর্জন
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় : মৈথিলী-মিলন, ১৮৭১
রামনারায়ণ তর্করত্ন : রুক্মিণী হরণ
দ্বিজ তনয়া : উষা নাটক
হরিশ্চন্দ্র মিত্র : রাম-বনবাস, প্রহ্লাদ, ১৮৭২
নিমাইচাঁদ শীল : ধ্রুবচরিত্র
ভাদাড়ু গিরিশ : ধ্রুবতপস্যা

তারানাথ তর্কবাচস্পতি : ধনঞ্জয় বিজয়
রাজকৃষ্ণ দত্ত : দ্রৌপদীহরণ
মহেশচন্দ্র দত্ত : মানার্ণব
মনোমোহন বসু : সতী নাটক, ১৮৭৩
হরিনাথ মজুমদার : অক্রূর-সংবাদ
ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : ধ্রুবোপাখ্যান
পার্বতীচরণ তর্করত্ন : হরিশ্চন্দ্র চরিত নাটক
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় : নল-দময়ন্তী ১৮৭৪
মনোমোহন বসু : হরিশ্চন্দ্র
মদনমোহন মিত্র : বৃহন্নলা
হরিনাথ মজুমদার : সাবিত্রী
নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সতী কি কলঙ্কিনী
অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় : উষাহরণ ১৮৭৫
নগেন্দ্রনাথ ,, : পারিজাতহরণ
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় : ধ্রুবযোগাখ্যান, দুর্বাসার পারণ, কৃষ্ণান্বেষণ, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, রামের রাজ্যপ্রাপ্তি
রামনারায়ণ তর্করত্ন : কংসবধ, ধর্মবিজয়
রসিকচন্দ্র রায় : সীতান্বেষণ
মনোমোহন বসু : হরিশ্চন্দ্র
শ্যামাচরণ দাস : কুরুক্ষেত্রোপাখ্যান
অতুলকৃষ্ণ মিত্র : আদর্শ সতী, ১৮৭৬
মহেশচন্দ্র দাস দে : মহীরাবণবধ
কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : লঙ্কেশ্বর-বিজয়

রাধামাধব হালদার : শৈব্যাসুন্দরী
যদুগোপাল বসু : সুভদ্রাহরণ
রাজকৃষ্ণ দত্ত : অরুন্ধতী নাটক, ১৮৭৭
দ্বিজ তনয়া : রামের অধিবাস, দ্বি.সং
কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : দুর্যোধনের দর্পচূর্ণ
রাজকৃষ্ণ রায় : অনলে বিজলী, ১৮৭৮
জহরীলাল শীল : রাবণবধ
কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : হরিশ্চন্দ্র, জরাসন্ধ বধ, গৌর-মিলন, রাম-বনবাস (তৃ. সং) রামের রাজ্যাভিষেক
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় : সীতার বনবাস, ১৮৭৯
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় : সীতার বনবাস
কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : সীতার বনবাস, সাবিত্রী-সত্যবান
কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় : রামাভিষেক
নন্দলাল রায় : অর্জুনবধ
চন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় : সিন্ধুবধ
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : সীতা কি অসতী
প্রমথনাথ মিত্র : শম্ভু-সংহার, ১৮৮০
রাজকৃষ্ণ রায় : তারক-সংহার
রাধানাথ মিত্র : উষাহরণ
প্রিয়নাথ রায় : নন্দোৎসব
তিনকড়ি বিশ্বাস : জয়দ্রথবধ
প্রাণচন্দ্র দাস : নল-দময়ন্তী
অঘোরচন্দ্র ঘোষ : রাবণবধ
মহেশচন্দ্র দাস দে : তরণীসেনবধ
কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : লক্ষ্মণ বর্জন
গিরিশচন্দ্র ঘোষ : রাবণবধ, অভিমন্যুবধ, ১৮৮১
মনোমোহন বসু : পার্থ পরাজয়
রাজকৃষ্ণ রায় : হরধনুর্ভঙ্গ
রাধানাথ মিত্র : প্রণয়-পারিজাত শিবের বিবাহ, দ্বি. সং

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় : অহল্যা-হরণ
গিরিশচন্দ্র ঘোষ : সীতার বনবাস, লক্ষ্মণ বর্জন, সীতাহরণ, রামের বনবাস, ১৮৮২
রাধানাথ মিত্র : মেঘেতে বিজলী বা হরিশ্চন্দ্র
রাজকৃষ্ণ রায় : রামের বনবাস
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় : রাবণবধ
অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি : সতীবিয়োগ
মহেশচন্দ্র দাস দে : দক্ষযজ্ঞ নাটক বা সতীলীলা, পঞ্চম সং
রাজকৃষ্ণ রায় : যদুবংশ ধ্বংস, ১৮৮৩
মহেন্দ্রলাল খাঁ : মথুরা-মিলন
কুঞ্জবিহারী বসু : কৃষ্ণলীলা বা মথুর বিহার, ১৮৮৪
গিরিশচন্দ্র ঘোষ : বৃষকেতু, নিমাই সন্ন্যাস
তিনকড়ি বিশ্বাস : ভরত বিলাপ
রাজকৃষ্ণ রায় : তরণীসেন বধ, প্রহ্লাদ চরিত্র
রাধানাথ মিত্র : শ্রীবৎসচিন্তা
ধনঞ্জয় সরকার : প্রহ্লাদ চরিত্র, রাম-বনবাস
রামচন্দ্র ভট্টাচার্য : ভরতবিলাপ
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : জয়দ্রথ বধ
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় : দ্রৌপদী স্বয়ংবর
অতুলকৃষ্ণ মিত্র : ভীষ্মের শরশয্যা ১৮৮৫
রাজকৃষ্ণ রায় : দশরথের মৃগয়া বা বালক সিন্ধুবধ
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় : হরিশ্চন্দ্র
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় : রাজসূয়যজ্ঞ
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : সমুদ্রমন্থন
ভুবনকৃষ্ণ মিত্র : ধর্ম পরীক্ষা, ১৮৮৬
গিরিশচন্দ্র ঘোষ : চৈতন্যলীলা
রাধাবিনোদ হালদার : নাগযজ্ঞ
তারাপদ ভট্টাচার্য : হরিশ্চন্দ্র

নন্দলাল রায় : ধ্রুব চরিত্র
গিরিশচন্দ্র ঘোষ : বুদ্ধদেব-চরিত, নল-দময়ন্তী ১৮৮৭
রাখালদাস ভট্টাচার্য : রুক্মিণীরঙ্গ
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় : প্রভাস মিলন, রুক্মিণীরঙ্গ
গিরিশচন্দ্র ঘোষ : বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, রূপ-সনাতন ১৮৮৮
হরিভূষণ ভট্টাচার্য : কুমারসম্ভব
কমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিল্বমঙ্গল ঠাকুর
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় : সীতা-স্বয়ংবর, নন্দ-বিদায়, পরীক্ষিতের অভিশাপ
অতুলকৃষ্ণ মিত্র : নন্দবিদায়
রাজকৃষ্ণ রায় : হরিদাস ঠাকুর
মনোমোহন বসু : রাসলীলা, ১৮৮৯
প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় : পঞ্চমবেদ বা মহাভারত নাট্যকাব্য
ভুবনকৃষ্ণ মিত্র : দাতাপরীক্ষা নাটক ১৮৯০
রাজকৃষ্ণ রায় : চন্দ্রাবলী, প্রহ্লাদ মহিমা
রাজকৃষ্ণ রায় : নরমেধযজ্ঞ, ১৮৯১
অতুলকৃষ্ণ মিত্র : নিত্যলীলা বা উদ্ধব সংবাদ
গিরিশচন্দ্র ঘোষ : কমলে কামিনী
ভুবনকৃষ্ণ মিত্র : নিকুঞ্জ বিহার
কুঞ্জবিহারী বসু : শ্রীরামনবমী, ১৮৯২
গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী : সন্ন্যাসিনী বা মীরাবাঈ
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত : উষা, ১৮৯৩
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় : দুর্যোধনবধ
গিরিশচন্দ্র ঘোষ : জনা, ১৮৯৪
অতুলকৃষ্ণ মিত্র : মা
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত : মানকুঞ্জ
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় : হরি-অন্বেষণ
রাজকৃষ্ণ রায় : বামনভিক্ষা, ১৮৯৫
নগেন্দ্রনাথ ঘোষ : দানলীলা
গিরিশচন্দ্র ঘোষ : করমেতি বাঈ
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় : ধ্রুব, ১৮৯৬
দুর্গাদাস দে : শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ১৮৯৭
কামিনী রায় : পৌরাণিকী
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় : নরোত্তম ঠাকুর
হরিপদ চট্টোপাধ্যায় : দাতাকর্ণ
প্রমথনাথ দাস : রাধাকুণ্ড
বঙ্কুবিহারী ধর : যাদব-কলঙ্ক
সত্যচরণ সেনগুপ্ত : সাবিত্রী, ১৮৯৮
হরকুমার ভট্টাচার্য : শঙ্করাচার্য
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত : শ্রীকৃষ্ণ, ১৮৯৯
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : পাষাণী, ১৯০০
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ : বভ্রু-বাহন
গিরিশচন্দ্র ঘোষ : পাণ্ডবগৌরব
শৈলেন্দ্রনাথ সরকার : রাম
অমৃতলাল বসু : হরিশ্চন্দ্র
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ : সাবিত্রী ১৯০২
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত : শ্রীরাধা, ১৯০৪
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ : বৃন্দাবন-বিলাস
গিরিশচন্দ্র ঘোষ : হরগৌরী, ১৯০৫
হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ; প্রহ্লাদ চরিত্র, শুকদেব চরিত্র
মনোমোহন রায় : ঐন্দ্রিলা
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ : উলূপী ১৯০৬
হরিপদ চট্টোপাধ্যায় : ভৃগুচরিত, যদুবংশধ্বংস
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : সীতা, ১৯০৮
হারাধন রায় : পার্থপরীক্ষা
হরিপদ চট্টোপাধ্যায় : দুর্গাসুর
শিশিরকুমার ঘোষ : নিমাই সন্ন্যাস ১৯০৯
সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী : রূপ-সনাতন

গিরিশচন্দ্র ঘোষ : শঙ্করাচার্য, ১৯১০
শশাঙ্কমোহন সেন : সাবিত্রী
মতিলাল ঘোষ : পরশুরাম, দ্বি সং
গিরিশচন্দ্র ঘোষ : তপোবল, ১৯১১
হরিপদ চট্টোপাধ্যায় : অন্নপূর্ণা
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ : ভীষ্ম
১৯১৩
হরিপদ চট্টোপাধ্যায় : বিদুর
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : ভীষ্ম, ১৯১৪
হারাধন রায় : রাম অবতার
হরিপদ চট্টোপাধ্যায় : ব্রহ্মতেজ, নীলকণ্ঠ
হারাধন দত্ত : যযাতি
দুর্লভবালা দেবী : কমলা-হরণ, ১৯১৫
কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : জড়ভরত
শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ : কপিলের তেজ
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় : রামানুজ
১৯১৬
মতিলাল ঘোষ : ধ্রুব
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ : রামানুজ
হারানচন্দ্র রক্ষিত : জড়ভরত
হরিপদ চট্টোপাধ্যায় : রাম-নির্বাসন
১৯১৭
মতিলাল ঘোষ : বৃন্দাবন বিহার
অহিভূষণ ভট্টাচার্য : উত্তরা-পরিণয়
হরিপদ চট্টোপাধ্যায় : শ্রীগৌরাঙ্গ
১৯১৮
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় : উর্বশী
১৯১৯
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ
কুমুদরঞ্জন মল্লিক : দ্বারাবতী, ১৯২০
রাধাকমল মুখোপাধ্যায় : নিদ্রিত নারায়ণ
মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : নর-নারায়ণ
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ : মন্দাকিনী ১৯২১
হরিপদ চট্টোপাধ্যায় : ভক্তের ভগবান
১৯২২
মতিলাল ঘোষ : দ্বারাবতী
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় : কর্ণার্জুন
১৯২৩
হরিপদ চট্টোপাধ্যায় : সংহার স্বয়ংবর
যোগেশচন্দ্র চৌধুরী : সীতা, ১৯২৪
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ : নর-নারায়ণ ১৯২৬

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় : শ্রীকৃষ্ণ
বরদাপ্রসাদ দাশগুপ্ত : শ্রীদুর্গা
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় : শ্রীরামচন্দ্র
১৯২৭
শৈলেন্দ্রনাথ সরকার : গৌরাঙ্গলীলা
মন্মথ রায় : চাঁদ সদাগর
অমৃতলাল বসু : যাজ্ঞসেনী ১৯২৮
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় : ফুল্লরা
মন্মথ রায় : দেবাসুর
ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : দাতা-কর্ণ
বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তা : সুভদ্রা, ১৯২৯
মন্মথ রায় : শ্রীবৎস
পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় : চাঁদসদাগর
১৯৩০
মন্মথ রায় : কারাগার
মন্মথ রায় : সাবিত্রী, ১৯৩১
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় : শ্রীগৌরাঙ্গ
যোগেশচন্দ্র চৌধুরী : শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : সতীতীর্থ, ১৯৩২
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য : চক্রব্যূহ, ১৯৩৪
পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় : দময়ন্তী নাটক
১৯৩৬
সুধীন্দ্রনাথ রাহা : শিবার্জুন, বভ্রুবাহন
ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : ব্রহ্মতেজ
মন্মথ রায় : সতী ১৯৩৭
মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত : গয়াতীর্থ
সুধীন্দ্রনাথ রাহা : বিষ্ণুমায়া, ১৯৩৮
মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত : চক্রধারী
মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় : বাসুদেব
১৯৩৯
ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: দুর্গা শ্রীহরি
পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় : শিবশক্তি
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : হরপার্বতী,
১৯৪০
মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত : সতী
যামিনীমোহন বসু : কমলে কামিনী
১৯৪১
ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী : বৃত্রসংহার
মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত : উষাহরণ
মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত : শ্রীদুর্গা ১৯৪৭
সুধীন্দ্রনাথ রাহা : কালীয়দমন, সুবল-মিলন, কলঙ্ক ভঞ্জন, রাই রাজা ১৯৪৮
ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী : বামনাবতার,
১৯৫২
জলধর চট্টোপাধ্যায় : হরিশ্চন্দ্র

নির্ঘণ্ট